কালরাত্রি

ভা. র. ১৮—১

শ্রীমান নির্মল খান

কল্যাণীয়েষু

প্রথম পর্ব

কয়েকটা মুহূর্তের জন্ম পৃথিবীর সমস্ত গতি, সমস্ত চেতনা, সমস্ত জীবনস্পন্দন যেন স্তব্ধ হয়ে গেল অংশুমানের কাছে। মনে হল সূর্যের চারিপাশে আপন কক্ষপথে পৃথিবীর যে অবিরাম চলমানতা তাও যেন থেমে গিয়েছে।

ফলে অংশুমানের দৃষ্টির সম্মুখে স্থির এই জগৎ-লোকের সমস্ত কিছু আস্তে আস্তে মুছে আসতে আরম্ভ করেছিল। কোন আলো সেখানে ছিল না, কোন কালোও সেখানে ছিল না। তার নিজের অস্তিত্বও যেন তার নিজের কাছে মুছে যাচ্ছিল; গিয়েওছিল অনেকটা। নিভিয়ে আসা প্রদীপের শলতের প্রান্তে ক্ষীণতম আলো ও উত্তাপের মতই তার অস্তিত্বের অবশেষটুকু কোনরকমে বজায় ছিল।

মোটর অ্যাকসিডেণ্টে আহত সেই রক্তাক্তদেহ শিশুটি তারই ছেলে? যাকে সে নিজে দুই হাতের ভাঁজের উপর তুলে নিয়ে মেডিক্যাল কলেজের ইমারজেন্সী ওয়ার্ডের টেবিলের উপর নামিয়ে দিয়ে এসেছিল—সেই অচেনা শিশুটি? তারই ছেলে? সীতা তার কাছ থেকে চলে গিয়ে নিজের হাতে নিজের সিঁথিতে সিঁদুরের চিহ্ন নিয়ে তারই উপাধি ব্যবহার করে ওই শিশুকে সগৌরবে আপন গর্ভে ধারণ করেছে; প্রসব করেছে; তাকে এতবড় করে তুলেছে; অবশেষে—!

এইখানেই তার চেতনা ও চৈতন্যের শিখাটা নিভে যাওয়ারই কথা। কিন্তু এইখান থেকেই শিখাটা আবার একটু করে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। এবং ক্রমে ক্রমে পূর্ণ চেতনায় ফিরে এল সে। সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীও চলতে লাগল—সকালের আলো আপন দীপ্তিতে উত্তাপে প্রকাশিত হল। মনে পড়ে গেল—সংলগ্ন বাথরুমটার মেঝের উপর ওই শিশুটি এবং সীতার রক্তমাখা কাপড়-জামাগুলি জড়ো হয়ে পড়ে রয়েছে।

একটা মিষ্টি গন্ধ আসছে বাথরুমের ভিতর থেকে। সে ল্যাভেণ্ডার সাবান ব্যবহার করে; দেশী ল্যাভেণ্ডার অবশ্য; সেই সাবান দিয়ে হাত মুখ ধুয়েছে—সেই গন্ধ বাতাসের সঙ্গে মিশে রয়েছে—তার সঙ্গে আছে জলো জলো ভাব। সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে রঞ্জন। রঞ্জন সংবাদটা এনেছে।

* * *

চলমানতার বেগ তাকে পিছনের দিকে নিয়ে গেল; সামনে তো অগ্রসর হবার সীমা শ্মশান পর্যন্ত বিস্তৃত। তার বেশী তো নয়। অন্ততঃ এই এখনি এই মুহূর্তে ওই শ্মশানঘাট নিমতলা বা কেওড়াতলাকে অতিক্রম করে আর যাওয়া যায় না। না বৈতরণী নয়; ভাগীরথী আর কাটিগঙ্গা এগিয়ে যেতে দেয় না। মৃত্যুলোক বা অমৃতলোক বা পরলোকের স্বর্গ নরকের কথাও নয়। অংশুমান ওতে বিশ্বাস করে না। বাস্তব জীবনেই এর পর আর কোন কল্পনা যেন পক্ষবিস্তার করতে পারছে না। শ্মশানের বুকে কাঠ সাজিয়ে একটি চিতা তৈরি করে তার উপর ওই শিশুটির শব নামিয়ে দিয়ে—।

চমকে উঠল; সারা বুকটা যেন তার টনটন করে উঠল! ছেলেটি যে তারই সন্তান!

মন তার চিতায় আগুন দিতে গিয়ে থমকে দাঁড়ায়; পিছন ফিরে ছুটে পালায়। মন তার ছোটে পিছনের দিকে।

চৌরঙ্গী রোড আর ধর্মতলা স্ট্রীটের জংশনে মন গিয়ে থামল। গতকালের অপরাহ্নবেলা—বেলা পাঁচটা; পশ্চিম আকাশে সূর্য তখনও বেশ উত্তপ্ত এবং দীপ্তিও তার খুব প্রখর। অংশুমান ফিরছিল ট্যাক্সিতে। তার ট্যাক্সির সামনেই ছিল একখানা প্রাইভেট। তার সামনে ছিল একখানা খালি ট্রাক এবং একখানা দোতলা স্টেট বাস। সব গাড়ি কখানাই মোড় নিচ্ছিল ডানদিকে ধর্মতলা স্ট্রীটে—সামনের বাস ট্রাক এবং প্রাইভেটখানাও। তার ট্যাক্সি যাবে সোজা উত্তরে। প্রাইভেটখানা ট্রাক ও বাসখানাকে পাশ কাটিয়ে যাকে মেরে বেরিয়ে যাওয়া বলে তাই যেতে গিয়ে কর্কশ শব্দ তুলে ধাক্কা লাগালে। লাগালে ট্রাকখানার সঙ্গে, গাড়িখানার ডানদিকের পিছনদিকটা একেবারে তুবড়ে গেল। প্রচণ্ড একটা শব্দ উঠল।

এই গাড়িতে ছিল সীতা। আর এই শিশুটি। এরাই ছিল পিছন সিটে। সামনে বসে যিনি ড্রাইভ করছিলেন তিনি বেঁচে গেছেন। ছোট শিশুটির একখানা হাত একেবারে থেঁতলে গিয়েছিল—সীতার মুখ ভাঙা কাঁচে কেটে ছোট ছোট ক্ষতে বিক্ষত হয়ে রক্তাক্ত হয়ে গিয়েছিল।

সীতাকে দেখে চমকে উঠেছিল অংশুমান। শিশুটি সীতার তাতে সন্দেহ ছিল না। সীতার মুখের আদল ছিল—আর তা ছাড়া ট্যাক্সিতে বাক্স পেঁটরা বেডিং বোঝাই করে যে মেয়ে যাচ্ছিল, হাসপাতালে যার ভ্যানিটি ব্যাগে দেড়খানি সেকেণ্ড ক্লাসের টিকিট পাওয়া গিয়েছিল সে মেয়ের ওই শিশুটি সন্তান ছাড়া কি হতে পারে?

যিনি গাড়ি ড্রাইভ করছিলেন তিনি অক্ষত ছিলেন এবং তাঁকে পুলিস নিয়ে গেল থানায় আর সীতাকে ও শিশুটিকে তার ট্যাক্সিতে তুলে অংশুমানই নিয়ে এসেছিল মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। সঙ্গে পুলিসও ছিল অবশ্য।

সীতার আঘাত বাইরে থেকে গুরুতর মনে হয় নি। কপালে একটা ইঞ্চি দেড়েক লম্বা কাটাই ছিল সব থেকে বড় আঘাত। তা ছাড়া টুকরো টুকরো কাঁচ বিঁধেছিল; সেগুলি খুব মারাত্মক মনে হয় নি কারও। তবে সে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল এইটেই ছিল আশঙ্কার কথা। বাইরে থেকে দৃষ্টির অগোচর কোন আঘাত যদি তার মাথায় কি বুকে লেগে থেকে থাকে তবে সে আঘাত সামান্য হবে না।

অংশুমান ওই শিশুটিকে দেবার জন্য কিছু রক্ত দিয়ে এসেছিল। 'ভাগ্যের কথা'—ডাক্তার তাই বলেছিলেন; অংশুমানের রক্ত নেবার সময় ডাক্তার বলেছিলেন—ভাগ্যের কথা বলতে হবে। একই গ্রুপের রক্ত।

তখন একটু চমকে উঠেছিল অংশুমান। সীতার শিশু এবং তার রক্ত অংশুমানের রক্তের সঙ্গে একই গ্রুপের?

মন তার আরও পিছনে চলে গেল।

তার চোখ আপনি ঘুরে গিয়ে নিবদ্ধ হল তার শোবার ঘরের দিকে; তার ওই সিংগল্-বেড খাটখানার উপর।

* * *

পাঁচ বছর আগে চলে গেল মন। ১৯৫২ সালে। তারিখও মনে আছে। ২৭শে জুলাই। তারিখ তার মনে থাকে না। ডায়রী রাখা তার ঘটে ওঠে না। বছরের প্রথমেই ডায়রী ক্যালেণ্ডার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে পাঠায়। একখানা ডায়রীতে খরচ নয়, জমা লিখে রাখে; বাধ্য হয়েই রাখে। না-হলে পাওনা হিসেবের সময় গোলমাল হয়। আর একখানা সে ডায়রী লিখব বলেই নাম ঠিকানা লেখে—১লা জানুয়ারী থেকে কয়েকদিনের ডায়রীও থাকে কিন্তু তারপর আর থাকে না। হঠাৎ কোন দিন ডায়রীখানা টেনে নিয়ে দু'চার লাইন লিখে রাখে।

১৯৫২ সালের ২৭শে জুলাই লেখা আছে—"আজ সীতা চলে গেল। কাল রাত্রে সে এখানে ছিল। আমি তাকে জোর করে আটকে রেখেছিলাম।"

তারপর কয়েকটা লাইন লিখেও কেটে দেওয়া আছে। কালির দাগে দাগে লেখাগুলিকে একেবারে ঢেকে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু মনে আছে অংশুমানের। "অনুশোচনা হচ্ছে। অন্যায়—।" কেটে দিয়েছে। তারপর ছিল—"কালের সঙ্গে সে চলতে পারলে না। আমি আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি—এ কি সেই সীতা?"

ভোরবেলা সে গাঢ় ঘুমে ঘুমোয়। সেদিন ঘুমটা গাঢ় হয় নি। হতে পারে নি। সীতা এবং সে এই এক খাটেই রাত্রি যাপন করেছিল। ঘুমটা ছিল পাতলার উপর। একটা জেট প্লেনের ল্যাণ্ডিংয়ের কঠিন এবং নিষ্ঠুর আওয়াজে তার ঘুমটা ভেঙে গেল। প্লেনখানা রোজই আসে রোজই নামে—কিন্তু সেদিন এমনভাবে মাথার উপর এত নিকট দূরত্বে এসে পড়েছিল যে চমকে জেগে উঠতে হয়েছিল তাকে।

মনে আছে প্রথমটা ঘুমের মধ্যেই তার মনে হয়েছিল যে হয়তো কোন একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে। হয়তো জেটখানা ভেঙে পড়ছে। এবং পড়ছে বাড়ির মাথায়।

পরক্ষণেই প্লেনখানা তার বাড়ির মাথার এলাকা অতিক্রম করে এগিয়ে চলে গিয়েছিল। কিন্তু তার মুখ থেকে আপনিই বেরিয়ে এসেছিল একটা বিরক্তিসূচক শব্দ।

"আঃ" শব্দ করে সে চোখ মেলতে বাধ্য হয়েছিল।

সব স্পষ্ট মনে পড়ছে।

এত স্পষ্ট যে মনে হচ্ছে, আশ্চর্য কিছুর স্রোতে অবগাহন করে এমন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। না-হলে এই পাঁচ বছরের বাতাসে উড়েপড়া ধুলোর আস্তরণ কোনক্রমে মুছে ফেলা যেত না। বিবর্ণ হয়ে যেতই।

মনে পড়ছে বিছানায়-শুয়ে-থাকা মুখের কাছেই ছিল সীতার মাথা দেওয়া বালিশটা। কোন গন্ধ তার নাকে এসেছিল কি না মনে পড়ছে না। অন্ততঃ সে-সম্পর্কে সে সচেতন ছিল না।

বালিশটাই তার স্মৃতির আলোটিকে জ্বালিয়ে দিয়েছিল। ইলেকট্রিক বাল্বের মত দপ্

করে জ্বলে উঠেছিল।

মুহূর্তে একই সঙ্গে মনে পড়ে গিয়েছিল গত রাত্রির সমস্ত ঘটনার কথা এবং খোলা চোখের সামনে দেখতে পেয়েছিল সীতা দাঁড়িয়ে আছে তারই দিকে তাকিয়ে। যেন যাবার জন্ত তৈরী হয়ে তার এই চোখ খুলে তাকানোর প্রতীক্ষা করেই দাঁড়িয়ে ছিল। চোখোচোখি হতেই অথবা তার আগে থেকেই সীতার মুখে একটুকরো এবং অতি ক্ষীণ-হাসি ফুটেছিল।

এ হাসি এবং এ দৃষ্টি যেন কাঁটার মতই তীক্ষ্ণ মুখে বিদ্ধ করেছিল অংশুমানকে। মনে পড়ছে সঙ্গে সঙ্গেই সে চোখ বন্ধ করেছিল। কিন্তু সীতা বলেছিল—চোখ বন্ধ করো না। আমি যাচ্ছি।

—যাচ্ছ? চোখ না খুলে পারে নি অংশুমান।

সীতা বলেছিল—কিন্তু এটা কি হল বল তো?

এবার আবার চোখ বন্ধ করেছিল অংশুমান। সীতা আবার হেসেছিল। সঙ্গে সঙ্গে সারা মুখখানির উপর নেমে এসেছিল করুণতম বিষণ্ণতার ছায়া। নিরুত্তর অর্ধনিমীলিত চোখে অংশুমানের দিকে তাকিয়ে সীতা বারকয়েক বেদনার্তের মত ঘাড় নেড়ে বলেছিল—উত্তর দেবে না?

এবার চোখ বুজে থেকেই অংশুমান উত্তর দিয়েছিল, 'ডোণ্ট বি সেন্টিমেণ্টাল!'

এর আর কোন উত্তর দেয় নি সীতা। তার মুখে এবার ব্যঙ্গের নিষ্ঠুর হাসি ফুটে উঠেছিল। সে হাতব্যাগটা তুলে নিয়েছিল সামনের টেবিলের উপর থেকে, তারপর মৃদু চটির শব্দ তুলে যত কম শব্দ করে হয় ঘরের দরজাটি খুলে ফেলে বেরিয়ে যেতে চেয়েছিল, কিন্তু দরজার মুখে গিয়ে আবার একবার থমকে দাঁড়িয়েছিল! বিছানায় তার খালি যে অংশটা পড়ে ছিল সেই দিকে তাকিয়েছিল সে। ওই স্থানটুকু তার জীবনের স্বর্গ না নরক তা বুঝতে চেষ্টা করেছিল বোধ হয়। কিন্তু সে-প্রশ্ন সে করত কাকে? ভগবান মানলে হয়তো তার কাছে করতে পারত। ভগবান সে মানে না এমন নয়—তবে মানে কিন্তু বিশ্বাস তো নেই। জিজ্ঞাসা করবার মত বিশ্বাস তো করে না। একটা দীর্ঘনিশ্বাস আপনি যেন ঝরে পড়ল তার বুক থেকে। তার নাম সীতা—অংশুমানকে সে কিছুতেই রাবণ বলে ভাবতে পারে নি। কথা ক'টা সীতারই কথা। কথাগুলো মুখে সে সেদিন বলে নি। পরে চিঠিতে লিখেছিল। চিঠিখানা সে ছিঁড়ে ফেলেছে কিন্তু কথাগুলো ভুলতে পারে নি। মাস চারেক পর হঠাৎ চিঠিখানা এসেছিল। ঠিকানা ছিল না। লিখেছিল—"আমার নাম সীতা বলেই সেদিন ভোরবেলা মনে হয়েছিল তোমাকে রাবণ বলে গাল দেব। কিন্তু কিছুতেই তা পারি নি। তোমাকে রাক্ষস ভাবতে আমি পারলাম না। তুমি রাবণকে বলতে কুসংস্কারাচ্ছন্ন বর্বর; ব্রহ্মার অভিশাপকে ধ্রুব মনে করে সীতার সর্বনাশ সে করতে পারে নি। তুমি কুসংস্কারাচ্ছন্ন নও—বর্বরও নও। এবং আমার জীবনের কিছুই তোমাকে অদেয় ছিল না। কিন্তু—। থাক—সব ডুবিয়ে দাও। তুমিও দাও। আমিও দিতে চেষ্টা করব। তুমি রাবণ নও আমিও সীতা নই। তোমার কোন হুকুমে অগ্নিপরীক্ষা আমি দেব না।"

থাক। সেদিন যখন সীতা দরজার মুখে দাঁড়িয়ে বিছানাটার দিকে ফিরে তাকিয়েছিল

তখন তার চোখ আপনাআপনি বুজে এসেছিল। চোখ বন্ধ করেই সে তাকে বলেছিল—শোন।

সীতা বলেছিল—বল।

সে বলেছিল—কোন ডিফিকাল্টি হলে আমাকে জানিয়ো।

এ কথায় সীতার কপালে ক'টা রেখা জেগে উঠেছিল। কণ্ঠস্বর তিক্ত হয়ে উঠেছিল উত্তর দিতে। উত্তরে তিক্তকণ্ঠে বলেছিল—ডিফিকাল্টি?

আজও মনে পড়ছে কথাটা খোঁচার মত মনে হয়েছিল এবং সেও তিক্তস্বরে বলেছিল—হ্যাঁ হ্যাঁ—ডিফিকাল্টি। খুকীপনা করো না।

সীতা বলেছিল—অত্যন্ত গম্ভীরভাবে বলেছিল—না খুকী আমি নই। খুকীপনা আগে করতাম এখন একেবারেই করিনে। যার জন্যে অভিনয় করাই ছেড়ে দিলাম। খুকী নই সে জ্ঞান আমার আছে বলেই আমার সকল কাজের দায় একান্তভাবে আমারই। সে বোধ আছে বলেই তোমার আমার দেনাপাওনার দায় মিটিয়ে যা দেবার দিয়ে যাচ্ছি যা নেবার নিয়ে যাচ্ছি। এর জন্যে যে দুর্ভোগই আসুক না কেন সে একান্তভাবে আমারই। তার জন্যে তোমার শরণই বা নেব কেন—তোমাকে স্মরণ করতেই বা যাব কেন?

অংশুমান চোখ বন্ধ রেখেই বলেছিল—আই সী।

সীতা বলেছিল—ভারী খারাপ লাগছে অংশু। তোমার মুখে ইংরিজী কথা। এম. এ. পাস করেছ বাংলায়। বাংলায় বল না।

কথা ক'টা তার মুখের উপর যেন শপাং শব্দ তুলে চাবুকের মত আছড়ে পড়েছিল। অত্যন্ত কঠিন কথা বলেছিল সীতা। সীতাদের বাড়ি খুব উগ্র ইংরিজীনবিসের বাড়ি। এবং অংশুমান বাংলায় এম. এ-তে ফল ভাল করেও এবং লেখক হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেও ইংরিজীতে পোক্ত নয়। যার জন্যে ইংরিজীর উপর চটা সে; আহত হয়ে অনেক খুঁজে অবশেষে সে বলেছিল—আমার ইংরিজীর উপর রাগটা তুমি অকারণ করছ সীতা। ইংরিজী হয়তো আমার খারাপ। কিন্তু তোমাদের মত ইংরিজীনবিসদের ইংরিজী যে বেশী ভাল তা নয়—

বলতে বলতে সে থেমে গিয়েছিল; কারণ একটি স্যাণ্ডেলপরা হালকা পায়ের মৃদু শব্দ যেন উঠতে আরম্ভ করে ক্রমশঃ ক্ষীণ হতে হতে দূরে চলে গেল মনে হয়েছিল তার।

সীতা কি চলে গেল?

কথা বলা বন্ধ করে চোখ মেলেছিল অংশুমান। দেখেছিল সীতা নেই। সে চলে গেছে। ঘরের দরজাটা একপাল্লার দরজা; সেখানাকে ঠেলে দিয়ে গেছে। সেটা এসে দরজার ফ্রেমের গায়ে লেগেছে আলতোভাবে। কিন্তু অংশুমানের মনে হয়েছিল সীতা এবং তার মধ্যে ওই দরজার পাল্লাটা একটা চিরুদ্ধ আড়ালের প্রতীক হয়ে তার দৃষ্টিকে অবরোধ করে দাঁড়িয়েছে।

* * * *

মিনিট খানেক পরেই সীতা আবার ফিরে এসেছিল। আলতো ভাবে যে পাল্লাটা

দাঁড়িয়েছিল সেইটেকেই ঠেলে দিয়ে ভিতরে এসে ঢুকেছিল। তার হাতে কিছু ছিল—প্রথম নজরেই সেটা কি তা সে ঠাওর করতে পারে নি। কাছে এসে দাঁড়াতেই সে চিনেছিল—ফাউন্টেন পেনের কালীর দোয়াত এবং সেটা লাল কালীর দোয়াত আর একটা নিব পরানো হ্যাণ্ডেল কলম।

অংশুমান বলেছিল—বস।

—না, আমি বসব না, তুমি ওঠো।

—কেন? শরীর বড্ড ম্যাজম্যাজ করছে। ইচ্ছে করছে না উঠতে।

—কিন্তু এক্ষুনি তোমাকে বেরুতে হবে। তুমি বেরুবে। আমি জানি। তোমার এনগেজমেণ্ট আছে।

—এনগেজমেণ্ট!

—হ্যাঁ। একটু আগে টেলিফোন করেছিলেন কোন একজন—বোধ হয় তোমার বান্ধবী। তিনি আসবেন এখানে। তুমি ঘুমুচ্ছিলে। হরি টেলিফোন ধরেছিল। আমি পাশে দাঁড়িয়ে শুনেছি।

চমকে উঠেছিল অংশুমান। হ্যাঁ। আছে, কথা আছে। তার নূতন নাটকের নায়িকা একটি মেয়ের সঙ্গে দেখা করার কথা আছে।

অংশুমান সেই খ্যাতিমান অংশুমান চৌধুরী—যে নূতন যুগের নাট্যকার, যে নিজে খ্যাতিমান অভিনেতা এবং কিছু কিছু ছোট গল্প ও আধুনিক গানের গীতিকার হিসেবেও খ্যাতিলাভ করেছে। সর্বজন না হোক—বাংলা দেশে লিখনপঠনক্ষম এবং সংস্কৃতিতে অনুরাগী অনুরক্ত যারা তাদের অনেকেই তাকে চেনে।

সে আজকের কবি নাট্যকার নয়—আগামী কালের কবি নাট্যকার এবং গীতিকার বলে মনে করে নিজেকে। সম্প্রতি একখানা নতুন নাটক লিখেছে সে। 'কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন'।

অর্থাৎ মহাভারতের স্রষ্টা মহাকবি মহর্ষি বেদব্যাস।

অংশুমান বলেছিল—আমার একান্ত ইচ্ছে ছিল—সত্যবতীর পার্টটা তুমি কর। আমি পরাশর আর শান্তনুর দুটো পার্ট করি।

—না।

—কেন?

—এর উত্তর তুমি জান। জীবন নিয়ে খেলা খেলতে যে পারে সে পারে, আমি পারি না।

—সীতা—

—দয়া করে মাফ করো আমাকে। এখন যা বলছি শোনো। যার জন্যে যেতে যেতে ফিরে এলাম আমি।

—বল।

—এই হ্যাণ্ডেলটার উল্টো দিক দিয়ে একটু লাল কালি আমার সিঁথিতে পরিয়ে দাও।

—সিঁথিতে লাল কালী পরিয়ে দিলেই কি—

বিষণ্ণ কণ্ঠে সীতা বলেছিল—তর্ক করতে আমি আসি নি। তর্ক করার মত মন আমার নেই। আমি তোমাকে ভালোবাসি অংশুমান। তার জন্যই এই স্মরণ-চিহ্নটুকু চাই। দাও পরিয়ে দাও।

—না। মুখ চোখ মন পাল্টে গিয়েছিল অংশুমানের। আজও সে কথা স্মরণ করতে পারে অংশুমান। এবং 'না' বলে সে পাশ ফিরে শুয়েছিল যখন—তখন সামনের দেওয়াল ঘেঁষে যে ড্রেসিং টেবিলটা ছিল—তার আয়নার মধ্যে নিজের চেহারা সে দেখতে পেয়েছিল। মনে পড়ছে—শক্ত কঠিন হয়ে উঠেছিল তার মুখের চেহারা। যেন আকাশে মেঘসঞ্চারের মত কিছু একটা সঞ্চারিত হয়ে উঠেছিল তার মনে—তার ছায়া পড়েছিল তার মুখে। নিষ্ঠুর তিরস্কার বা কঠিন প্রতিবাদ জমে উঠেছিল মনে মনে।

বিবাহে সে বিশ্বাস করে না।

বিচিত্র তার জীবন পথের অভিজ্ঞতা। তাই বা কেন? সারা দেশই তো চলেছে এই পথে। একে সে অস্বীকার করবে কি করে? না—ধর্মে ঈশ্বরে বিবাহে প্রেমে কিছুতে তার বিশ্বাস নেই।

—শোন।

তার ক্রুদ্ধ চিন্তার প্রবাহে ছেদ টেনে দিয়ে সীতা বলেছিল—আমি চললাম। আর কখনও আসব না। আমি নিজেই প'রে নিলাম ওই লাল কালির চিহ্ন। তুমি দেখলে না। তোমায় শুনিয়ে দিয়ে গেলাম।

এরপর সীতা চলে গিয়েছিল।

ভ্রূকুটি ফুটে উঠেছিল তার কপালে।

কিছুক্ষণ পর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেছিল সে।

মহাতপস্বী ব্রহ্মবিদ্ মহর্ষি পরাশর—তীর্থযাত্রায় বের হয়ে যমুনার ঘাটে এসে উপনীত হয়েছিলেন। সেই ঘাটে ধীবররাজের পরমাসুন্দরী যুবতী কন্যা সত্যবতী পারাপারের খেয়া নৌকা বহন করছিল। পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য অপরূপ লাবণ্যবতী যুবতী কন্যার মদির যৌবন তপস্বী ব্রহ্মউপাসক—তীর্থযাত্রী পরাশরকেও প্রকৃতি-নিয়মে চঞ্চল করেছিল।

পরাশরের ঔরসে—ধীবর-কন্যা সত্যবতীর গর্ভে বেদব্যাসের জন্ম। জন্ম হয়েছিল এক দ্বীপে। তাই তাঁর নাম দ্বৈপায়ন। গায়ের রঙ তাঁর কালো তাই কৃষ্ণ বিশেষণযুক্ত তিনি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন। তিনি বেদব্যাস। মহাভারতকার। তিনি ভগবানের তুল্য স্রষ্টা। তিনিও মহাতপস্বী। তিনিও সমস্ত জীবনে বিবাহ করেন নি। কিন্তু তাঁর মায়ের আহ্বানে কৌরব বংশে প্রয়োজনের ক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ পুত্র উৎপন্ন করেছিলেন। গোপন করেন নি সে কথা। তাঁর মা সত্যবতী তাঁকে প্রসব করেছিলেন কুমারী অবস্থায়। তারপর তিনি বিবাহ করেছিলেন মহারাজা শান্তনুকে।

আশ্চর্য ভাবে সত্যের মহাপ্রকাশ হয়েছে।

অথচ এই সত্য নিয়ে বাস্তবে কত কুণ্ঠা কত জটিলতা কত তিরস্কার কত শাস্তি!

বঙ্কিম রোহিণীর প্রাণদণ্ড দিয়েছেন। অনুতপ্ত গোবিন্দলালকে সন্ন্যাস দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করিয়েছেন।

মহাকবি বিনোদিনীকে বৈরাগিনী সাজিয়ে কাশী পাঠিয়েছেন।

শরৎচন্দ্রের কিরণময়ী—পথ না পেয়ে পাগল হয়েছে, সাবিত্রী সতীশকে সরোজিনীর হাতে তুলে দিয়ে উপীনদা'র শেষ শয্যায় সেবা করতে গেছে।

কল্লোলের যুগে এই নিয়ে কলহের অন্ত ছিল না। সাহিত্যে আমরা এ সত্যের সহজ প্রকাশ গ্রহণ করতে পারি নি কিন্তু আজ সমাজে তা বলে তো সে-সত্য মুখ লুকিয়ে অন্ধকার গুহায় আত্মগোপন করে থাকবে না। মানুষের দেহ কোষে কোষে এই প্রবৃত্তি রিপু হয়ে উঠতে চাচ্ছে এবং উঠছে। আশ্চর্য—১৯৪৭ সাল পর্যন্ত এ দেশ—যেন আর একরকম ছিল। তার আগে এ প্রবৃত্তি ছিল, ছিল না কে বলবে?

অকস্মাৎ একটা নিদারুণ অস্থিরতায় অস্থির হয়ে উঠল।

১৯৪৭ সালের ১৭ই আগস্ট—স্বাধীনতা লাভের ঘণ্টাখানেক আগে সে নিজে ভ্রষ্ট হয়েছিল। সেই রাত্রে তার বাবা মারা গিয়েছিলেন।

তার মনে হয়েছিল—অভিশপ্ত হয়েছে সে। ওই পাপে। ভাবতে ভাবতে সে যেন ভেঙে পড়েছিল। যে-সত্যকে সে সত্য বলে মেনেছে তারও উপর ভর দিয়ে সোজা হয়ে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারে নি।

মনে পড়ছে—অস্থির হয়ে উঠে বসেছিল সে। চীৎকার ক'রে বলতে চেয়েছিল—সীতা! জীবনের এই দেওয়া-নেওয়াকে কি একান্ত সহজ সরল ক'রে নেওয়া যায় না? সীতা!

পারে নি। গলা দিয়ে কোন আওয়াজ বের হয় নি তার। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সে আবার ঘুরে শুয়েছিল। আবার সেই প্রশ্ন মনে জেগেছিল। কেন এমন হল। একা তো সে-ই শুধু নয়—সারা দেশেরই এই একই অবস্থা। নিজের জীবন দেশের মানুষের জীবন বিচিত্র ভাবে একটা আশ্চর্য উগ্র চেহারা নিয়েছে। প্রাচীন সব কিছুই যেন অসহ্য মনে হচ্ছে। বুকে যেন অকস্মাৎ কোন প্রসুপ্ত আগ্নেয়-গিরি জীবন্ত হয়ে উঠে অগ্ন্যুদ্গার করছে।

রাজনৈতিক দলের নেতারা এই উগ্র মনোভাবের সুযোগ নিয়ে তাতে শুধু দাহ্যপদার্থ নিক্ষেপ করছেন।

নানান দলের নীতি নানান ধরণের।

শুধু এ দেশই বা কেন? সারা বিশ্বের সকল দেশের অবস্থাই তো তাই। জ্বলছে; মানুষেরা যেন জ্বলছে। দেহের ক্ষুধায় পেটের ক্ষুধায় মনের ক্ষুধায়—জ্বলছে!

এ হয়তো এই কালেরই আগুন। এই যে কাল—১৯০১ থেকে এই ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত এই কালে যেন কালেরই বুকখানাকে বিদীর্ণ করে তার ভিতরে সঞ্চিত বহু বহু কালের আগুন ফেটে বেরিয়ে—এতকালের সব কিছু জ্বালিয়ে দিচ্ছে। এরই মধ্যে সে এবং সীতা—।

থাক, সীতার কথা।

আজ পাঁচ বছর পর এই মর্মচ্ছেদী সংবাদ পাওয়ার পর এই মুহূর্তে মনে পড়ছে সীতার কথা চাপা দেবার জন্যই সে ডেকেছিল হরিকে।

হরি তার বাহন। বন্ধুরা বলে বাহন। সে তার সব। চাকর পাচক বন্ধু কর্ণধার—তার বাসার সব ব্যবস্থার সব আয়োজনের কর্মী কর্তা দুই।

হরি এসে মাথাটি হেঁট করে দাঁড়িয়েছিল। এবং সেটা তার চোখে পড়েছিল। পড়ার কথাই যে। সীতা এ বাসায় আগন্তুক নয়—সে এ বাড়ির প্রতিটি কোণ চেনে—এবং সবখানে তার পায়ের ছাপ এঁকে রেখেছে আজ দু'বছর ধরে; হয়তো এ ঘরের দরজাগুলি তার সম্মুখে খুলে যাবার জন্য প্রতীক্ষাই করছিল কিন্তু তবু কাল যা ঘটে গেছে তাকে যেন স্বীকার করে নিতে পারছে না আবার নীরবে একে হজমও করতে পারছে না। হরি সেই অস্বস্তিকে প্রকাশ করছে ওই ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে। অন্য দিন হরি ঘরে ঢুকেই প্রগল্‌ভ হয়ে ওঠে; সে স্বভাবে প্রগল্‌ভ—কথা কয় বড্ড বেশী। ঘরে ঢুকেই আরম্ভ করে—কি খাবে আজিকে? মাছঅ আনিবো না মান্‌সঅ আনিবো? কালঅ রাত্তিকে রঞ্জনবাবু ফোনঅ করিছিলো। আর ফোনঅ করিছিলো শিবঅবাবু। আমি তাকে বারণঅ করিছি আসিতে। আজও ইলিকটিরিকর টাকা দিতি হইব। জমাদারনী রানীয়া আজ পাঁচ দিনঅ কাম করিছে না। বলিলে ঝগড়া করিছে।

এমন অজস্র কথা। সংবাদ—প্রশ্ন—উত্তর। সে হাটবাজার চাল ডালের বাজারদর থেকে রাজনীতির বড় বড় কথা পর্যন্ত। সেই হরি পর্যন্ত বাক্যহারা হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল সেদিন।

বোধ করি পূর্ণ এক মিনিট একটা বাক্যহারা নীরবতা শ্বাসরোধী গভীরতায় গভীর হয়ে উঠেছিল। তাতে হাঁপিয়ে উঠেছিল অংশুমান এবং জোর করেই গত রাত্রির সমস্ত স্মৃতি এবং তা নিয়ে ন্যায়-অন্যায় বিচারের সমস্ত বিতর্ককে সরিয়ে দিয়ে বলেছিল—চা আন।

হরি বলেছিল—জল চাপালাম এখন। মাটির দিকে তাকিয়ে কথা বলছিল হরি।

বিস্মিত অংশুমান বলেছিল—সীতার জন্যে চা করলি আমার জন্যে করলিনে কেন?

—উ তো চা খেলে না।

—খেলে না? সীতা চা খায় নি? অংশুমান প্রায় চমকে উঠেছিল। সীতা চা পর্যন্ত স্পর্শ করে নি?

—না। আমি তো এই উঠলাম। এখন তো অনেক সকাল আছে। ছটা বাজে নি। দিদিমণি আমাকে ডেকে দিয়ে চলে গেল।

চটে উঠেছিল অংশুমান।—সীতা চা না খেয়ে চলে গেল?

—কি করব? সাড়ে পাঁচটার সময় ডেকে দিয়ে চলে গেল। বললে—দুয়ার বন্ধ কর হরি। আমি চলিলাম। আমি বলিলাম—চা খাবে না? সে কিছু বলিল না, চলে গেল।

অংশুমান সবিস্ময়ে বলেছিল—চা খেয়েও গেল না সীতা!

কথাটার অর্থ সঠিক বুঝতে পারে নি হরি। বলেছিল—ই ঘর থেকে গেল। তোমাকে বলি গেল। আমি কি বলিব?

এরপর আর কথা খুঁজে পায় নি অংশুমান। যে কথাই বলতে চেয়েছিল বা বলবে ভেবেছিল সেই কথাই আটকে গিয়েছিল জিভে; হয়তো বা তার নিজেরই একটা সত্তা তার গলা টিপে ধরছিল।

'এ ঘর থেকে গেল—তোমাকে বলে গেল',—এ কথার পর কোন্ কথা বলবে সে? হরির কাছেও একটা সংকোচের মত কিছু অনুভব করছিল। সেই সংকোচেই সে তাকিয়েছিল সীতার মাথার বালিশটার দিকে। তখন ঘরে আলো হয়েছে। বাইরে রোদ ফুটি-ফুটি করছে। পরিস্ফুট আলোয় চোখে পড়েছিল সীতার মাথার চাপের চিহ্নের উপর দুগাছি লম্বা চুল লেগে রয়েছে। একসময় সীতার চুল ছিল খাটো চুল এবং সে চুল ছিল শ্যাম্পু করা। সীতা পালটাচ্ছিল—চুলগুলি পিঠ ছাড়িয়ে লম্বা হয়েছিল। এবং এই লম্বা চুল দুগাছি থেকে ক্যাম্বারআইডিন-সুরভিত একটি মৃদু গন্ধ আসছিল। বালিশটা সে উলটে দিয়েছিল।

সীতা ছিল তার বান্ধবী। তখন বান্ধবী থেকে প্রিয়বান্ধবীতে পরিণত হয়েছিল। একটি পরিচ্ছন্ন প্রসন্ন সম্পর্ক ক্রমশঃ হৃদ্য হয়ে উঠছিল।

হৃদ্যতম হয়ে ওঠার কথাই।

কিন্তু—। কিন্তু যা হল তাতে যেন প্রশ্ন থেকে গিয়েছিল। সীতা প্রশ্নই করে গিয়েছিল—এটা কি হল বল তো?

প্রশ্নটার মধ্যে এমন একটা কঠিন নালিশ ছিল এবং সেই কঠিন নালিশ দায়ের করার কণ্ঠস্বরে এমন সকরুণ একটি বেদনা ছিল যে, উত্তরে রুক্ষস্বরে ইংরিজীতে 'ডোণ্ট বি সেণ্টিমেণ্টাল' বলে চোখ বন্ধ করা ছাড়া আর কোন পথ ছিল না।

আকস্মিক দুর্ঘটনার মত—। না। তা কেন হবে? আকস্মিক দুর্ঘটনা কেন হবে? এইই তো ছিল নির্ধারিত পরিণতি। তার দাবি ছিল চিরন্তন দাবি। একটি যুবক এবং যুবতী—বন্ধু এবং বান্ধবী। পদক্ষেপে পদক্ষেপে প্রিয়বান্ধব প্রিয়বান্ধবী, নাই পৌঁছল সপ্তপদীতে। আজকের কালে পৃথিবীর সমস্ত প্রাচীন প্রথার মত এই সপ্তপদীও যেন বড় পুরাণো বড় জীর্ণ—বড় কষ্টদায়ক হয়ে উঠেছে। এ দেশের মত দেশেও যে উপলব্ধিই বল—আর দাবিই বল তার জোরেই কোডবিল পাশ হয়ে গেছে। বিদ্যাসাগর বিধবা বিবাহ প্রবর্তন করতে পারেন নি। আজ বিবাহ বন্ধন অসহনীয় হলেই বিচ্ছেদ পর্যন্ত গ্রাহ্য হয়েছে। তারও থেকে নূতন সম্পর্কে তারা পৌঁছুবে ঠিক করেছিল। কিন্তু হল না।

কাল সন্ধ্যার পর দুজনেই দুজনের প্রতি তিক্ত হয়ে পরস্পরের কাছ থেকে সরে যেতেই উদ্যত হয়েছিল। সীতা চলে যাচ্ছিল। হঠাৎ ক্ষিপ্তের মত অংশুমান তাকে বলেছিল—না। এবং সারারাত্রি তাকে আটকে রেখেছিল।

সীতা বারকয়েক প্রতিবাদ করে হঠাৎ একসময় বিচিত্র হেসে আত্মসমর্পণ করেছিল। সে বিচিত্র হাসি এবং তার সে আত্মসমর্পণ প্রসন্ন কি অপ্রসন্ন, মর্মান্তিক বেদনার্ত এ কথা সে বিচার করে নি। বুঝতে চায় নি। বুঝবার মত ইচ্ছা বা মনও তার ছিল না। সে পুরুষ। এ

যুগের পুরুষ সে। তাদের প্রতিনিধি। বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধের নবযৌবন; সে-যুগে ধর্মশাস্ত্র নীতিশাস্ত্র ফালি ফালি করে চিরে দেখা হয়েছে। এ যুগ অরণ্য যুগের মত বর্বর নয় কিন্তু সকল অন্ধবিশ্বাসের বল্গা ছেঁড়া কালো ঘোড়ার মত বিদ্রোহী। হয়তো খানিকটা ক্ষ্যাপাও বটে। সে ত্যাগ থেকে ভোগকে ভালবাসে। জন্মের পরিণাম মৃত্যু এ কথা সে অস্বীকার করে না তবে এইটে সে জেনেছে এবং এইটেকেই সে ধরেছে যে, জীবনের ধর্ম হল বাঁচা। এবং সে বাঁচার উদ্দেশ্য হল অফুরন্ত ষড়ৈশ্বর্যময়ী পৃথিবীকে মন্থন করে তোলা উপাদানে গঠিত এই ষোড়শ-ঐশ্বর্যময় দেহময় জগৎকে আস্বাদন করা। এই জীবন্ময় সৃষ্টিকে বাড়িয়ে তোলা।

কথাগুলো আজ এই নিষ্ঠুর দিনে নিষ্ঠুরতম মুহূর্তে মনে পড়ল তার। মনে হল। আজ সেদিনের সেই ঘটনাগুলো মনে করতে গিয়ে যেন নিজেই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে নিজের কাছে কৈফিয়ৎ দিচ্ছে।

কেন? কেন?

একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে অংশুমান। কিছুক্ষণ জানালা দিয়ে তাকিয়ে রইল বাইরের দিকে। তারপর আবার সে তার ছেঁড়া সুতো জোড়া দিয়ে টানতে লাগল।

হ্যাঁ।

সীতা নীরবেই আত্মসমর্পণ করেছিল। এবং সে আত্মসমর্পণের মধ্যে কোন কুণ্ঠা বা কোন কার্পণ্য ছিল না। শুধু নীরব হয়ে ছিল। সে নীরবতার অর্থ সে বুঝেছিল। কিন্তু বুঝেও জীবনাবেগকে সে সংহত করতে পারে নি। সীতাও এ যুগের মেয়ে। সে তার থেকেও অবিশ্বাসী এবং তার থেকেও উগ্র বিদ্রোহাত্মক আবহাওয়ার মধ্যে মানুষ। একসময় সীতার দুটো আঙুলে সিগারেট খাওয়ার জন্য গাঢ় নিকোটিনের দাগের ছোপ ধরেছিল। তার অতীত সম্পর্কে খোঁজ সে করে নি, কিন্তু সে অতীতের রঙ শ্রাদ্ধবাসরের শ্বেতপদ্মের মত সাদা নয় বা গন্ধে অগুরুমেশানো ধূপকাঠির গন্ধের মত মৃদু নয়।

তবু যেন একটা অস্বস্তি বুকের ভিতর অশান্ত সাপের মত ঘুরপাক খাচ্ছে।

সেদিন, অর্থাৎ পাঁচ বছর আগে সেদিনও মন এমনি একটা অস্বস্তিতে পীড়িত হয়েছিল। এবং হঠাৎ না—নাঃ বলে চীৎকার করে উঠেছিল। বিছানার উপর নড়েচড়ে বসতে হয়েছিল অস্বস্তিতে। সীতার তাকে অদেয় কিছু ছিল না—জীবনের সব কিছু দেওয়া-নেওয়ার অকথিত প্রতিশ্রুতি আপনা-আপনি তাদের বন্ধুত্বের অলিখিত দলিলের একটা শর্তই ছিল এ কেউই অস্বীকার করতে পারত না—সেদিনও পারে নি; আজ এই ১৯৬৭ সালেও পারে না। তবু সীতার সেদিনের নীরব আত্মসমর্পণের মধ্যে অত্যন্ত বিষণ্ণ বেদনার্ত একটা কিছু ছিল, যার জন্য এত বড় দেওয়া-নেওয়াটাকে একতরফার থেকে বেশী কিছু বলা যায় না; তার তরফ থেকেই শুধু নেওয়াই হয়েছিল; সীতা হৃতসর্বস্ব হয়েই চলে গেছে।

আজকের মতই সে দিনও ওই জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে মনটাকে বাইরের ছড়ানো আকাশের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিল। রাত্রিটাকে ভুলতে চেয়েছিল। আকাশে একটা গুর-গুর শব্দ উঠেছিল মনে পড়ছে। জেট তো নয়ই, ভাইকাউন্টও নয়—অপেক্ষাকৃত মন্থরগামী কোন প্লেন। আকাশে মেঘ ছিল না। আকাশ ছিল রোদঝলমল।

সকালের সোনালী রৌদ্র উঠেছে ; বড় বড় বাড়ির ছাদের আলসেতে এবং কয়েকটা অনেক উঁচু বাড়ির সর্বাঙ্গে যেন মাখানো হয়ে গেছে তখন।

রাত্রির স্মৃতিকে ভুলবার জন্য মনকে সে বাড়ি খুঁজতে বা চিনতে নিয়োগ করেছিল। না, আত্মহত্যার জন্য নয়, এমনি মনকে একটা কার্যান্তর দেবার জন্য। তেরতলা নিউ সেক্রেটেরিয়েট কোন্‌টা ? সেইটে খুঁজতে চেষ্টা করেছিল।

বিচিত্র কলকাতা ! কত স্টাইল—কত ফ্যাশন—কত ইজম—কত লড়াই—কত ভোগ ! হঠাৎ সে অত্যন্ত উৎসাহিত হয়ে উঠে বালিশের তলা থেকে সিগারেট বের করে ধরিয়ে একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে উল্লাসের ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিয়েছিল। কিছুই সে মানবে না।

বাড়ির সামনে কৃষ্ণচূড়ার গাছ পুঁতেছে কর্পোরেশন। বেশ বড় হয়ে উঠেছিল তখন। তার দোতলার ঘরের জানালার সমানই উঁচু সে সময়। মনে পড়ছে তার মাথায় কতকগুলো ডোডাবুলবুলি পাখী ঝগড়া লাগিয়েছিল। একটা ডাকছিল—সেই ডাক শুনে আর একটা উড়ে গিয়ে তার পাশে বসছিল—সঙ্গে সঙ্গে আগেরটা উড়ে যাচ্ছিল। এদিকে আরও দু'তিনটে এসে দ্বিতীয়টার সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়ে বসে লঙ্কাকাণ্ড বাধিয়ে তুলছিল। লঙ্কাকাণ্ডের তুলনাটাই মনে পড়েছিল সেদিন এটা মনে আছে।

এই সময়ে হাতের আঙুলে আগুনের ছেঁকা লেগেছিল। আঙুলে ধরা সিগারেটটা পুড়ে ছোট হয়ে এসে আঙুলে আগুনের ছেঁকা দিয়েছিল। বিরক্তিভরে সেটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে হরিকে ডেকেছিল—হরি ! চুরোট আন।

কড়া স্মোকের তৃষ্ণা অনুভব করেছিল সে।

মনের কোন অন্তহীন অতল থেকে একটা অত্যন্ত অশান্তিকর অস্বস্তি বাষ্পের মত উঠে তাকে যেন অসুস্থ করে তুলতে চাচ্ছিল।

তার নাটকের পাণ্ডুলিপিখানা খুলে পড়বার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু একটা ছত্রও প'ড়ে উঠতে পারে নি। নিজের লেখা অত্যন্ত বিস্বাদ মনে হয়েছিল। পাণ্ডুলিপিখানা ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল সে।

* * *

স্পষ্ট মনে পড়ছে সেদিন ভোরবেলায় অদৃশ্য কেউ যেন তাকে নিষ্ঠুর এবং কঠিন ভাবে তিরস্কার করেছিল। তাকে সেদিন হীনতম পাপ কর্মের জন্য দায়ী করেছিল এবং বলেছিল—এ পাপের তোমার মার্জনা নেই ; দ্বৈপায়ন নাটকের নাট্যকার, তুমি পরাশরও নও—তুমি দ্বৈপায়নও নও। তুমি কবি নাট্যকার অভিনেতা যাই হও মানুষ হিসাবে তুমি নিন্দাভাজন হলে। এবং এই মুহূর্তে তুমি সাধারণ মানুষ থেকেও অনেক নিচে নেমে গেলে !

মনে পড়েছিল মায়ের মুখ। মনে হয়েছিল এ তিরস্কার তিনি করলেন। বাবাকে মনে পড়েছিল। বাবার প্রতি খুব বড় শ্রদ্ধা না হোক, খুব গাঢ় গভীর ভালবাসা তার ছিল ; তিনি বেঁচে নেই ;—তাঁর মুখ মনে পড়েছিল, সে মুখ বড় বিষণ্ণ বড় করুণ। আরও অনেক মুখ মনে পড়েছিল। স্বামী বিবেকানন্দ রবীন্দ্রনাথ সুভাষচন্দ্র পর্যন্ত অনেকের কথাই তার মনে হয়েছিল। পরের পর তাঁরা যেন মনের সামনে দেখা দিয়ে চলে গিয়েছিলেন। আর সে

একটা নিদারুণ মানসিক যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে মাথা হেঁট ক'রে দাঁড়িয়েছিল। সে বলতে চেয়েছিল তোমরা যা বলে গেছ, তোমরা যা ক'রে গেছ, এতকাল যা মেনেছ, মেনে ধন্য হয়েছ সে সবই আজ এমন ভাবে মূল্যহীন হয়ে গেল কেন? আমি তোমাদের আজ ব্যর্থ নমস্কারেই ফিরিয়ে দিচ্ছি।

ধীরে ধীরে আবার তার মনের স্থিরতা ফিরে এসেছিল। মনের স্থিরতা সেই চিরকালের স্থিরতা নয় এ কালের স্থিরতা।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তী কালের স্থিরতা।

নাগিনীদের বিষাক্ত নিশ্বাসের মধ্যের স্থিরতা। বিষজর্জর স্বাভাবিকতা। শান্তির ললিতবাণী আজ উপহাস মনে হবে।

* * *

তবুও সারাটা দিন সেদিন অশান্তি এবং অস্বস্তিতে কেটেছিল। সারাদিনে সে যেসব কাজের প্রোগ্রাম করে রেখেছিল সব বন্ধ করে দিয়েছিল।

তার নাটকের রিহারশ্যাল হবার কথা ছিল। নাটকের নতুন নায়িকা সুস্মিতাকে নিয়ে রঞ্জন এসেছিল এনগেজমেণ্ট মত; তাকে তার পার্টটা বুঝিয়ে একটা রিডিং দেবার কথা ছিল; কিন্তু তাদেরও সে ফিরিয়ে দিয়েছিল। বলেছিল—'শরীর ভাল নেই।'

তারপরই সে মিথ্যা কথাটিকে সংশোধন করে নিয়ে বলেছিল—না, শরীর আমার ঠিক খারাপ নয় রঞ্জন। মনের অবস্থা আজ আমার সুস্থ নয়। আর মনে হচ্ছে নাটকখানা আর একবার ভাল ক'রে আমাকে নিজেকে পড়তে হবে। পড়া উচিৎ আমার।

রঞ্জন বলেছিল—নাটক তোমার খুব ভাল হয়েছে অংশুদা। খুব ভাল, খুব জমাট। তা ছাড়া কনজারভেটিব আর রিএ্যাকশানারিদের কাছে হবে বম শেল। ফ্ল্যাট হয়ে যাবে সব। দেখো তুমি।

অংশুমান তাতে মানসিক শান্তি ফিরে পায় নি। মনের মধ্যে যে নিষ্ঠুর দ্বন্দ্ব চলছিল এবং তার ফলে ভালো মন্দ সমস্ত কিছু যে একটা ধূমাচ্ছন্নতার আড়ালে হারিয়ে গিয়েছিল তারও কোন সুরাহা হয় নি। সান্ত্বনার চেয়ে বিরক্তি বা যন্ত্রণাকেই রঞ্জন বাড়িয়ে তুলেছিল। অংশুমান বলেছিল—Please—তোমাকে মিনতি করছি আমি। তোমরা এখন যাও।

রঞ্জন তবু ক্ষান্ত হয় নি। সে বলেছিল—কিন্তু হাতে যে দিন আর নেই।

—না থাকে, তোমরা অন্য বই ধর। এ নাটক এখন থাক।

সুস্মিতা মেয়েটি বলেছিল—তা হ'লে কিন্তু আমার কথাও আমি ফিরিয়ে নিচ্ছি। আমি এই বই শুনেই ওই সত্যবতীর পার্ট করবার কথা দিয়েছি।

অংশুমান সামনের ঘর থেকে শোবার ঘরের দিকে পা বাড়িয়ে বলেছিল—আমার বিশ্রামের প্রয়োজন রঞ্জন। আমি যাচ্ছি। পরে তুমি আমাকে ফোন ক'রে এসো। সুস্মিতা কিছু মনে করো না তুমি।

ঘরের মধ্যে ঢুকে গিয়েছিল সে।

Public Library

সমস্ত অন্তর ক্ষতবিক্ষত হয়ে গিয়েছিল। না পেরেছিল কোন একটা সত্যে পৌঁছুতে—যে সত্যকে আঁকড়ে ধরে ভেঙে পড়ার সমস্ত আবেগকে অনায়াসে সামলাতে পারে—আবার ভেঙে পড়ে একেবারে ধুলোর উপর লুটিয়ে পড়ে হার মানতেও সে পারে নি।

"না। সত্য নয়। সত্য, ধর্ম, ন্যায়, নীতি এ সব অর্থহীন একটা কিছু। আজকে যেটা সত্য কাল সেটা মিথ্যা হয়ে যায়। আজকের ধর্ম কাল জীর্ণ হয়ে যায়, সব থেকে বড় অন্যায় বা পাপ হয়ে দাঁড়ায়।"

"যা সকলে মিলে চীৎকার করে বলে—তাই সত্য হয়ে দাঁড়ায়।"

এত করে এই সব বাছা বাছা যুক্তি-তর্কগুলো মনে মনে চীৎকার ক'রে বলেও কিন্তু মনের অস্বস্তি সে দূর করতে পারে নি।

বার বার মনে মনে বললে—সীতা যাবার সময় সিঁথিতে সিঁদুরের বদলে লাল কালির দাগ নিজে হাতে এঁকে নিয়ে চলে গেল। স্বাভাবিক ভাবে গেল না, একটু থিয়েটার ক'রে গেল। কিন্তু তাতেও কোন জোর পেলে না।

অবশেষে—সে অনেকটা ধড়মড় করে এক সময়ে উঠে বাসা থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল; যাবার সময় হরিকে হেঁকে বলেছিল—আমি বেরুচ্ছি। ফিরতে দেরি হবে।

বলে আর দাঁড়ায় নি। পিছন ফিরে তাকায় নি পাছে হরি তাকে কোন প্রশ্ন করে।

প্রায় সারাটা দিন সে ঘুরেছিল। পথে পথে ঘোরার মত ঘোরা হলেও ঘুরে ফিরে সীতাকেই সে খুঁজে বেড়িয়েছিল।

যে হোমে সে কাজ করত, থাকত, সেখানে গিয়ে শুনেছিল—সেখান থেকে সে চলে গেছে; একেবারেই চলে গেছে। বলে গেছে—সে আর ফিরবে না। বলে গেছে—একজন ঝি শ্রেণীর মেয়েকে। বলে গেছে—বড়দিকে বলো—আমি চলে যাচ্ছি—আর ফিরব না। বলো—হঠাৎ আমার বিয়ের ঠিক হয়ে গেছে।

তা হ'লে?

তা হ'লে কোথায় গেল সীতা? সীতার সন্ধান করতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত সীতার ভাইদের বাসাতে গিয়েছিল। ভাইদের বাসায় সীতার যাওয়ার কথা নয়; ভাই দুজন তার উপর নিষ্ঠুর ভাবে বিরূপ। সীতার জন্য তারা তাদের পৈতৃক বাড়ী বেচতে বাধ্য হয়েছে। ভাজেরা আরও বেশী বিরক্ত। তবুও ওদের বাড়ী গিয়েও খোঁজ করেছিল, কয়েকটা অপ্রিয় কথা শুনেছিল। তাতেও সে ক্ষুণ্ণ হয় নি। বাড়ীর সামনে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করে বাড়ী ফিরে এসেছিল।

কিছুর জন্য যেন সীতাকে তার প্রয়োজন ছিল। একটা বোঝাপড়া, যেটা শেষ না হ'তেই সীতা চলে এসেছে। বোধ হয় তার জন্য। তাদের মধ্যে একটা সম্পর্ক ছিল—সেটা ভাঙলে কে?

* * *

টুকরো টুকরো অজস্র অসংখ্য কথা মনে পড়েছিল। একটা দুটো নয়। অনেক কথা,

অ—নেক—কথা। এগুলোকে ভুলতে চেষ্টা করেও ভুলতে পারে নি। অবশেষে সেদিন বাড়ী ফিরে এসে—সীতার কথা মনে করতে করতে—একখানা বাঁধানো স্বদেশ পত্রিকা টেনে বের করে টেনে নিয়েছিল বইয়ের সেল্‌ফ থেকে।

সামনে মেলে ধরতেই—বাঁধানো পত্রিকাখানার ইংরিজী উনিশশো ষাট, বাংলা তেরশো সাতষট্টি, আশ্বিনের তৃতীয় সপ্তাহের সংখ্যাটির একটি পাতা আপনি বেরিয়ে পড়েছিল—এর পূর্বে বহুবার এই পাতাটা খোলা হয়েছিল এবং সে পৃষ্ঠায় প্রকাশিত ছিল তারই লেখা একটি প্রবন্ধ।

"সীতার পরীক্ষা।"

এই প্রবন্ধটির সূত্র ধরেই সীতার সঙ্গে তার পরিচয়।

রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডের ঘটনা সীতা হরণ।

রাবণ দেবতা রাক্ষস যক্ষ কিন্নর অসুর দৈত্যদের ভয় করতো না। ভয় করতো মানুষকে। সূর্পনখার অপমানের শোধ নিতে সে সীতাকে অপহরণ করবার সংকল্প করেছিল। রামের সঙ্গে সম্মুখযুদ্ধে তাকে বধ করে সীতাকে বলপূর্বক গ্রহণ করতে তার সাহস হয় নি। নর এবং বানরের হাতেই তার বিপদ সে তা জানত। তাই কৌশলে চোরের মত সীতাকে হরণ করতে মারীচকে স্বর্ণমৃগ রূপ ধারণ করিয়ে সীতার মনকে প্রলুব্ধ করেছিল। এ মায়াজাল অব্যর্থ। পরম সোহাগের সোহাগিনী যুবতী নারীর সম্মুখে জীবন্ত স্বর্ণমৃগ। মুগ্ধা সীতা তার রূপযৌবনের মোহমুগ্ধ রামচন্দ্রকে বললেন—তুমি ধরে দাও, আমাকে সোনার হরিণ ধরে দাও।

রামচন্দ্র হরিণের পিছনে ছুটলেন। মারীচ রামচন্দ্রের বাণবিদ্ধ হয়ে মরবার সময় অবিকল রামচন্দ্রের কণ্ঠস্বর নকল ক'রে লক্ষ্মণকে ডাকলেন—আর্তভাবে। সীতা ব্যাকুল হয়ে লক্ষ্মণকে পাঠালেন রামচন্দ্রের সাহায্যে। রাবণ তপস্বীবেশে আবির্ভূত হল—সীতার কুটীর-দ্বারে। এবং লক্ষ্মণের গণ্ডী থেকে ছলনা করে বাইরে এনে বলপূর্বক তাকে অপহরণ করে পুষ্পক রথে তুলে বায়ুপথে চললো লঙ্কার পথে।

পথে বিহঙ্গ-শ্রেষ্ঠ জটায়ুর সম্মুখে পড়ল রাবণ। জটায়ু তাকে বাধা দিল। চূর্ণ করে দিল রাবণের রথ। অগত্যা রাবণ রথ থেকে নেমে—সীতাকে সেই বনে রেখে—জটায়ুর সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হল। তারপর জটায়ুকে বধ ক'রে সীতাকে তার চুলের মুঠোয় ধ'রে ঝুলিয়ে নিয়ে তার রাক্ষসী মায়া-শক্তিতে আকাশপথে লঙ্কার দিকে চলে গেল।

এ ঘটনা সর্বজনবিদিত। কয়েক হাজার বৎসরই এই ঘটনা এইভাবেই মানুষ মেনে নিয়ে এসেছে। কিন্তু কিছুকাল পূর্বে নূতন কালের বিশেষ কোন রাজনৈতিক মতবাদ-উপাসক এক বিদ্বান অধ্যাপক লিখলেন, "রাবণ এইখানে এই বনের মধ্যে জটায়ুকে বধ করার পর সীতাকে দেহগত ভাবে ধর্ষণ করেছিলেন। তিনি এখানে ধর্ষিতায়াং সীতায়াং শব্দ প্রয়োগ করেছেন। এবং আশ্চর্য প্রগতিশীলতা ও সাহসের পরিচয় দিয়েছেন। রাবণকে চরম অত্যাচারী এবং অপরাধী হিসাবে অভিযুক্ত ক'রে পাঠকের দরবারে দাঁড় করিয়ে অত্যাচারী প্রতিপন্ন ক'রে তাকে চরম দণ্ড দিয়েছেন। এবং সব থেকে আশ্চর্যের কথা এই যে—এদেশের

বহুকাঙ্ক্ষিত এবং প্রার্থিত—দেহগত সতীত্বের সংস্কারকে লঙ্ঘন করতে এতটুকু দ্বিধা করেন নি। মহর্ষি বাল্মীকি এইখানে মহাকবি এবং সর্বকালের প্রগতিশীল সংস্কারমুক্ত এক অমর স্রষ্টা।" অধ্যাপকটি প্রায় উচ্চ কণ্ঠেই বলেছিলেন, প্রগতিশীল মহাকবি বাল্মকী এইখানে আশ্চর্য কৌশলে সীতার উপর রাবণের পাশব অত্যাচারের কথা বর্ণনা করেছেন।

সীতা যখন বনের মধ্যে হা-রাম! হা-রাম! বলে কাঁদছেন তখন রাবণ তাকে ধরবার জন্য অগ্রসর হল, সীতা ভয়ে পালাতে চাইলে এবং বনের গাছের আড়াল দিয়ে আত্মরক্ষা করবার চেষ্টা করলে; কিন্তু সে কতক্ষণ? রাবণ সীতার মুক্তবেণী কেশকলাপ ধরে তাকে আকর্ষণ করলে। এবং তাকে ধর্ষণ করে ওই চুলের মুঠোয় ধ'রে আকাশপথে মায়া-বলে উঠে গেল। বাল্মীকি লিখেছেন—এইভাবে ধর্ষিতা সীতাকে দেখে আকাশ কৃষ্ণবর্ণ হল, অরণ্যের বৃক্ষপল্লব নিশ্বাস রুদ্ধ করলে—বায়ুপ্রবাহ বন্ধ হল—সিদ্ধ ঋষিগণ হায় হায় করে সারা হল—ইত্যাদি।

দুটি শব্দ দিয়ে তৈরী একটি আশ্চর্য চিত্র।

"প্রধর্ষিতায়াং বৈদেহ্যাং—"।

সুতরাং সীতাকে রাবণ ধর্ষণ করেছিলেন ওই বনমধ্যে।

অধ্যাপকটি বাল্মীকির ভূয়সী প্রশংসা ক'রে লিখেছিলেন, "আশ্চর্য! দেহগত শুচিতার শুচিবাই নেই—, তথাকথিত সতীত্ব অসতীত্বের কোন বদ্ধ সংস্কার নেই। বর্তমান কালেও ভারতবর্ষ এবং বাংলাদেশ যেখানে পৌঁছুতে পারেনি সহস্র বৎসর পূর্বে এই প্রাচীন মহাকবি সেখানে অনায়াসে উত্তরণ করেছিলেন।" এ ধরণের মন্তব্যে অংশুমান একালের মানুষ হয়েও কিছু চঞ্চল হয়েছিল। ভদ্রলোক এ তথ্যকে রচনা করেছেন বলেই তার মনে হয়েছিল।

অংশুমানের সাহিত্যজীবনের তখন সবে আরম্ভ। ওই অধ্যাপকটি থেকে তার বয়স অনেক কম। এবং সে একজন প্রগতিশীল বলেই নিজেকে বিশ্বাস করে। হিসেব করলে অধ্যাপকের চেয়েও তার মতামত আরও অনেক বেশী প্রগতিশীল। রাজা রামমোহনের জন্ম ১৭৭৪ সালে—সতীদাহ সহমরণ প্রথা বন্ধ ক'রে আইন পাশ হয়েছিল ১৮১৯ সালে। বিদ্যাসাগর বিধবা বিবাহ আইন পাশ করিয়েছিলেন ১৮৫৬ সালে। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁকে মূর্খ বলেছিলেন; কৃষ্ণকান্তের উইলে বিধবা রোহিণীকে গোবিন্দলাল তাঁরই বিধানে গুলি ক'রে মেরেছিল। তারপর সাহিত্যে বিনোদিনী সাবিত্রী কিরণময়ীরা এসে গোটা জাতেরই স্নেহ আকর্ষণ ক'রেছে এবং তাদের মাথায় ঢেলে দিয়েছে হৃদয়ের সহানুভূতি। তারপরও আছে। কল্লোল আমলে 'বিবাহের চেয়ে বড়' জীবনকে কামনা করেছে সাহিত্য, পাঁচিল-ঘেরা অন্দর থেকে মুক্তিও কামনা করেছে যে সাহিত্য সেই সাহিত্যের দরবারের প্রতিনিধি এবং স্বাধীন ভারতবর্ষের হিন্দু কোডবিল পাশ হওয়া সমাজের সাহিত্যিক হয়ে এসেছিল যে অংশুমান, সে অংশুমান নামাবলী গায়ে দিয়ে এবং টিকি ঝুলিয়ে আসে নি; এসেছিল রীতিমত ঢিলেহাতা পাশবোতাম পাঞ্জাবি এবং ঢিলে পাজামা পরে; মাথায় তার বাবরী চুল ছিল না, মুখে দাড়িগোঁফ ছিল না; ইংরিজী ঘাড়-কামানো ছাঁটেও সে চুলছাঁটা বিলিতী ঢঙ নিয়ে আসে নি, বড় বড় বিশৃঙ্খল চুলে বব ছেঁটে দাড়িগোঁফ কামিয়ে ভিতরে বাহিরে সোচ্চার যোগ্যতার দাবী নিয়েই

এসেছিল। সে দেহগত শুচিতা-অশুচিতার প্রশ্নে অধ্যাপকটির মন্তব্যে সর্বনাশ হয়ে গেল এমনতর ভাবনায় মুহ্যমান হবার মানুষ নয়। তবু তার কৌতূহল হয়েছিল। রামায়ণ মহাভারত সে পড়েছে। কৃত্তিবাস কাশীরাম শুধু নয়—আরও পড়েছে। সংস্কৃতও কিছু কিছু পড়েছে। কিন্তু এমন ধরণের ব্যাখ্যা হ'তে পারে বা এমন ঘটনাবিন্যাস বাল্মীকি করেছেন এ কথা সে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারে নি। তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ সীতার অগ্নিপরীক্ষা। এমনিই মন থেকে সে সংস্কৃত রামায়ণ আদ্যন্ত বারকয়েক পড়ে দেখেছিল এবং একটি প্রবন্ধও লিখে ফেলেছিল। "সীতার পরীক্ষা।"

প্রথম পরীক্ষা ত্রেতাযুগে—লঙ্কার রণক্ষেত্রে। অগ্নিপরীক্ষা। দ্বিতীয় পরীক্ষা সেও ত্রেতাযুগে—স্থান অযোধ্যার রাজসভা—। সীতার পাতাল প্রবেশ। বর্তমান তৃতীয় পরীক্ষা কলিযুগে। রামায়ণের প্রাচীন সাহিত্যভূমি খনন করতে গিয়ে পাওয়া গেছে—এক নরকঙ্কাল এবং তার সঙ্গে কিছু আধুনিক অঙ্ককষা প্রমাণ, যার বলে—সীতাকে আবার দাঁড় করানো হয়েছে লোকসমক্ষে। আধুনিক কালের বাল্মীকির নবভাষ্যকার—অরণ্যকাণ্ডে একটি শ্লোক আবিষ্কার করেছেন।

এই শ্লোকের এই ধর্ষিতায়াং সীতায়াং শব্দের অর্থ কি? অধ্যাপক বলেছেন, বলপূর্বক রাবণ এই যে দেহভোগ করেছে তাতে কোন অশুচিতা সীতাকে স্পর্শ করে নাই। এবং এটা নিতান্তই বাহ্য।

এত বড় একজন অধ্যাপকের প্রবন্ধের প্রতিবাদ করতে গিয়ে সে ভেবেছিল যে সে একটা চমকপ্রদ কিছু করেছে। এ কথা যেমন সত্য তেমনি সত্য—সে রামায়ণ তন্ন তন্ন করে প'ড়ে, বিশ্লেষণ ক'রে, বাল্মীকির স্রষ্টা মনটিকে আবিষ্কার করতে চেয়েছিল। আরও একটি সত্য ছিল। আজ সে যে অংশুমানই হয়ে থাকুক—ছেলেবেলায় রামায়ণ পড়ে রাম সীতাকে বড় ভালবেসেছিল—এবং সীতা থেকে পবিত্রতম এবং সুন্দরতম নায়িকা চরিত্র আর ছিল না। তাই প্রাণপণ খেটে নিবন্ধটি লিখে স্বদেশ পত্রিকায় প্রকাশ করেছিল এবং প্রচুর প্রশংসা এবং বহু অভিনন্দন প্রত্যাশা করেছিল। খেটেছিল সে অনেক। এবং বাল্মীকির লেখার সত্যকে আবিষ্কারও করেছিল।

সীতাকে রাবণের মত বলশালী কামার্ত ব্যভিচারীর হাতে দিয়ে বাল্মিকী এমন অপব্যাখ্যা-কারকদের কথা অথবা রূঢ় বাস্তবতার কথা ভাবেন নি, তা কখনওই নয়; নিশ্চয় ভেবেছেন এবং ঠিক যথাস্থানে এর জন্য রক্ষাকবচের ব্যবস্থা করে সীতাকে লঙ্কায় অশোক-বনে চেরীদের মধ্যেও সুরক্ষিত করে গেছেন। দেহগত ভাবে রাবণ তাকে বলপূর্বক ভোগ করলে—'কায়েন মানসা বাচা' এই শব্দ তিনটির সমন্বয়ে এমন একটি বাক্যের সৃষ্টি হত না—যা শুনবা মাত্র মনে হবে এ বাক্য—সীতা ছাড়া আর কারুর নয়। এই বাক্যটি যেন ভারতবর্ষের আবালবৃদ্ধ-বনিতার ঘনিষ্ঠ পরিচয়ে পরিচিত।

ধারণা তার মিথ্যা হয় নি। সে আবিষ্কার করেছিল—বাল্মীকি ওই "প্রধর্ষিতায়াং বৈদেহ্যাং" শব্দ দুটি দিয়ে কেশাকর্ষণের অপমানে অপমানিতা ও "কষ্টে ও লাঞ্ছনায় ক্লিষ্টা ও লাঞ্ছিতা সীতা"—এই কথাই বলতে চেয়েছিলেন। আরও আবিষ্কার করেছিল যে, মহর্ষি

বাল্মীকি তাঁর সারা রামায়ণের মধ্যে বলপূর্বক নারীদেহ-ভোগ বা বলাৎকার অর্থে ধর্ষণ করা বা ধৃষ ধাতু কখনও ব্যবহার করেন নি।

এই তথ্য আবিষ্কার ক'রে তরুণ অংশুমান মনে মনে একটা আশ্চর্য উৎসাহ অনুভব করেছিল; তার অর্থ বোধ করি এই যে, এমন একজন বিজ্ঞ পণ্ডিত অধ্যাপকের ভুল সে ধরেছে। আরও ছিল। মনে মনে সে প্রত্যাশা করেছিল যে, তার এ প্রবন্ধ পাঠকসমাজে আশ্চর্য আলোড়নের সৃষ্টি করবে। মনে পড়েছিল রবীন্দ্রনাথ ঘরে-বাইরে উপন্যাসে—ভিলেন-চরিত্র সন্দীপের মুখ দিয়ে সীতা সম্পর্কে কয়েকটি মন্দ কথা বলানোর জন্য কি পরিমাণ প্রতিবাদ ও রূঢ়তার সম্মুখীন হয়েছিলেন। সুতরাং বঙ্গদেশের এইসব সমাজপতিদের শাসিত সমাজ এই প্রতিবাদের জন্য যে তাকে মাথায় তুলে নেবে এতে তার সন্দেহ ছিল না। তবে সবটাই যে বাহবা পাবার লোভ এ কথাও সত্য নয়। একটি মিথ্যার প্রতিবাদের জন্যও সে এর প্রতিবাদ লেখায় প্রবৃত্ত হয়েছিল এবং খুব পরিশ্রম করেই প্রতিবাদ-প্রবন্ধ রচনা করেছিল সে।

অধ্যাপকের একমাত্র নজীর ছিল একটি বিশেষণ একটি শব্দ। 'ধর্ষিত' শব্দ। বনপর্বের ওইখানটিতে আছে রাবণের রথ যখন ভেঙে পড়ল তখন রাবণ সীতাকে নিয়ে মাটিতে দাঁড়ালেন এবং তাঁকে বনমধ্যে ছেড়ে দিয়ে জটায়ুর সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন। জটায়ুকে বধ করে রাবণ যখন সীতাকে আবার ধরবার জন্য অগ্রসর হলেন তখন সীতা বনের গাছের গুঁড়িকে জড়িয়ে ধরে হা-রাম হা-রাম বলে করুণ কণ্ঠে কেঁদে উঠেছিলেন। রাবণ তখন তাঁর চুলের মুঠি জড়িয়ে ধরে মায়াবলে সোজা আকাশে উঠে গেলেন।

ক্রোশন্তীং রাম রামেতি রামেন রহিতাং বনে।
জীবিতান্তায় কেশেষু জগ্রাহান্তক সন্নিভ॥
প্রধর্ষিতায়াং বৈদেহ্যাং বভূব সচরাচরম্।
জগৎ সর্বমমর্যাদং তমসান্ধেন সংবৃতম্॥

ঝুলানো সীতা ঝুলতে লাগলেন শূন্যলোকে। এইখানে সংস্কৃত রামায়ণের শ্লোকে আছে এবম্বিধ "প্রধর্ষিতায়াং বৈদেহ্যাং"—ধর্ষিত সীতাকে দেখে ত্রিভুবন হায় হায় করে কেঁদে উঠল। এই 'প্রধর্ষিত' শব্দটিকে অবলম্বন করে এই অতি আধুনিক নাস্তিক পণ্ডিত ব্যক্তিটি বলতে চেয়েছিলেন 'প্রধষত' শব্দের অর্থ 'বলাৎকার'। তাঁর নাস্তিক্য তত্ত্বের দিক থেকেই এই পণ্ডিত বাল্মীকিকে বহু বাহবা দিয়ে তাকে অনুগ্রহপূর্বক বলেছিলেন মহাকবি।

অংশুমান তার প্রবন্ধে প্রমাণ করেছিল যে, ওই প্রধর্ষিত শব্দটির অর্থ বলাৎকার নয়। গোটা রামায়ণে বাল্মীকি বলপূর্বক নারীদেহ ভোগ অর্থে কোথাও ধর্ষিত বা ধর্ষণ শব্দ বা ধৃষ্ ধাতু ব্যবহার করেন নি। সেখানে তিনি সর্বত্র ভুঙ্ ধাতু ব্যবহার করেছেন এবং 'বলাৎ ভুঙ্ক্ষ' লিখেছেন। ধর্ষণ ধর্ষিত শব্দ ধৃষ্ ধাতু সর্বত্র তিনি নির্যাতন এবং বিপর্যস্ত করা অর্থে ব্যবহার করেছেন। এ ছাড়াও আরও প্রমাণ সে রামায়ণ থেকে তুলে উপস্থাপিত করেছিল।

রাম যেদিন বানরসৈন্য নিয়ে সেতুবন্ধ তৈরি করে লঙ্কায় এসে উপস্থিত হচ্ছেন সেইদিন রাবণ সভা ডেকে সভাসদদের কাছে প্রথম প্রকাশ করছেন যে, সীতা নাম্নী একটি মানবীকে তিনি অপহরণ করে এনেছেন। সে এখনও তাঁর শয্যাভাগিনী হয় নি। তিনিও তাকে ভোগ

করেন নি। এবং পরামর্শ চেয়ে প্রশ্ন করেছেন—এই মানবীকে কি রামের কাছে প্রত্যার্পণ করতে বল তোমরা? এবং এই প্রসঙ্গেই রাবণ সভাসদদের বলেছেন যে, কিছুকাল পূর্বে কোন এক অপ্সরালোকবাসিনীকে জোরপূর্বক আয়ত্তে এনে তার দেহ ভোগ করার জন্য লোকপিতামহ ব্রহ্মা তাঁকে অভিশাপ দিয়েছেন। বলেছেন নারীর অসম্মতি সত্ত্বেও বলপূর্বক তাকে ভোগ করলে রাবণের দশটি মাথা একশোখানা হয়ে ফেটে যাবে। শতধা বিদীর্ণ হবে।

এইখানে সে লঙ্কাকাণ্ড থেকে শ্লোক কয়েকটি উদ্ধৃত করে দিয়েছিল। রাবণের সভাসদ মহাবল মহাপার্শ্ব রাবণকে বলেছিল—

"যঃ খল্বপি বনংপ্রাপ্য মৃগব্যাল নিষেবিতম্।
ন পিবেন্মধু সংপ্রাপ্য স নরো বালিশোভবেৎ॥
ঈশ্বরস্যেশ্বরঃ কোঽস্তি তব শত্রুনির্বহণ—
রমস্ব সহ বৈদেহ্যা শত্রুনাক্রম্য মূর্দ্ধসু॥
বলাৎ কুক্কুট বৃত্তেন প্রবর্ত্তস্ব মহাবলঃ
আক্রম্যাক্রম্য সীতাং বৈ তাং ভুঙ্ক্ষ্ব চ রমস্ব চ।"

রাবণ উত্তরে বলেছিল—

"মহাপার্শ্ব নিবোধত্বং রহস্যং কিঞ্চিদাত্মনঃ।
চিরবৃত্তং তদাখ্যাস্যে যদবাপ্তং পুরা ময়া॥
পিতামহস্য ভবনং গচ্ছন্তীং পুঞ্জিকস্থলাম।
চঞ্চুর্য্য মানাম দ্রাক্ষমাকাশেঽগ্নিশিখামিব॥
সা প্রসহ্য ময়া ভুক্তা কৃতা বিবসনা ততঃ।
স্বয়ম্ভূভবনং প্রাপ্তা লোলিতা নলিনী যথা॥
তচ্চ তস্য তথা মন্যে জ্ঞানমাসীন মহাত্মনঃ।
অথ সঙ্কুপিতো বেধা মামিদং বাক্যমব্রবীৎ॥
অদ্য প্রভৃতি যামন্যাং বলান্নারীং গমিষ্যসি।
তদা তে শতধা মূর্দ্ধা ফলিষ্যতি ন সংশয়ঃ।"

'রমস্ব' 'প্রবর্ত্তস্ব' 'ভুঙক্ষ' 'রমস্ব' 'ভুক্তা' শব্দগুলির নিচে দাগ দিয়ে চিহ্নিত করে দিয়েছিল সে। এবং একশত বার 'প্রধর্ষিত' ও 'ধর্ষিত' শব্দ ব্যবহারের দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত ক'রে দেখিয়েছিল যে সর্বত্রই তার অর্থ হ'ল—লাঞ্ছিত করা, বিপর্যস্ত করা। লঙ্কাপুরীতে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেওয়াকেও 'লঙ্কা ধর্ষিত হ'ল' বলেছেন রামায়ণের কবি। আবার বানর কটক মধুবন ভেঙে তছনছ করেছে, সেখানেও "মধুবন ধর্ষিত হল" এই কথাই বলেছেন মহর্ষি বাল্মীকি। স্বর্গ জয় করেছে রাবণ ও রাক্ষসেরা, সেখানেও ধৃষ্ ধাতুর প্রয়োগ; লঙ্কা দহন করেছে হনুমান, সেখানেও তাই। দুর্মুখ রাক্ষস ক্রুদ্ধ হয়ে বলছে—

অব্রবীত্তম সংক্রুদ্ধো দুর্ম্মুখো নাম রাক্ষসঃ
ইদং ন ক্ষমনীয় হি সর্ব্বেষাং ন প্রধর্ষণম॥

অয়ং পরিভবো ভূয়ঃ পুরসান্তঃ পুরস্য চ।
শ্রীমতো রাক্ষসেন্দ্রস্য বানরেন্দ্র প্রধর্ষণম।

দৃষ্টান্ত অনেক দেখিয়ে সে লিখেছিল—"বলপূর্বক নারীদেহ ভোগ অর্থে ধৃষ্ ধাতুর ব্যবহার রামায়ণে কোথাও নেই।

রচনাটি প্রকাশিতও হয়েছিল। অবশ্য সেই কাগজে নয় অন্য কাগজে। সে কাগজ লেখাটি ছাপতে ইচ্ছুক ছিল না। তারা এ সম্পর্কে দু-তিনটি মৃদু প্রতিবাদ ছেপেই আলোচনা বন্ধ ক'রে দিয়েছিল।

অংশুমান প্রত্যাশা করেছিল—এই অধ্যাপকের প্রবন্ধ নিয়ে দেশে প্রতিবাদের ঝড় উঠবে। কিন্তু আশ্চর্য! তার কিছুই হয় নি। কোথাও কোন পণ্ডিত বা বিবেচক সাহিত্যিক এ সম্পর্কে একটি কথাও বলেন নি। যে দেশে তিরিশ-চল্লিশ বছর আগে ঘরে বাইরে উপন্যাসের শিক্ষিত ভিলেনের মুখ নিয়ে সীতার চিত্তলোকের কথা নিয়ে কয়েকটা বিরূপ মন্তব্য ক'রে—রবীন্দ্রনাথের মত বিরাট পুরুষ মহাকবি তিরস্কৃত হয়েছিলেন—সেই দেশে এই তিরিশ-চল্লিশ বছরে এমন পরিবর্তন ঘটেছে যে এ নিয়ে কেউ একটুকু বিরক্তও হ'ল না!

তার প্রবন্ধ প্রকাশিত হলে হয়তো কিছুটা আলোড়ন উঠবে, এ প্রত্যাশাও তার মিথ্যা হয়েছিল।

সে তখন সাহিত্যক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠাপ্রার্থী। তার প্রত্যাশা মিথ্যা হওয়ায় সে শুধু আহতই হয় নি খানিকটা ক্রুদ্ধও হয়েছিল।

কয়েকখানা চিঠি পেয়েছিল।

তাও বেশীর ভাগ চিঠিতে প্রশ্ন ছিল—"আপনি অধ্যাপক মহাশয়ের সুচিন্তিত এই ব্যাখ্যায় এমন ক্রুদ্ধ হয়েছেন কেন? কি এমন অযুক্তির কথা তিনি লিখেছেন।

মনে পড়ছে তার সঙ্গে সাম্প্রতিক দাঙ্গায় নোয়াখালি অঞ্চলে যে সব মেয়েরা গুণ্ডাদের দ্বারা লাঞ্ছিত হয়েছিল, যাদের লুঠে নিয়ে গিয়েছিল গুণ্ডারা তাদের কথা তুলে প্রশ্ন করেছিল—"এদের সম্পর্কে কেউ যদি বলে যে, দৈববল এমন ভাবে তাদের রক্ষা করেছে—যার জন্য এদের অঙ্গ স্পর্শ বা এদের ধর্ম নষ্ট কেউ করতে পারে নি—তা হলে সেটা বিশ্বাসযোগ্য হবে?"

একখানা চিঠির জবাব দিয়ে সে লিখেছিল—আপনি আমাকে ভুল বুঝেছেন। আমার বক্তব্য এই অধ্যাপকটি ইচ্ছাপূর্বক ভুল ব্যাখ্যা করে বাল্মীকির মানসকন্যার অঙ্গে কালি লেপন করেছেন। দেহগত শুদ্ধতার মূল্য আমার কাছে কতটা প্রশ্ন এখানে—তা নয়, প্রশ্ন বাল্মীকি কি মূল্য দিতে চেয়েছেন তাই। মূল্য কষ্টিপাথরে সোনার দাগের মত সীতার দুটি পরীক্ষায় তাঁর শপথবাক্যের মধ্যে নির্ণিত হয়েছে। লঙ্কাকাণ্ডে অগ্নিপরীক্ষা এবং উত্তরকাণ্ডে সীতার পাতাল-প্রবেশের সর্গে এগুলি পাবেন।

কায়েন মনসা বাচা—যথা গতি চরাচরম্।
রাঘবং সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞং তথাসাং পাতু নাবকঃ॥

হল— মনসা কর্ম্মণ বাচা যথা রামং সমর্চ্চয়ে
তথা সে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি॥

এ পত্র একজন খ্যাতনামা ইংরাজী সাহিত্যবিদকে লিখেছিল অংশুমান। এর উত্তর আসে নি। কিন্তু এ পত্রের প্রতিক্রিয়ায় যা ঘটেছিল তা শুনতে পেয়েছিল অংশুমান। অধ্যাপক ভদ্রলোক চিঠিখানা দুমড়ে বাড়ীর সামনে রাস্তার উপর ফেলে দিয়েছিলেন। কেউ সেটা দেখতে যায় নি, তিনি এটা নিজেই তাঁর বন্ধুমহলে প্রচার করেছিলেন। তাদের একজনের কাছে শুনে অন্য একজন এসে কথাটা তার কানে তুলে দিয়ে গিয়েছিল। তবে এ সব চিঠির জন্য তার মনে কোন গ্লানিবোধ সে করে নি।

লজ্জিত এবং কুণ্ঠিত হয়েছিল একজন হিন্দুসভা-পন্থী রাজনৈতিক কর্মীর অভিনন্দনে। হয়তো একটু ভুল হ'ল—লজ্জিত এবং কুণ্ঠিত শব্দ দুটো ঠিক হ'ল না ; লজ্জিত, কুণ্ঠিত হয় নি—একটি অস্বস্তি-বোধ তাকে কিছুটা উৎকণ্ঠিত ক'রে তুলেছিল। মনে হয়েছিল—প্রতিবাদটা নিশ্চয়ই মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে।

* * *

এর-পরই সীতার সঙ্গে তার দেখা হয়েছিল।

আশ্চর্য একটি মডার্ন মেয়ে।

সেই প্রথম দেখা হওয়ার কথা তার মনের মধ্যে অক্ষয় হয়ে আছে। সীতা দীপ্তিমতী মেয়ে। রূপসী ঠিক বলা চলে না। নাকে চোখে মুখে গড়নে খুঁত আছে অনেক। রঙটা খুব ফরসা। তার মধ্যে রক্তাভার ঈষৎ উগ্রতা আছে। চোখ দুটির তারা কালো নয়—খয়েরি ; চুল আছে একরাশ কিন্তু সে চুলে কালো লাবণ্যের অভাব আছে। সেগুলোকে খাটো ক'রে কেটে এবং শ্যাম্পু করা রুক্ষতায় এমন বিদেশী ছাপ ফেলেছে—যাতে তাকে অবাঙালী এমন কি অভারতীয় বলেও চালানো যায়। তার উপর সেদিন তার সাজসজ্জা বেশবাস সবই ছিল একটি পরিকল্পিত বৈশিষ্ট্যে বিশিষ্ট। নিজে সে খুব বড়ঘরের ছেলে নয়, তবে সচরাচর গেরস্ত বাড়ীরও নয় ; নিজেদের হীরে-জহরতের গয়না ছিল না—সোনা-রূপো ছিল। তবে বড় আত্মীয় ঘরের মেয়েদের পান্নাসেট প'রে সাজা—হীরের সেট প'রে সাজা সে দেখেছে। সেদিন যেন এ মেয়েটি কাপড়ে-চোপড়ে রুবিসেটের গয়নায় সাজা মেয়েকে মনে পড়িয়ে দিয়েছিল।

মনে পড়ছে—দীর্ঘাঙ্গী রক্তাভ গৌরবর্ণা একটি মেয়ে, পরনে আগুনের শিখার মত রঙের নাইলনের শাড়ী—তারই সঙ্গে ম্যাচ ক'রে লাল সাটীনের ব্লাউস—পায়ে লাল রঙের স্ট্র্যাপওয়ালা স্যাণ্ডেল, তারই মধ্যে একটি মিষ্টি মুখ—কপালের মাঝখানে একটি কুমকুমের টিপ, কানে দুটি লাল পাথরের ইয়ারিং। রুখু চুলের ডবল বেণীতে টকটকে লাল ফিতের ফুল। তার বাড়ীর বারান্দার ধারে হাত জোড় করে নমস্কার করেছিল।

তার দিকে তাকিয়ে বেশ একটু বিস্ময় অনুভব করেছিল অংশুমান। তখনও সে সাজ-সজ্জার সন্নিবেশ বিশ্লেষণ ক'রে খতিয়ে দেখেনি—কিন্তু এমন সুপরিকল্পিত মেকআপের প্রভাবটুকুকে সে ঠিক অনুভব করতে পেরেছিল। এবং সে ছবি তার আজও মনে পড়ছে। তাই সে প্রথম বারেই না-হলেও, পরে যতক্ষণ সে ছিল—ততক্ষণ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তার সাজ-সজ্জা দেখছিল।

ওই প্রবন্ধ বের হবার মাস তিনেক পর।

তার নতুন কেনা বাড়ীতে সে স্থায়ী হয়ে বসেছে; নিজের জীবনের পথও ঠিক ক'রে নিয়েছে। তার পৈতৃক উত্তরাধিকারসূত্রে তার সম্মুখে পথ কয়েকটা খোলাই ছিল। জমি নিয়ে ফার্মিং করা মানে চাষবাস, তার সঙ্গে পোলট্রি ফিশারী, তার সঙ্গে হাস্কিং মেসিনও একটা চলতে পারত; রাজনীতি, বাবা তার কংগ্রেস লীডার ছিলেন। বাবার পর তার মা হয়েছিলেন কংগ্রেস কমিটির প্রেসিডেন্ট, এখন তার বৈমাত্রেয় দাদা প্রেসিডেন্ট। অনায়াসে সে রাজনীতি করতে পারত; পি. এস. পি, কি সি. পি. আই, কি আর. এস. পি-তে যোগ দিতে পারত। আরও আছে ওদের, রাইস মিল আছে—তা নিয়ে থাকতে পারত। এক বৈমাত্রেয় দাদা ওই রাইস মিল নিয়ে আছে। তা ছাড়া সে নিজে বি. এ পাশ করেছিল ভাল ভাবে। এম. এ-তে সে আরও ভাল ফল করতে পারত—কিন্তু পরীক্ষা দেয় নি। ছাত্র জীবনের রাজনীতি স্টুডেন্টস মুভমেন্ট করতে করতে পরীক্ষা না-দিয়ে না-দিয়ে বছর কয়েক কাটিয়ে কবি, নাট্যকার, গল্পলেখক এবং তার সঙ্গে অভিনেতা হিসেবে একটি লোভনীয় প্রতিষ্ঠা অর্জন করে সেই পথকেই জীবনের পথ বলে গ্রহণ করেছে।

গ্রহণ করেছে কেন—বেশ কয়েক পা চলা হয়ে গেছে। এবং তখন সে বিশ্বসংসারে একা হয়ে গেছে।

বাবা অনেক দিন মারা গেছেন। ১৯৪৭ সালে। স্বাধীনতা দিবসে। মা-ও মারা গেছেন চার বছর হ'ল। অবশ্য তার আগেই মতবিরোধ হয়ে মায়ের সঙ্গে সম্পর্ক শেষ হয়ে গিয়েছিল। সৎমা—সৎভাইরা আছেন, তাদের সঙ্গে সম্পর্কও নেই। গ্রামের সঙ্গেও নেই। পৈতৃক সম্পত্তি বিক্রী করে দিয়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে একক এবং একেবারে মুক্ত ব্যক্তি হয়ে এই সাহিত্য সঙ্গীত ও অভিনয় সাধনার পথে দূর দিগন্তের দিকে তাকিয়ে বসে আছে।

সেদিন সে নতুন নাটকের কথা ভাবছিল।

এ যুগের মন তার, যে-মন অতীত যুগের সব চিন্তাকে সব ধারণা-ধ্যানকে অস্বীকার করতে চায়; সমাজে রাষ্ট্রে—ধর্মের নামে, আইনের নামে মানুষের জীবনে যত বাঁধন যত গিঁট আছে সমস্ত কিছুকে ভেঙেচুরে ধুয়ে মুছে নূতন এক সমাজ চায়। তেমনি একখানা নাটক লিখবে সে।

আজও মনে পড়ছে তার মনে তখন তার নিজের একটি ধারণা গড়ে উঠেছে। অবশ্য এ ধারণার সঙ্গে এ যুগের চিন্তার এবং ধারণার স্বাভাবিক ভাবেই সম্পর্ক ও সাদৃশ্য গভীর।

বন্ধন যেখানে—গ্রন্থিই সেখানে মূল। ঘরসংসার সম্পর্ক জাতি ধর্ম আত্মীয় বন্ধু নিয়ে সমাজ-জীবনের মূল গ্রন্থি দাম্পত্যজীবন—বিবাহ। এবং গ্রাম দেশ রাষ্ট্রের মূল গ্রন্থি হ'ল জমির উপর অধিকার। এবং এই দুটো নিয়েই আজ আর মিথ্যাচার ও ব্যভিচারের শেষ নেই। এই ভাবনার কাঠামোয় নাটকের প্রতিমা গড়বার জন্য সে কাহিনীর উপাদান খুঁজছিল মনে মনে।

মহাভারত থেকে কাহিনী খুঁজে সে বের করেছিল।

নাটকের নাম দেবে স্থির করেছিল—দ্বৈপায়ন।

মৎসগন্ধা সত্যবতীর সঙ্গে ঋষি পরাশরের একদিনের বাসর। মৎসগন্ধা হ'ল যোজন গন্ধা।

ধীবর-কন্যা হ'ল—পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মনীষি ও মহাকবির জননী। তারপর সে হ'ল ভারতেশ্বরী। মহারাজ শান্তনুর মহিষী।

তার ফল হ'ল চিত্রাঙ্গদা ও বিচিত্রবীর্য।

তাদের অকালমৃত্যু হ'ল।

রাজ্যাধিকার রক্ষার জন্য অম্বিকা অম্বালিকার গর্ভে ক্ষেত্রজ পুত্রের ব্যবস্থা হ'ল। প্রয়োজনের জন্য প্রেমহীন সংসর্গের ফল—একজন অন্ধ, একজন বিবর্ণ পাণ্ডুর বর্ণ—দুর্বল অক্ষম।

একখানা খাতায় এই কথাগুলি লেখা আছে। লেখক হিসেবে সে নোট-বই রাখে। মনে পড়ছে, নাটকের পরিকল্পনাটুকু লিখে তার একটি মন্তব্যও সে লিখেছিল পাশে। লিখেছিল—"সমাজতন্ত্রমুখী পৃথিবী এবং রাষ্ট্রে, পূর্ণ নারী-স্বাধীনতা-ঘোষিত সমাজে—এ ছাড়া আর কোন দ্বিতীয় সত্য আছে?"

ঠিক এই সময়েই ওই অগ্নিবর্ণা মেয়েটি এসে তার বারান্দার সামনে দাঁড়িয়ে হাত জোড় ক'রে নমস্কার করেছিল তাকে—নমস্কার।

অংশুমান তার দিকে তাকিয়ে ভ্রূ কুঞ্চিত করেছিল। কিন্তু এমন একটি শ্রীময়ী দীপ্তিময়ী, বিশেষ ক'রে এমন যত্ন ক'রে লাল সাজে সাজা একটি মেয়েকে দেখে দুঃস্বপ্নের মত জটিল ওই চিন্তার মধ্য থেকে বেরিয়ে এসে আনন্দের নিশ্বাস ফেলে বেঁচেছিল। তার দিকে তাকিয়ে খুশী হয়েই প্রসন্ন হাসির সঙ্গে বলেছিল—আসুন—ওই যে, ওই ফটক দিয়ে ঘুরে আসুন।

অংশুমান বসেছিল বারান্দায়। বারান্দাটা প্যারাপেট এবং গ্রীল দিয়ে ঘেরা, বাড়ী ঢুকবার ফটক পাশের ফটক দিয়ে।

মেয়েটি ঘুরে ফটক খুলে ভেতরে এসে বলেছিল—আমি একটু ভেতরে যাব। বাড়ীর মেয়েদের সঙ্গে দেখা করব।

আপনা-আপনি মুখ থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল—কি ব্যাপার? ইলেকশন? না—কোন পার্টির ক্যানভাসিং?

মেয়েটি বলেছিল—না। পালটিকাল পার্টি-টার্টি নয় তবে আমি ক্যানভাসার সত্যি। বিজিনেস পার্টির—।

একটু হেসে অংশুমান বলেছিল—যা বলবার আমাকেই বলুন। বাড়ীতে মেয়ে কেউ নেই।

—যাক তা' হ'লে অন্যদিন আসব—এই—

তার কথা শেষ না হতেই অংশুমান বলেছিল—সেদিনও কোন মেয়েকে পাবেন না। কারণ আমার সংসারে—। একটু থেমে বোধ করি কি বললে ভাল শোনাবে ভেবে নিয়ে বলেছিল—আমি অবিবাহিত।

—ও! বলে একই সঙ্গে অপ্রতিভ এবং যেন খানিকটা বিস্মিত—দুইই হয়ে উঠেছিল। এবং আর কোন কথা যেন খুঁজে পায় নি। অংশুমান নমস্কার ক'রে বিদায়-সম্ভাষণ জানাতে যাচ্ছিল—ঠিক সেই সময়ে মেয়েটি বলেছিল—আমার এটা ঘর-সংসারের ব্যাপার—

অংশুমান বলেছিল—বেশ তো আমাকেই বলুন। আমার গৃহিণী না থাক গৃহ আছে এবং গৃহকর্তা আমি। শাড়ী ব্লাউস জাতীয় একেবারে 'ফর লেডিজ ওনলি' না হলে আমাকে বলতে পারেন।

একটু হেসে সে বলেছিল—না—তা নয়, 'ফর লেডিজ ওনলি' নয়; একেবারে ঘরের ব্যাপার, রান্নাশালের; ইলেকট্রিক কুকার, কেটলী—হীটার; কয়লায় ঘুঁটেতে ধোঁয়া হয় কালী হয় ঝুল পড়ে—। এ একেবারে পরিচ্ছন্ন ব্যাপার। তা ছাড়া অটোমেটিক ব্যবস্থা আছে।

—তা বেশ। একদিন এনে ডেমনেস্ট্রেশন দিয়ে দেখিয়ে একটা কিছু দিয়ে যাবেন।

—একটা কিছু কেন? সবই ইলেকট্রিক ক'রে নেবেন না কেন? একসঙ্গে গরুরগাড়ী আর মোটর দুটোর উপর দুই পা দিয়ে চলা যায়?

হেসে ফেলেছিল অংশুমান। বলেছিল—চমৎকার কথা বলেন আপনি।

মেয়েটিও হেসে বলেছিল—ক্যানভাসিংয়ের ওইটেই তো প্রথম গুণও বটে শেষগুণও বটে।

—হ্যাঁ। একেবারে অদ্বিতীয় একক সত্য বলে প্রমাণিত করতে হবে।

—আমি কিন্তু মিথ্যাকে সত্য বানাচ্ছি না। আমাদের বাড়ীতে সব ইলেকট্রিক—আমি দেখছি—বিশ্বাস করি—।

অংশুমান একটু যেন কাতর ভাবেই বলেছিল—মধ্যে মধ্যে যে ফিউজ হয়ে যায়। ভাত চাপিয়ে মাঝখানে উনোন নিভে গেলে—কাঠ ঘুঁটে গুঁজে দিলে চলে, নিদেন কাগজ পুড়িয়েও কাজ সারা যায়। এর কিন্তু কয়েল পুড়লে—অন্ধকার। আমার হাটার একটা আছে তো!

—না-না-না। এ খুব ভালো জিনিস। আমরা গ্যারান্টি দেব। ডিফিকালটি হলে আমাদের মিস্ত্রী আসবে—আমি আপনাকে এখনি দেখাতে পারি—। বলেই সে রাস্তার দিকে ফিরে ডেকেছিল, আয়ার—আয়ার!

আয়ার নিশ্চয় মাদ্রাজী। কিন্তু একজন হিন্দুস্থানী মাথায় একটা বোঝা নিয়ে একটু এগিয়ে এসে বলেছিল—আভি আসবে। উধর গেল। সিগারেট মৌলতে গেল।

এতক্ষণ একজন কালো সাহেব আর মাথায় মস্ত মোট বহনকারী এই হিন্দুস্থানীটিকে কোন সূত্র দিয়ে যুক্ত করতে পারে নি।

* * *

অংশুমানের বাড়ীতে তার সব কিছু করে তার একমাত্র অনুচর ভরতচন্দ্র। উড়িষ্যাবাসী এই অল্পবয়সী ছেলেটির গুণ কার্যক্ষমতা অসাধারণ। অংশুমানের মত মানুষের জীবনেও সে কোন অসুবিধা ঘটতে দেয় না। অংশুমানের বন্ধুজনে বলে অংশুমানের বাহন।

অংশুমান বলে—হ'ল না। বিষ্ণুর বাহন গড়ুর, রামের বাহন মারুতি গন্ধমাদন উপড়ে রণে অসাধ্য সাধন করে কিন্তু রান্না-বান্না ক'রে খাওয়াতে পারে না, অসুখে-বিসুখে মাথার শিয়রে বসে কপালে জলপটী দিতেও পারে না, বাতাস করতেও পারে না। ডাকবা মাত্র সাড়া

এরাও দেয় ভরতও দেয় কিন্তু বিশবার চা করতে বললে করবে না। ভরত আমার রামের ভরত থেকেও বেশী। অতঃপর সেই ভরতচন্দ্রকে ডেকে তার মত নিয়ে একটা ইলেকট্রিক কেটলী—একটা প্রেসার কুকার—একটা স্পেশাল হীটার কিনেছিল মেয়েটির কাছে। ডেমনেস্ট্রেট ক'রে দেখাবার জন্য ইলেকট্রিক কেটলীতে জল গরম ক'রে চা তৈরী ক'রে খাইয়েছিল মেয়েটি।

এই চায়ের আসরে সে হঠাৎ বলেছিল—রামায়ণ আপনার খুব ভাল লাগে, না?

তার মুখের দিকে তাকিয়ে অংশুমান বলেছিল—হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন? তারপরই বলেছিল—রামায়ণ কার ভাল লাগে না? আপনার লাগে না?

মেয়েটি অপ্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল। বলেছিল—না—মানে, এর নাম ভরত—

—ভরত ওর নাম—ওর বাপ মা রেখেছে, আমার কাছে চাকরি করছে—সেটা একটা ঘটনাচক্র মাত্র; অন্য নাম হ'লেও কিছু আসতো যেতো না।

এবার সে বলেছিল বা বলতে বাধ্য হয়েছিল যে সে তার ওই প্রবন্ধটি পড়েছে।

খুশী হয়েছিল অংশুমান। বলেছিল—এই ধরণের প্রবন্ধ পড়া অভ্যাস আছে? পড়েন!

কুণ্ঠার সঙ্গে বলেছিল—সচরাচর পড়িনে, এটা পড়েছিলাম। আমার বাবার খুব বন্ধু হলেন ওই প্রফেসর বোস, যিনি মূল আর্টিকলটা লিখেছিলেন। বাবা বলছিলেন ওটা খুব বোল্ড। আমার বাবা আপনার প্রবন্ধ পড়ে ঠিক করেছিলেন প্রতিবাদ লিখবেন কিন্তু লেখেন নি, কারণ কোথায় কম্যুনাল কোশ্চেন হয়ে দাঁড়াবে। মানে আমরা কৃশ্চান তো!

কথাটা ওইখানেই চাপা দিয়েছিল বা দিতে চেয়েছিল অংশুমান। মেয়েটিই জের টেনেছিল। বলেছিল—কিন্তু আপনি তো অর্থোডক্স নন।

—এর সঙ্গে অর্থোডক্সির সম্পর্কটা কি? কিছু রূঢ় হয়ে গিয়েছিল কণ্ঠস্বর।

মেয়েটি একটু চকিত ভাবে শঙ্কিত হয়ে উঠেছিল। বলেছিল—বাবা আর তাঁর ওই বন্ধু বলছিলেন—; এ-কালে 'কায়েন মনসা বাচা'—ওইটে—; থেমে গিয়েছিল সে।

অংশুমান বলেছিল—এ শপথ ত্রেতা যুগের সীতার শপথ। সেইটেই আমি বলেছি। আমি অর্থোডক্স নই। আমি হ্যাম খাই। আমি ঈশ্বর মানি নে। আমাদের পৈতৃক দেবোত্তর আছে—দেবতাকে প্রণাম করতে হবে, পূজো করতে হবে বলে তার ভার নিই নি—। সুতরাং অর্থোডক্সির কোন প্রশ্নই নেই।

এরপর মেয়েটি চুপ করে গিয়েছিল। কোন উত্তর না দিয়ে শুধু বসেই ছিল। অংশুমানের মনে হয়েছিল মেয়েটি উঠতে চাচ্ছে কিন্তু ভদ্রতার খাতিরে বা কোন রকম সঙ্কোচের কারণে উঠতে পাচ্ছে না।

আয়ার নামের মাদ্রাজীটি চুপচাপ কথাগুলো শুনেই যাচ্ছিল—একটু দূরেই বসেছিল সে। বদরী বসে ঢুলছিল। কথাবার্তার মধ্যে অকস্মাৎ ছেদ পড়তেই ওঠবার তাগিদ দিয়েছিল আয়ার। লোকটি বাংলা ভাল জানে না। কোন রকমে কাজ চালিয়ে যায়—খানিকটা হিন্দী খানিকটা বাংলা আর খানিকটা ইংরিজী মেশানো একরকম বুলিতে। সে বদরীকে

চমকে দিয়ে একটু জোরেই বলে উঠেছিল—এ—ব-দ্-রী—। দেখো বৈঠকে বৈঠকে আরামসে স্লীপিং—। গেট আপ ম্যান। উঠাও—মাল উঠাও। মিস সেন।

বিদায়-নমস্কারটা অংশুমানই আগে জানিয়েছিল। হেসে বলেছিল—আচ্ছা নমস্কার। সীতাও উঠে দাঁড়িয়েছিল এবং প্রতিনমস্কার জানিয়ে বলেছিল—কোন কিছু খারাপ হলেই কোম্পানীতে ফোন করে জানিয়ে দেবেন। বলবেন মিস সেন—সীতা সেনের কাছে জিনিস নিয়েছি।

এবার একটু চমক লেগেছিল অংশুমানের। তার মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছিল—আপনার নাম সীতা সেন?

সীতা একটু হেসেই বলেছিল—হ্যাঁ।

তারপর মুখ তুলে খুশী-হওয়া ভঙ্গিটিকে প্রকাশ করেই বলেছিল—যা ভয় হয়েছিল প্রথমটা।

—কেন?

—ভেবেছিলাম—গোঁড়া একজন খুব রাগী মানুষ হবেন। আর হয়তো—

—কি?

—ভেবেছিলাম—অনেকটা বয়স্ক মানুষ আপনি—। সেকেলে আধবয়সী মোটাসোটা—। হেসে ফেলেছিল এতক্ষণে।

ভুরু কুঁচকে অংশুমান ভাবছিল মানুষ এমন ভাবলে কেন? সে তো শুধু বিকৃত ব্যাখ্যা করার জন্য প্রতিবাদ ক'রে তার সত্য অর্থটা প্রবন্ধে তুলে ধরতে চেয়েছিল। সীতার হাসি শেষ মুহূর্তে তাকে কিছুটা শান্ত এবং স্মিত করে তুলেছিল। সীতা এবার পিছন ফিরে আয়ার এবং বদ্রীকে বলেছিল—চলো।

আয়ার বলেছিল—বাট্—উই আর অলরেডি লেট—বাই হাক এ্যান আওয়ার।

—তাতে কিছু হয় নি। চলো। আমরা বাঙালী আয়ার, সায়েব নই। চলো।

অংশুমান প্রশ্ন করেছিল—কোথায় যাবেন?

—এই কাছেই। একটা বড় অর্ডার আছে। মালগুলো তাদেরই। পথে আপনার বাড়ীতে আপনাকে দেখে—

কাপড়ের আঁচলখানায় বেশ একটু দোলা লাগিয়ে বারান্দা থেকে নামতে নামতে বললে—ভারী ভাল লাগল। জানেন—।

ভারী ভাল লাগল।

* * *

এই সীতার সঙ্গে প্রথম পরিচয়।

এই প্রবন্ধটির জন্য সে তাকে দেখতে এসেছিল। সেবারের পরিচয় ওখানেই শেষ। দ্বিতীয়-বার দেখা না হলে সীতার কথা আর কোন দিনই মনে হ'ত না। সীতা তার জীবনেই আসত না এবং আজকের এই মর্মান্তিক আঘাতের সম্মুখীন হ'ত না।

এ আঘাত প্রচণ্ড—এ আঘাত বোধ করি সমস্ত আঘাতের মধ্যে নিষ্ঠুরতম আঘাত।

কয়েক ফোঁটা চোখের জল টপটপ ক'রে ঝ'রে পড়ল।

সীতার সঙ্গে যদি তার দেখা না হ'ত। সেদিনের এই দেখা হওয়াটা কোন একটি সভা-সমিতিতে দেওয়া একটি ফুলের গুচ্ছের বেশী কিছু নয়।

না।

সীতার সঙ্গে সেদিন দেখা না হলে দ্বিতীয় প্রবন্ধটি সে লিখত না।

সীতার সঙ্গে দেখা হওয়ার পর, ওই প্রথম প্রবন্ধের জের টেনেই যেন সে আর একটি প্রবন্ধ লিখেছিল। সে প্রবন্ধটি প্রথম প্রবন্ধটির ঠিক উল্টো। বাল্মীকির রচনার ব্যাখ্যা নয়, বাল্মীকিকে সে সমালোচনা করেছিল।

সীতার সঙ্গে দেখা হওয়ার পর একটা রূঢ় প্রতিক্রিয়া হয়েছিল তার মনে। এমনি একটি অল্পবয়সী মেয়ে তাকে সভয়ে সবিস্ময়ে দেখতে এসেছিল; ধারণা করেছিল সে একজন গোঁড়া হিন্দু ধার্মিক, স্বভাবে সে রাগী মানুষ, বয়সে সে প্রবীণ যার অর্থ সে সেকেলে, সে পুরানো অচল!

এটা শুধু ওই সীতা নাম্নী নবীনা মেয়েটির ধারণাতেই সীমাবদ্ধ নয়, এ কালের মেয়েদের ছেলেদের প্রগতিশীল মানুষদের সবারই ধারণায় এটা একটা কোন দেবমন্দিরের পুষ্পকুণ্ডের বাসী ফুলের গন্ধ-বহা হাওয়ার মত ছড়িয়ে পড়েছে। এ যুগে 'রিলিজিয়াস' 'অর্থোডক্স' কথা দুটো ভালো কথার সূচীর মধ্যে পড়ে না। বামুন পণ্ডিত মোল্লা মৌলভী এ শব্দগুলোর আসল মানে যাই হোক বা এককালে যাই থেকে থাক এ যুগে এ শব্দগুলোর অর্থ সাপ বিছে কাঁকড়া-বিছের মত একটা বিষাক্ত এবং ঘৃণ্য অর্থ বহন করে। এই সীতা মেয়েটি সেদিন এসে তাকে এই খবরটাই দিয়ে গিয়েছিল যে বাল্মীকির শ্লোকের অপব্যাখ্যা এবং সীতা চরিত্রের অন্তর্নিহিত কবি-কল্পনার বিকৃতির প্রতিবাদ করতে গিয়ে সে গোঁড়া ধার্মিক—সেকেলে এবং রিলিজিয়াস রিএ্যাকশনারী বলে পরিচিত হয়েছে।

এর একটা নিদারুণ অস্বস্তি আছে। না, অস্বস্তির থেকেও বেশী। এ একটা অসহনীয় মর্মযন্ত্রণা।

অথচ সে তার ঠিক বিপরীত।

তার বাপ বিদ্রোহ করেছিলেন। তার মাও ছিলেন বিদ্রোহী। তার সূতিকাগার থেকে তার বিদ্রোহ আর বিপ্লবের মন্ত্রে দীক্ষা।

এর জন্যই সে দ্বিতীয় প্রবন্ধ লিখেছিল। প্রবন্ধের নাম ছিল বাল্মীকি ও বেদব্যাস। দীর্ঘ প্রবন্ধ। আজ মনে হচ্ছে লেখার মধ্যে নানা স্থানে রক্ষণশীলতাকে ব্যঙ্গ করার মধ্যে মাত্রা সে অনেকবার ছাড়িয়েছিল। পূর্ব প্রবন্ধ লিখে সে যত জ্বালা অনুভব করেছিল আজ বাল্মীকি বেঁচে থাকলে—অথবা পরলোকে তাঁর আত্মা অবিনশ্বরত্ব লাভ করে থাকলে তার চেয়ে অনেকগুণ বেশি জ্বালা অনুভব করতেন বা করবেন এতে সন্দেহ ছিল না। এ প্রবন্ধে সে রামায়ণ-মহাভারতের বাস্তবভীতিকে উদ্ঘাটিত করে উপহাস বল উপহাস, কষাঘাত বল কষাঘাত, তাই করেছিল। অথবা বলা যায় সমাজের মুখ রক্ষা করতে সতীত্বের মহিমা অক্ষুণ্ণ রাখতে সত্যকে আটক আইনে বন্দী করে দেবলোকের জেলখানায় বন্দী করা হয়েছিল।

প্রথম লিখেছিল যে সীতা মাত্র একটি সোনার হরিণ দেখে এমন বিমোহিত হল যে রামকে পাঠালে—যাও তুমি ধরে এনে দাও। দিতেই হবে। "যে যা বলিস ভাই—আমার সোনার হরিণ চাই।" যার যা হবে হোক না তাতে আমার কিছু নাই। কিন্তু সেই সীতা স্বর্ণলঙ্কায় এসে সোনার বাড়ি সোনার ঘর দেখে ভুলল না কেন? কেন সে অনশন সত্যাগ্রহ করে পড়ে থাকল অশোকবনে, তার সংগত কোন কারণ নেই। তারপর সে লিখেছিল—মহাকবি তাঁর সৃষ্ট ওই সীতা নাম্নী মানবী এবং মানবকুলবধূর দেহের শুচিতা নিয়ে মারাত্মক বিপদে পড়েছিলেন। সত্যের সম্মান রাখি, না সতীত্ব-মহিমার মাটির ঠাকুরকে পুজো করি; বাস্তবকে বাস্তব স্বরূপে তুলে ধরি, না সমাজের হুকুমকে তামিল করে শিরোপা শিরোধার্য করি এই সমস্যার মধ্যে পড়ে একবার নয় দু'দুবার দৈব ম্যাজিকরূপ অসম্ভব ও অলৌকিকের শরণাপন্ন হয়েছেন। এবং সুকৌশলে পূর্ব প্রবন্ধের কথা স্মরণও করিয়ে দিয়েছিল সে। বুঝিয়ে বা জানিয়ে দিয়েছিল যে এ প্রবন্ধ তার পূর্ব প্রবন্ধেরই শেষ কথা বা আসল কথা। প্রবন্ধে সে এনে ফেলেছিল সেই সীতা-হরণের কথা। জটায়ু প্রসঙ্গ।

"জটায়ুকে বধ করে চুলের মুঠো ধরে ঝুলিয়ে সারা আকাশপথ অতিক্রম করে লঙ্কায় এসে অশোকবনে সীতাকে চেড়ীর পাহারায় রেখেও দশানন তাকে ভোগ করতে সাহস করলেন না। মানবিক উদারতা রাক্ষসের নেই। রাবণের তো নেইই। তবুও পারলে না। কেন পারলে না তার কারণ রাবণ নিজমুখেই ব্যক্ত করেছে তার সভাসদদের সম্মুখে। বলেছে লোকপিতামহ ব্রহ্মার অভিশাপে অভিশপ্ত—নারীর বিনা সম্মতিতে বলপূর্বক তার দেহ ভোগ করলে আমার দশমাথা শতধা বিদীর্ণ হবে।"

রাবণের অশোকবনে সীতাকে এনে ফেলে কবি সম্ভবতঃ সমাজের এবং রাজা মহোদয়ের (তিনি হয়তো রাম) রক্তচক্ষু স্মরণ করে বিচলিত হয়ে মা সরস্বতীর রাঙাচরণ দুখানির উপর আছড়ে পড়েছিলেন—এবং জননী বাকবাদিনী যিনি নাকি কল্পনায় মানুষের মনকে আকাশে বিচরণের শক্তি দেন তিনি বলেছিলেন, "ভয় কি বাছা! দৈব মহিমার অলৌকিক ওড়না দিয়ে সীতার অঙ্গবন্ধন করে দাও।" বাল্মীকি বুদ্ধি করে সীতার অঙ্গবন্ধন না করে রাবণের হস্ত পদ—কুড়িখানা হাত দুখানা পা দেবলোকের তাঁতে বোনা অলৌকিক গামছা দিয়ে বেঁধে দিয়েছিলেন।

"আদিপর্ব থেকে বনপর্বের ওই রাজসভা বর্ণনার সর্গ পর্যন্ত কোথাও রাবণের অভিশাপ সম্পর্কে একটা কথাও বলেন নি কবি। এই সর্গে পৌঁছে মনে হয়েছে রাবণকে বধ করা যায় যাবে কিন্তু তার অশোকবনে সীতাকে এনে ফেলে কি করে তার দেহকে বাঁচানো যায় রাবণের কুড়িটা হাতের আক্রমণ থেকে? বেঁচেছে যে উপায়ে তা লোকবিদিত। এবং এ পর্যন্ত অর্থাৎ ত্রেতাকাল থেকে পুরো দ্বাপর এবং কলির বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত বাল্মীকি নিরঙ্কুশ প্রশংসা এবং অভিনন্দন পেয়ে এসেছেন। এই বিংশ শতাব্দীতে তাঁকে দাঁড়াতে হবে বিচারের কাঠগড়ায়। আমার এই প্রবন্ধ ঠিক প্রবন্ধ নয়—এ আমার লোকবিচারালয়ে আরজি। সাক্ষী আমি কাউকেই মানব না। সাক্ষী মানব বাল্মীকিকেই। তাঁকে বলতে হবে—রাবণের মুখ দিয়ে ওই অভিশাপের কথা বলানোর পর আবার একবার অগ্নিপরীক্ষার

ম্যাজিকের দরকার হল কেন? তারপরও পৃথিবী বিদীর্ণ করে সীতাকে পাতালে পাঠিয়ে দিলেনই বা কেন? তিনি সেই রাজসভা থেকে বৈকুণ্ঠ থেকে সমাগত রথে আরোহণ করে শঙ্খ-ঘণ্টা বাজিয়ে লক্ষ্মীরূপে বৈকুণ্ঠে গেলেন না কেন?"

এর পর সে মহাভারতের সভাপর্বের পাশা খেলা এবং রজঃস্বলা একবস্ত্রা দ্রৌপদীকে সভায় টেনে এনে দুঃশাসনের বস্ত্রাকর্ষণের প্রসঙ্গ এনে বলেছিল—যদিও বেদব্যাস নারায়ণ রূপী কৃষ্ণের অলক্ষে থেকে বস্ত্র যুগিয়ে দেওয়ার কথা লিখেছেন তবুও ওইটেই দ্রৌপদীকে বিবস্ত্রা করা রোধ করার জন্য একমাত্র রক্ষা-কবচ নয়। দৈববলই একমাত্র বল নয় এখানে। স্মরণ রাখতে হবে যে অন্ধদাস ভীষ্ম-দ্রোণকে উপেক্ষা করেও অন্ধরাজা ধৃতরাষ্ট্রই সেখানে শেষ আধিকারিক—তিনিই কৌরব-কুলপতি রাজা। দেবী গান্ধারীর মত মহিমময়ী রাজেশ্বরীকেও মনে রাখতে হবে। মহাভারত সযত্নে পড়লে বোঝা যায় এক্ষেত্রে দ্রৌপদীকে রক্ষা করেছে জন্মান্ধ রাজাধিরাজ ধৃতরাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ। দুর্যোধনকে কঠিন তিরস্কার করে দ্রৌপদীকে তিনি সান্ত্বনা দিয়ে বর দিয়েছেন। দাসত্ব থেকে মুক্তি পেয়েছে পাণ্ডবেরা।

এ প্রবন্ধ প্রকাশিত হতেই সেদিন আশ্চর্য আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছিল চারিদিকে। নানান মন্তব্য—নানান আলোচনা চলেছিল কাগজে। গালাগাল কম নয়, অনেক। তবে মুখে মুখে আলোচনার আর শেষ ছিল না। বিশেষ করে তরুণ মহলে।

একটা বিচিত্র কথা এই যে, এই গালাগালিতে সে নিজেকে বিব্রত বোধ করে নি। বরং যেন একটা প্রচ্ছন্ন অহঙ্কার-বোধে বেশ একটি পরিতৃপ্তি লাভ করেছিল।

চিঠিপত্র এসেছিল অনেক। সাধুবাদ, অভিনন্দন এও ছিল। আবার নিন্দা কটু-বাক্য, তার সঙ্গে অভিসম্পাত এও ছিল। চিঠিগুলির হস্তাক্ষর লক্ষ্য করত সে। হাতের লেখার ভাল মন্দ কাঁচা পাকা সব রকমই ছিল। এ থেকেই সে বিচার করত কতজন তাদের মধ্যে ছেলেমানুষ, ক'জনই বা চিন্তাশীল ব্যক্তি হতে পারেন। কতজন মেয়েছেলে—কতজন পুরুষ তারও হিসেব সে করত। নবীনেরাই তাকে উৎসাহ দিয়েছিল। প্রবীণদের মধ্যে পুরুষেরা কয়েকজন শাস্ত্রের বিতর্ক তুলেছিল, কয়েকজন দুঃখপ্রকাশ করে অনুরোধ করেছিল যে সে যেন আর পুরাণের অপব্যাখ্যা না করে। দুজন বৃদ্ধ তাকে অভিসম্পাত দিয়েছিল। একদল মহিলা তাকে প্রায় একই কথায় গাল দিয়েছিল—লিখেছিল—তোমার মত লেখককে আমরা ঘৃণা করি। কেউ কেউ বা একবার ঘৃণা করি লিখে তুষ্ট হন নি লিখেছেন—ঘৃণা করি, অত্যন্ত ঘৃণা করি।

আরও হয়েছিল, ছাত্রদের মহলে তার নাম একটি চাঞ্চল্যকর নাম হয়ে উঠেছিল। তারা দুজন একজন ক'রে তার সঙ্গে দেখা করতে বা তাকে দেখতে আসতে শুরু করেছিল। সভা-সমিতিতে বিতর্কের আসরে তার নাম একটি অতি আগ্রহে প্রতীক্ষিত নাম হয়ে উঠেছিল।

ছাত্রমহলে আগে থেকেই তার নাম ছিল। ছাত্রজীবন তার দীর্ঘ এবং দীর্ঘ ছাত্রজীবনে সে ছাত্র-আন্দোলনের সামনের সারিতেই তার আসন ছিল। দু-চারটি রাজনৈতিক দলও তাকে তাদের খাতায় নাম লেখাতে অনুরোধ করেছিল কিন্তু সে তা লেখায় নি।

রাজনৈতিক দলকে সে এই স্বল্প জীবনকালের মধ্যে ভাল করে জেনেছে এবং চিনেছে। রাজনৈতিক দর্শন রাজনীতি শাস্ত্র এ সে অনেক পড়েছে। রাজনৈতিক দলদেরও সে চেনে। সব দলের চেহারাই সে দেখেছে।

থাক।

সীতা অনেক দূরে পড়ে যাচ্ছে।

জীবনের কথা তো অনেক। সে সব কথা কথা হয়েও কথা নয়। সকালের যে কথাটা সন্ধ্যাবেলায় মন থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে যায় সে কি কোন কথা? রাত্রে রোজই প্রত্যেকে কিছু কিছু স্বপ্ন দেখে কিন্তু সকালে তার আর কিছু মনে পড়ে না;—ওগুলো তাই।

সীতা তা নয়।

আজ মৃত সন্তানকে কোলের কাছে নিয়ে—সে রোগশয্যায় শুয়ে তার কাছে বার্তা পাঠিয়েছে।

সে কৃতকর্ম বিচার ক'রে তার নিজের অপরাধের দণ্ড নির্ণয় করছে।

* * *

সেদিন অনেক চিঠি অনেকজনে লিখেছিল কিন্তু সীতা কোন চিঠি লেখে নি বা সীতা আর কোন অজুহাতে তার সঙ্গে দেখা করতে আসে নি। না। সেও তাকে খোঁজে নি।

একখানা পত্র লিখেছিলেন তার মা।

অতি কঠোর কর্কশ তার ভাষা এবং বক্তব্য ছিল মর্মান্তিক ভাবে নিষ্ঠুর। মায়ের সঙ্গে সে পৃথক হয়ে গেছে অনেক দিন সে তার ছাত্রজীবনেই। তখনও সে আই. এ পাশ করে নি। তখন থেকেই তিনি তার মুখ দেখতেন না। তিনি এই প্রবন্ধ পড়ে লিখেছিলেন, "তোমার প্রবন্ধ পড়িয়া আমি দিব্য বুঝিতেছি যে, তোমার মন কুষ্ঠ-রোগাক্রান্ত হইয়াছে। তুমি ঈশ্বরের কাছে করুণা ভিক্ষা করিয়ো। দেশে কুষ্ঠ রোগের চিকিৎসার উন্নতি হইয়াছে শুনিয়াছি, অমোঘ ঔষধ আবিষ্কৃত হইয়াছে। কিন্তু মনের কুষ্ঠ রোগ কোন দিনই দিব্যকরুণা ব্যতীত নিরাময় হয় না। মনে মনে অনুতপ্ত হইয়ো। অনুশোচনায় চিত্ত শুদ্ধ করিয়ো।"

না।

অনুতাপ সে করে নি—অনুশোচনার কোন কারণ ঘটে নি সেদিন।

দ্বিতীয় পর্ব

এত পত্রাঘাত, বাহবা, নিন্দা এমন কি মায়ের ওই নিষ্ঠুর ক্রোধের উত্তাপে উত্তপ্ত পত্রখানিতেও সে বিচলিত হয় নি। কোন পত্রেরই সে জবাব দেয় নি। মায়ের পত্রেরও না।

যারা তাকে উৎসাহিত ক'রে বাহবা দিয়েছিল তাদের দলেরও সে কেউ নয়, আবার যারা তাকে অভিসম্পাত দিয়েছিল তাদেরও সে কেউ না। সে নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে গোটা দেশটার, তাই কেন, গোটা পৃথিবীর এই শতকের অবস্থা দেখে সে যা বুঝতে পারছিল,

যে ধারণায় উপনীত হচ্ছিল তাকেই সে প্রকাশ করতে তৃতীয় প্রবন্ধ রচনায় সংকল্প করেছিল।

নামটাই তার মনে আগে এসেছিল।

নাম দিয়েছিল 'নবভারতের মুক্তিপর্ব'। আরম্ভও করেছিল কিন্তু প্রবন্ধের ফর্মে তাকে প্রকাশ করা তার পক্ষে সহজ হয় নি। বার বার আরম্ভ ক'রে কিছুটা লিখে যেন অবশ হয়ে পড়ছিল তার হাত এবং কলম। মনে হয়েছিল ঠিক হ'ল না। ফেলে দিয়েছিল। কোনবার দু'চার প্যারাগ্রাফ কোনবার এক পৃষ্ঠা বা দু পৃষ্ঠা কোনবার বা পাঁচ-সাত পৃষ্ঠা লিখেও ফেলে দিয়েছিল। তার কিছু অবশেষ আজও তার ঘরের পুরনো ফেলে দেওয়া কাগজের মধ্যে খুঁজলে পাওয়া যাবে।

যা সে বুঝেছিল তাকে প্রকাশ করতে উপলব্ধির অভাব তার হয় নি কিন্তু তাকে প্রকাশ করতে সাহস যেন তার হয় নি। এবং বহুস্থলে প্রবন্ধের ক্ষেত্রে যা অবশ্য প্রয়োজনীয়—সেই যুক্তি এবং তথ্য ইত্যাদিরও অভাব ঘটছিল। সংগ্রহ করতে সে পারে নি। পারে নি ঠিক নয়, চেষ্টা করলে অবশ্যই পারত সে কিন্তু সেই ধৈর্য তার ছিল না। সে প্রবন্ধ-লেখক ঠিক নয়, সে লিখতে ভালবাসে লিখতে চায় নাটক এবং গান; গল্প উপন্যাসও কিছু কিছু লিখেছে সে কিন্তু নাটকই তার সব থেকে প্রিয় মাধ্যম।

এই নূতন উপলব্ধিতে সে অনেক ভেবেচিন্তে নতুন নাটকের বিষয়বস্তু নির্বাচন করেছিল মহাভারতের মৌষল পর্ব নিয়ে। শেষ দৃশ্যটাই কল্পনা করেছিল সর্বাগ্রে।

'পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং'—পৃথিবীতে ধর্ম সংস্থাপনের জন্য অবতার আবির্ভূত হয়েছেন যে শ্রীকৃষ্ণ সেই শ্রীকৃষ্ণ তখন জরাগ্রস্ত হয়ে আসছেন; কুরুক্ষেত্রে ধ্বংসের পালা শেষ হয়েছে। কৌরবকুলের অন্তঃপুরে বিধবা বিধবা আর বিধবা ছাড়া কাউকে দেখা যায় না। পাণ্ডব বংশে উত্তরার পুত্র পরীক্ষিৎ একমাত্র বংশধর। দুর্বল ভারত ক্ষেত্রে শিশু বৃদ্ধ আর বিধবা বা কুমারী। কিন্তু সমুদ্রতটে দ্বারকা রাজ্যে ছত্রিশ কোটী যাদবেরা প্রমত্ত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। উচ্চহাস্য আর অট্টহাস্যে সমুদ্রকল্লোল লজ্জিত হয় কোলাহল কলরবে আস্ফালনে—ঝড় আসতে আসতে গতিপথ পরিবর্তন করে। যাদব কুমার-কুমারীরা স্বচ্ছন্দ বিহার করে বেড়ায়।

থাক। সে সব বর্ণনা থাক।

উন্মার্গগামী সংখ্যাস্ফীত যাদববংশ মদ্যপানে প্রমত্ত হয়ে আত্মকলহ অন্তর্দ্বন্দ্বে। না—ওসব সংস্কৃত কথা নয় সাদা কথায় দাঙ্গা বাধিয়ে নলখাগড়ার গাছ আর ডাল তুলে তাই দিয়ে এ ওকে পিটিয়ে শেষ ক'রে দিলে।

শ্রীকৃষ্ণ জানতেন এমন পরিণতির কথা।

তিনি জরা ব্যাধের শরাঘাতে আহত হয়ে নিমগাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করবার সময় অন্তিম মুহূর্তে দুটি ফোঁটা চোখের জল ফেললেন। নাটকের শেষ এখানেও সে করে নি, করেছিল—অর্জুন যখন অনাথা অর্থাৎ নাথহীন যাদব পুরনারীদের হস্তিনায় নিয়ে যাচ্ছেন এবং পথের মাঝখানে যেখানে শবর এবং ব্যাধেরা এসে তাদের আক্রমণ করেছে—সেই-খানে। অর্জুন বাধা দিতে গিয়ে গাণ্ডীব ধরে তাতে জ্যা রোপণ করতে গিয়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। পারলেন না ধনুকে জ্যা দিতে। থরথর করে কেঁপে উঠলেন। এ কি হ'ল? কেন

এমন হ'ল? কোনক্রমে জ্যা দিলেন তো যুদ্ধকৌশল ভুলে গেলেন। তাঁর অক্ষয় তূণ যুদ্ধ করতে করতে বাণশূন্য হয়ে গেল।

ওদিকে উল্লসিত শবরেরা ব্যাধেরা রথ থেকে টেনে নামাতে লাগল পুরনারীদের। পুরনারীরা আর কেউ নয়—মহাভারতের পুরুষশ্রেষ্ঠ পুরুষোত্তমের বংশের কন্যা এবং বধূ। হয়তো বা কৃষ্ণ বাসুদেবের অসংখ্য বিবাহিতা পত্নীদের ভাগ্যে ভিন্নতর কিছু ঘটে নি। ব্যাসদেব কিছু লেখেন নি।

যে ধর্মরাজ্য স্থাপন করেছিলেন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে সেই ধর্মরাজ্য একখানা আকাশে ওড়া ঘুড়ির মত সুতো কেটে ভেসে গেল আকাশে—নিতান্তই একখানা কাগজের টুকরোর মত।

এই পটভূমির মধ্যে কাল এল নূতন কাল নিয়ে।

নূতন কালে দিনের রঙ বদল হয় নি, দিনের দৈর্ঘ্যের তারতম্য হয় নি, উত্তাপের তারতম্য হয় তো কিছু হয়েছে—কিন্তু সেও কিছু নয়। আলোর বাতাসের জলের মাটির সেই একই গতি একই গুণ একই ক্রিয়া এবং একই স্বাদ আছে। তবু কালের বদল হ'ল। বদল হ'ল ধর্ম—বদল হ'ল জীবন-ভাবনায়। জীবন ধর্মের পরিবর্তনে কাল পাল্টায়, দ্বাপরের পর কলি। পরীক্ষিৎ কলিকে শাসন ক'রেও ঠেকাতে পারেন নি।

সর্পাঘাতে পরীক্ষিতের মৃত্যু হ'ল। কলি এসে তার শাসন প্রসারিত করলে। তার প্রশাসনে আত্মা নাই, ঈশ্বর অস্বীকৃত, সত্য শুধু—জীবন্ত মানুষ আর বস্তু।

* * *

না—কলিকালকে এভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না। এ ব্যাখ্যা তার সত্য ব্যাখ্যা নয়। এ ব্যাখ্যার সম্মুখে আজ অসংখ্য প্রশ্ন নির্ভয়ে উচ্চারিত হচ্ছে। কলি মহারাজা পরীক্ষিতের সম্মুখে এ প্রশ্নগুলি উপস্থাপন করতে পারে নি। আজ এ প্রশ্ন প্রমাণের সঙ্গে কলি প্রচার করেছে।

কে বলে—কলিযুগ ভ্রষ্টতার যুগ?

কে বলে—কলিকাল খর্বতার কাল, দুর্বলতার কাল, নৈবীর্যের কাল?

কে বলে—কলি যুগ অজ্ঞানতার যুগ, মিথ্যার যুগ, ভ্রান্তির যুগ? সঙ্কীর্ণতার যুগ? অশান্তির যুগ? ভোগ-সর্বস্বতার যুগ?

কলি যুগে—কি দিবালোক ম্লান হয়েছে? দিনের দৈর্ঘ্য কি হ্রাস পেয়েছে? অন্ধকার কি গাঢ়তর কালো হয়েছে? রাত্রির দৈর্ঘ্য কি বৃদ্ধি পেয়েছে?

না।

কলি যুগ বিচিত্র যুগ। সত্য ত্রেতা দ্বাপর থেকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক। তা ভ্রষ্টতার যুগ নয় খর্বতারও নয়—সংকীর্ণতা বা দুর্বলতা বা নৈবীর্যের যুগও নয়।

* * *

এইখানে এসে তার চিন্তা সব যেন এলোমেলো হয়ে খেই হারিয়ে মনের আকাশে বিশ্বকর্মা পুজোর দিনের অসংখ্য কাটা ঘুড়ির মত ছড়িয়ে হারিয়ে গিয়েছিল।

নাটকের উপসংহার বা সমাপ্তি যেন অসম্পূর্ণ থেকে যাচ্ছিল। বারকয়েক নাটকখানি

আরম্ভ ক'রে কিছুদূর দুটো—তিনটে দৃশ্য লিখেই সরিয়ে রেখেছে; ভয় পেয়েছে; এক বিরাট ধ্বংস এমন ভয়ালরূপে সামনে এসে দাঁড়িয়ে যে সেই ধ্বংস দৃশ্য পার হয়ে তার কল্পনা কোন একটি একবিন্দু আলোর আশ্রয় পেয়ে তাকে আঁকড়ে ধরে দাঁড়াতে পারে নি।

নাটক লেখা হয় নি। পত্তন হয়েছিল নতুন প্রবন্ধের। ভেবেছিল প্রবন্ধের মধ্য দিয়েই মাকে জবাব দেবে। চিঠি দেবে না। কিন্তু তা লিখে তার মন তৃপ্ত হয় নি। শুধু তার খানিকটা অংশ নিয়ে শেষ পর্যন্ত তার মায়ের সেই অভিসম্পাত ভরা বা নিদারুণ উত্তাপ ভরা পত্রখানার জবাব দিয়েছিল।

লিখেছিল—তুমি আমাকে যে পত্র লিখেছ তার মধ্যে বাছা বাছা যে কঠিন বাক্যগুলি প্রয়োগ করেছ তা একান্তভাবে ব্যর্থ হয়েছে এবং লজ্জিত হয়েছে। তুমি এমন পত্র লিখবে এ আমি প্রত্যাশা করি নি। এমন অযৌক্তিক তুমি হতে পার এ ধারণা আমার ছিল না। অতসীর ঘটনা নিয়ে তুমি আমার উপর বিরক্ত ও বিরূপ সে কথাটা সর্বজনবিদিত হলেও সে বিরক্তির বিষাক্ততা এবং সে বিরূপতার ব্যাপ্তি এমন তীব্র ও দুস্তর এ কথাটা আমি জানতাম না। আমি তো তোমার গর্ভের সন্তান, তোমার কাছেই তো আমার প্রথম শিক্ষা। ছেলে-বেলা দেখেছি তুমি ঠাকুরবাড়ী-মুখে হাঁটতে না। বলতে গেলে অবিশ্বাস করতে। আজ তুমি লেখাপড়া জানা মেয়ের ভাষায় যা বলেছ আমাকে—সেকালে বড়মা তাঁর সে আমলের গেঁয়ো ভাষায় ঠিক তাই বলত। তুমি আজ তাই লিখলে আমাকে?

কথাটা মনে পড়িয়ে দিচ্ছে অংশুমানের পিছনের জীবনের কথা।

শুধু অংশুমানের পিছন জীবন কেন—তারও পিছনে আছে তার বংশের জীবন। তার বাবা নিরঞ্জন চৌধুরী, মা শোভা চৌধুরী।

না। শোভা চৌধুরী বিবাহসূত্রে চৌধুরী হওয়ার পূর্ব থেকেই মনে করতে হবে। আগে স্থান তার পরে কাল—সর্বশেষে পাত্র।

বর্ধমান জেলার উত্তর প্রান্তে অজয় নদী; নদী নয় নদ। না থাক তার নদের পৌরুষ। তবু নদ।

অজয়ের ধারে একখানি গ্রাম। ব্রাহ্মণ বৈদ্য গন্ধবণিক উগ্রক্ষত্রিয়-প্রধান গ্রামখানিতে তার বাপ জ্যাঠারাই ছিলেন সব থেকে বড়। অন্য অন্য গ্রামে এ অঞ্চলে উগ্রক্ষত্রিয়েরা প্রধান এবং প্রবল হলেও এ গ্রামের জমিদার জোতদার ও মহাজন—এই তিনই ছিল চৌধুরীরা।

কাল ১৯২৪ থেকেই আরম্ভ করা ভাল।

১৯২৪ সালে অজয় নদের দক্ষিণ তটের উপর দেবগ্রাম গ্রামখানির, (গ্রামখানির নাম দেবগ্রাম) প্রধান জন ছিল চৌধুরীরা। উপাধি চৌধুরী, জাতিতে ব্রাহ্মণ, গোত্রে কাশ্যপ অর্থাৎ চাটুজ্জে। বাংলা দেশে গ্রামীণ সমাজের মধ্যে নিঃস্ব খেটে-খাওয়া মানুষ থেকে সম্পদশালী ভূসম্পত্তিশালী ঘর পর্যন্ত অনেক শ্রেণী, অনেক ধাপ বা সিঁড়ি। দিন আনে দিন খায়, না আনলে উপোস যায় থেকে দিয়ে খায়, খেয়ে ছড়ায়, ছড়ানো ভাত কাকে খায় কুকুরে খায় যে ঘরে সে ঘর পর্যন্ত মুটে মজুর কৃষাণ চাকর-চাষীভূষি জোতদার পর্যন্তই বহু ধাপ—তারপর প্রধান তিনটে ধাপ—জোতদার—মহাজন—জমিদার। এর সঙ্গে আবার জাতের শ্রেণীবিন্যাস

জড়িয়ে আছে, ছুৎ-অছুৎ—ব্রাত্য থেকে নবশাক পর্যন্ত অনেক শ্রেণী। উপরের তিনটে শ্রেণী সচরাচর কায়স্থ বৈদ্য ব্রাহ্মণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। দেবগ্রাম চৌধুরীরা ব্রাহ্মণ।

অনেক পিছনের লোকেদের মুখের গল্প কথিত আছে যে অনেক পিছনের কালে দেবগ্রাম চৌধুরীরা পটো ঝাড়া বামুন ছিল। অর্থাৎ পুরুতগিরি ক'রে বেড়াত এই সদগোপপ্রধান অঞ্চলে। লোকে বলত—ভশচাজেরা। অর্থাৎ ভট্টাচার্যেরা।

নিরঞ্জন চৌধুরীর পাঁচ পুরুষ আগে কৃষ্ণপুর থেকে কয়েকখানা গ্রাম পরের গ্রামের এক সম্পদশালী যজমান বাড়ী সমাজে পতিত হয়েছিল গুরুতর অপরাধের জন্য। তাদের সংসারে নাকি মুসলমান সংসর্গ দোষ ঘটেছিল। ঘটেছিল স্বয়ং কর্তার। তিনি অমিতচারীও ছিলেন না—পাপী ব্যভিচারী বলতে যা বোঝায় তাও ছিলেন না। বর্ধমান ফৌজদারের অধীনে কাজ করতেন, গানবাজনায় শখ ছিল, বাঈজীতে আসক্ত ছিলেন—সে আসক্তি এমন গভীর হয়ে উঠেছিল যে শেষ পর্যন্ত তাকে গ্রামপ্রান্তের বাগানবাড়ীতে এনে তুলেছিলেন। ফলে পাতিত্য ঘটল। ওদিকে ফৌজদারের তরফ থেকে চাপ এল। তিনি ইসলাম ধর্মই গ্রহণ করলেন। রাজা সহায় রাজ সরকারের চাকরে—অবস্থাপন্ন ব্যক্তি—জমিদারী জায়গীরদারী রয়েছে, বিশেষ অসুবিধায় পড়েন নি; কেবল মুস্কিল হয়েছিল বাড়ীর শিলা নারায়ণ নিয়ে। জাত দিতে পেরেও ওই শিলাটিকে নদীর দহে বা পুকুরে ফেলে দিতে পারেন নি বা লোহার হাতুড়ি দিয়ে ভেঙে ফেলতেও পারেন নি। বিলাসী ফৌজী ওই মানুষটির বুকের মধ্যে কোথায় একটি আশ্চর্য মমতা ছিল এই শিলাটির জন্য।

অনেক ভেবেচিন্তে শেষ পর্যন্ত দেবগ্রামের পুরোহিত ঠাকুরটিকে ডেকে তাকে দিয়েছিলেন এই শিলা নারায়ণটি এবং তার সেবার্চনার জন্য দিয়েছিলেন কুড়ি বিঘার একটি জোত—তার সঙ্গে একটি পুকুর একটি বাগান। সবই নিষ্কর সম্পত্তি। খাস নবাবী দপ্তর মুরশিদাবাদ থেকে নবাবী সইযুক্ত নাখরাজনামা আনিয়ে দিয়েছিলেন। গল্প আছে নাখরাজনামার দুটো জায়গার লেখা ঝাপসা হয়ে গেছে, ঠিক স্পষ্ট নয়। লোকে বলে—নাখরাজনামাখানা চাটুজ্জে ভটচাজকে দেবার সময় কর্তার চোখের জল পড়েছিল দু ফোঁটা।

এই সূত্রপাত। যিনি এই ঠাকুর এবং জমি পেয়েছিলেন তিনি নিরঞ্জন চৌধুরীর বৃদ্ধ পিতামহ।

এর পরের পুরুষ নিরঞ্জন চৌধুরীর প্রপিতামহ চাকরি নিয়েছিল—ফৌজদারের উপরি উপার্জন থেকে মহাজনী কারবার ক'রে একই সঙ্গে জোতদার ও মহাজন হয়ে উঠেছিলেন। এবং চৌধুরী উপাধিও পেয়েছিলেন। জমিদার হয়েছিলেন নিরঞ্জনের পিতামহেরা। পিতামহেরা দুই ভাই। তাঁরাই জমিদারী অর্জন করে পুরুতগিরি পেশার লজ্জাকর পরিচয় মুছে ফেলবার জন্যই চট্টোপাধ্যায় (সাধারণে ভুল ক'রে বলত ভটচাজ) উপাধি বর্জন ক'রে চৌধুরী উপাধি কায়েম করে—বাড়ীর দেবসেবার জন্য অন্য এক ব্রাহ্মণকে এনে গ্রামে বসিয়েছিলেন।

থাক। পিছনেরও পিছনের ঘটনায় এখানেই যবনিকা পড়ে যাক। না। আর একটা আপনা থেকে ডাক দিয়ে কানের কাছে এসে শুনিয়ে দিচ্ছে। বলছে—আরও একটা কথা আছে। নিরঞ্জন চৌধুরীর পিতামহেরা দুই ভাই। শেষ জীবনে দুই ভাগে ভাগ হয়েছিল।

এক ভাইয়ের এক ছেলে অন্য ভাইয়ের দুই ছেলে। নিরঞ্জনের বাপ ছিল ওই বাপের এক ছেলে। সেই এক ছেলের আবার দুই ছেলে। অর্থাৎ নিরঞ্জনের এই সহোদর আর দুই ভাইয়ের ছেলে দুগণ্ডা অর্থাৎ আটজন। সুতরাং পরের পুরুষেই সুরু হল ভীষ্মপর্ব থেকে সৌপ্তিক পর্ব পর্যন্ত বা স্ত্রীপর্ব পর্যন্ত কুরুক্ষেত্র ভাগ সুরু হয়ে গেল।

মামলা মকর্দমা, বিবাহে উপনয়নে, শ্রাদ্ধের ক্রিয়াকাণ্ডে সমারোহ থেকে আরম্ভ করে, কথিত আছে, বর্ধমানের খেমটাওয়ালীদের আসরে প্যালা দেওয়ার পাল্লা পর্যন্ত সে-কুরুক্ষেত্র মহাভারতের কুরুক্ষেত্র থেকে পৃথক হ'লেও অত্যন্ত সাধারণ এবং সুপরিচিত। এরই মধ্যে একটি যুদ্ধ-মুখ বা ক্ষেত্র হ'ল রাজানুগ্রহের ক্ষেত্র। যে যেমন রাজানুগ্রহ পায় তেমনি প্রতিপত্তি সে বিস্তার করে সাধারণ মানুষের উপর সমাজের উপর।

১৯২০ সাল পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট পঞ্চায়েতী নিয়ে ছিল প্রতিযোগিতা। এ পদটি চৌধুরীদেরই দখলে ছিল কিন্তু চৌধুরীদের মধ্যে ছিল দারুণ বিবাদ।

১৯৩১ সালে হল ইউনিয়ন বোর্ড। ওদিকে লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের নির্বাচন।

আজ ১৯৩১ সালে বলার প্রয়োজন আছে যে ১৯২১ সালে লোয়ার হাউসের নাম এ্যাসেম্ব্লী ছিল না, কাউন্সিল ছিল। আপার হাউস ছিল এ্যাসেম্ব্লী।

১৯২১ সালে ইউনিয়ন বোর্ডে নিরঞ্জন চৌধুরীর ভাই হয়েছিল প্রেসিডেন্ট। আগে থেকেই নিরঞ্জনের দাদা প্রেসিডেন্ট পঞ্চায়েৎ ছিল এখানকার। তখন নিরঞ্জনেরা ছিল একসংসারে। এইখানেই ভাইয়ে ভাইয়ে বিরোধ বেধেছিল। বেধেছিল ১৯২১ সালের আন্দোলন নিয়ে। ১৯২১ সালে পূজার সময় দেবগ্রামের দুগাই মিশ্রির কাপড়ের দোকানে হঠাৎ একদল ছেলে পিকেটিং সুরু ক'রে দিয়েছিল। বিলিতী কাপড় কেউ কিনো না—বেচতে পাবে না বিলিতী কাপড় এই ছিল দাবী। দুগাই মিশ্রি ছিল নিরঞ্জনের দাদা পুরঞ্জনের ক্লাস-ফ্রেণ্ড। এবং ইউনিয়ন বোর্ডে সে ছিল ক্লার্ক এবং ট্যাক্স কলেকটর—দুই। দুগাই মিশ্রিই আবিষ্কার করেছিল যে, এই পিকেটারদের পিছনে যিনি প্রেরণাদাতা তিনি নিরঞ্জন চৌধুরী এবং এই দুগাইই ব্যাখ্যা করেছিল যে এটার কারণ স্বদেশপ্রেম নয়, দেবগ্রামে বিলিতী কাপড় বিক্রীতে পিকেটিং-এর অর্থ হ'ল এখানকার ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্টকে জেলার ওপরতলাদের কাছে অপদার্থ প্রতিপন্ন করা।

নিরঞ্জন চৌধুরী এদের সমর্থক ছিল এ কথা সত্য। কিন্তু তার দাদাকে অপদস্থ করা তার অভিপ্রায় ছিল এ কথা সত্য নয়। আসল সত্য হল এই যে, দেশজোড়া আন্দোলন তাকেও স্পর্শ করেছিল। কিন্তু তার নিজের ক্ষমতা ছিল না আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তে। তাই সে ওই বাচ্চা বাচ্চা ছেলেদের দিয়ে বিলিতী কাপড়ের দোকানে পিকেটিং করিয়ে কিছু পুণ্য সঞ্চয় করতে চেয়েছিল। তার সঙ্গে কিছু প্রতিষ্ঠাও হয়তো কাম্য ছিল। এবং সারকেল অফিসার থানা অফিসার যখন দাদা পুরঞ্জনকে বলেছিল—আপনার এলাকার ছেলেরা আপনার কথা না মেনে আপনার ছোট ভাইকে মানবে এটা মশাই যেন কেমন লাগে। মনে হয় আপনিই এসব ভাইকে দিয়ে করাচ্ছেন। এর সঙ্গে সারকল অফিসার গণি বলেছিলেন—আপনাকে রায়সাহেব করার কথা মাঝে মাঝে ওঠে পুরঞ্জনবাবু। কিন্তু এসব করলে—।

ওই ওতেই বিচিত্র ভাবে একদা স্পষ্ট ও প্রকট হয়ে উঠল যে নতুন এবং পুরনো দুটো কালে বিবাদ বেধে গেছে। দেশে নয়, দেবগ্রাম গ্রামে চৌধুরীদের বাড়ীতে। বাড়ীটাই দু'ভাগ হয়ে গেল। হল ওই ঘটনাটিকে অবলম্বন করে। অথবা আজকে এই যা ঘটেছে—সেই ঘটনাটির সূচনা হয়েছিল সেই দিন।

* * *

পুরঞ্জন চৌধুরী শুধু ক্ষুব্ধই হয় নি। ক্রুদ্ধও হয়েছিল। ছোট ভাইটার জন্য সে তো কম করে নি। এণ্ট্রান্স ফেল এই নিরঞ্জন খোকা নয়, বয়স তার বেশ হয়েছে। দুই ছেলে এক মেয়ের বাপ। ছেলেরা বড় হয়েছে, বড় ক্লাস নাইনে পড়ছে। অবশ্য অল্প বয়সে ছেলে হয়েছে। তা হোক। খোকা সাজলে চলবে না। ছেলের বাপকে মনে রাখতে হবে যে সে ছেলের বাপ। এ কাল পর্যন্ত পুরঞ্জনই এস্টেট চালিয়ে আসছে। যোগ্যতার সঙ্গে চালাচ্ছে। তাদের জাঠতুতো ভাইদের সম্পত্তি দু পয়সা চার পয়সার ক'রে সাপের হরিণ গেলার মত গিলছে। জমিদারী বেড়েছে জমি বেড়েছে। এসব পুরঞ্জন নিজের একার জন্য করে নি। দুই ভাই ভাগ করে নেবে বলেই সে দুই ভাইয়ের নামে কিনেছে। নিরঞ্জন এণ্ট্রান্স ফেল ক'রে ঘরে ব'সে কিছুকাল ফুটবল খেলে বেড়িয়েছে। আর গানবাজনা। তবলা পাখোয়াজে পাকা বাজিয়ে। গানও গায়। তারপর ১৯১৫।১৬ সাল থেকে মেতেছে থিয়েটারে। বর্ধমান শহরের মহারাজার থিয়েটারে পার্ট ক'রে সে নাম করেছিল। তাতে খুশী হয়েছিল পুরঞ্জনবাবু এবং গ্রামে শহরের থিয়েটারেরও পত্তন করেছিল। বাড়ীতে পিতামহ রাধাগোবিন্দ বিগ্রহ স্থাপন করে দেবোত্তর সম্পত্তি দিয়ে গিয়েছিলেন। সেই দেবোত্তরের টাকায় চলত থিয়েটার। রাধাগোবিন্দের দোলযাত্রা রাসযাত্রা উপলক্ষে উৎসব হ'ত—সেই সময় দেবগ্রাম রাধাগোবিন্দ থিয়েটার তিন দিন তিন দিন ছ দিন অভিনয় করত। কলকাতা থেকে ছেলে আনতে হ'ত মেয়ে সাজবার জন্যে। যে ভাইয়ের জন্য এত করেছেন পুরঞ্জন সেই ভাই এইভাবে বাঁকা পথে বিরোধিতা করছে এ কথা জেনে তার ক্ষুব্ধ এবং ক্রুদ্ধ হবারই কথা। দারোগা এবং সার্কেল অফিসার দুজনেই বলে গেল—এ রিপোর্ট আই. বি-র রিপোর্ট। এ-খবর মিথ্যে হয় না, হ'তে পারে না।

ভাইকে ডেকে পুরঞ্জন বললে—তুই এত বড় কুটিল শয়তান? এত নীচ হ'তে পারিস তুই?

নিরঞ্জন চমকে উঠেছিল।—কি বলছ! কি করেছি?

—কি বলছি? তুই অস্বীকার করতে পারিস, দুগাই মিস্ত্রির দোকানে যারা বিলিতী কাপড় কেনার বিরুদ্ধে পিকেটিং করছে তাদের পিছনের লোক তুই?

অবাক হয়ে নিরঞ্জন বলেছিল—হ্যাঁ তা অস্বীকার করব কেন? আছিই তো।

—কেন আছিস?

—কেন আছি? এটা আবার কোন প্রশ্ন হতে পারে নাকি?

—কেন? পারে না কেন?

—না, পারে না। কারণ আমরা জমিদারবংশের ছেলে জমিদার,—আমাদের টিকি বাঁধা আছে ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের কাছে। আমরা জমিদারী আইনে গভর্ণমেণ্টকে সাহায্য করতে বাধ্য। তিন নম্বর হল আমি যতদিন সংসারের কর্তা এবং আমি যতদিন ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট—ততদিন এ বাড়ীর কেউ গভর্ণমেণ্টের বিরোধীদের দলের খাতায় নাম লেখাবে তা হবে না।

নিরঞ্জন বিস্মিত হয়ে বলেছিল—তুমি যে নিজে স্বদেশী স্বদেশী কর, স্বদেশী কাপড় পড়, স্বদেশী জিনিস ব্যবহার কর?

বাধা দিয়ে পুরঞ্জন বলেছিল—সে আলাদা কথা। তার সঙ্গে আন্দোলন করার কোন সম্পর্ক নাই।

কথার মাঝখানে নিরঞ্জন কিছু বলতে চেয়েছিল কিন্তু পুরঞ্জন হাত নেড়ে বলেছিল—থাম্ থাম্—শোন্ শোন্—যা বলছি শোন্। বুঝিস তো ছাই। নটোগিরি আর আড্ডা দিয়ে তো দিন কাটাস। গভর্ণমেণ্টের খাতায় বাবার আমল থেকে আমাদের নাম আছে; খেতাব দেবার কথা ছিল বাবাকে কিন্তু বাবা মরে গেলেন হট ক'রে। আমাকে সার্কল অফিসার বলে গেছেন—

—ও—; তাই বুঝি এত দরদ!

পাকা সিরিও-কমিক এ্যাক্টরের অ্যাক্টিংএর সুরে নিরঞ্জন এবার ওই '—ও—' শব্দটি উচ্চারণ করেছিল যে তাইতেই চৌধুরীবাড়ীর জীবননাট্য—একটি অঙ্কের সমাপ্তি ঘটে যবনিকাপাতের মত একটা অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটে গিয়েছিল।

অর্থাৎ এতেই চৌধুরীবাড়ীর শেষ সম্পন্ন এবং বিত্তমান বাড়ীটিও দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল।

তা গেল, কিন্তু তার ফলটা নিরঞ্জন চৌধুরীর পক্ষে ভাল হ'ল না। সে একেবারে একলা পড়ে গেল। নিরঞ্জনের স্ত্রী—বড়ভাই পুরঞ্জনের স্ত্রীর খুড়তুতো ভাই এবং পুরঞ্জনের স্ত্রীর মেসোমশাই সেকালের একজন নামজাদা লোক। এম-এ পাশ; অধ্যাপনা ছেড়ে কয়লার ব্যবসা ক'রে মস্ত ধনী হয়েছেন। একজন খেতাবধারী রায়বাহাদুর। লাটসাহেবেরাও তাকে সম্মান করে। এই কারণেই নিরঞ্জনের স্ত্রী—স্ত্রী পুত্র শ্বশুর শাশুড়ী সহোদর থেকে সহোদরের এই খেতাবধারী মাসশ্বশুর পর্যন্ত তাকে প্রায় একা ফেলে তাকে অনুভব করাতে চেয়েছিল—সে ভুল করেছে। তাতেও কিন্তু নিরঞ্জন ভুল স্বীকার করে নি। সে স্ত্রী পুত্রদের সঙ্গে অসহযোগিতা করেই জীবনে জাঁকড়ে ধরেছিল—আপন জেদে। চাষবাসে মন দিয়েছিল, থিয়েটারকে খুব জাঁকজমক দিয়ে সমৃদ্ধ করেছিল। তাতে তার বেকার ছেলের দলের চেলার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল। শুধু চেলার সংখ্যা বাড়াই নয়—কয়েকটা সে-আমলের স্বদেশী নাটক ক'রে সে অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। সে জনপ্রিয়তা চিন্তিত করেছিল পুরঞ্জনকে। তিনি গুজব শুনছিলেন ১৯২৪।২৫ সালে ইউনিয়ন বোর্ড ইলেকশনে নিরঞ্জন তার সঙ্গে ভোটযুদ্ধে যুদ্ধ দেবে। সে থিয়েটার বন্ধ করবার জন্য ফন্দি খুঁজে বের করলে। দেবোত্তর থেকে থিয়েটারের খরচা দেওয়া হবে না। আমোদ-আহ্লাদের জন্য সামান্য খরচ করে কীর্তন-

যাত্রা করিয়ে বাকী টাকায় একটা প্রাইমারী গার্লস স্কুল খুললে। পুরঞ্জন চৌধুরীর ওই মেসোমশাই গভর্ণমেণ্ট থেকে এড সংগ্রহ করে দিলেন। জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে এনে ধুমধাম ক'রে সভা-সমিতি করালেন। তিনজন শিক্ষয়িত্রী এল। দুজন প্রাইমারী বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য—একজন বয়স্কা মহিলাদের সেলাই এবং জামার ছাঁটকাট শিক্ষা দেবার জন্যে। নিরঞ্জন চুপ ক'রে বসে রইল না, বিচিত্র ভাবে—সে আপনার পথে আপনি আবিষ্কার ক'রে নিলে; জল যেমন ঢালের মুখে আপনি এঁকে-বেঁকে—সে সামনেই চলে—ঠিক তেমনি ভাবেই তার এ পথ চলার পথে গতির বেগে আপনা থেকেই তৈরী হয়ে গেল। দাদার সঙ্গে ভিন্ন হয়ে—সে মন দিল চাষবাসে, আর থিয়েটারের রুচিতেই সে ওই থিয়েটারটিকে শুধু থিয়েটার না রেখে তার সঙ্গে লাইব্রেরী জুড়ে এবং একটা ফুটবল ক্লাব জুড়ে দিয়ে তৈরী করে ফেললে পূর্ণাঙ্গ একটি ক্লাব। তার সঙ্গে মাসান্তে পূর্ণিমায় পূর্ণিমায় পূর্ণিমা-মিলন বলে আলোচনা বৈঠক বসাতো। আলোচনার প্রধান বিষয়বস্তু তখনকার কালে ছিল দুটি। প্রথম স্বাধীনতা,—প্রথম পরাধীনতা থেকে মুক্তি, দ্বিতীয় সামাজিক শাসন থেকে মুক্তি। নিজের স্ত্রী-পুত্রদের বিরোধিতাকে উপেক্ষা করেই নিরঞ্জন পথে নেমেছিল এবং চলেছিল। ঘরের মজুত ধান সব বিক্রি করে—ধারদেনা করেও তার চৈতন্য হয় নি। একটা জেদ চেপে গিয়ে সেই জেদের বশেই সে চলেছিল সর্বজন-পরিত্যক্ত সংকীর্ণ একটি গ্রাম্য নালা বা খালের অগভীর স্রোতে নিজের জীবনের নৌকাখানি ভাসিয়ে, বুক দিয়েই প্রায় ঠেলে নিয়ে চলেছিল। ঠিক ছিল না বৈতরণীর কোন ধারায় গিয়ে মিশবে। কারণ শোনা যায় বৈতরণীর দুটি ধারার একটি ধারা নিয়ে গিয়ে ফেলে অন্ধকার অস্বাচ্ছন্দ্যের লোকে—অন্যটি নিয়ে যায় স্বর্গে না হোক স্বর্গের বন্দরে।

১৯২৪ সাল পর্যন্ত আর একটা মোড় ঘুরল। একলা নিরঞ্জনেরই নয় সকলেরই জীবনে।

১৯২৪ সালে এল দ্বিতীয় বারের লেজিসলেটিভ কাউন্সিল ইলেকশন। তখন এ্যাসেম্ব্লী ছিল না—তখন ছিল কাউন্সিল। ১৯২১ সালের প্রথম ইলেকশনে কংগ্রেস ভোটে নামে নি। নামল দ্বিতীয় বারে; ১৯২৪ সালে। বর্ধমানের এলাকায় ভোটযুদ্ধ তাদের মাতাতে পারে নি। মাতিয়েছিল—বীরভূমের ভোটযুদ্ধ। অজয় নদীর দক্ষিণ দিকে বাঁধের গায়ে তাদের গ্রাম। আর নদী পার হয়ে ওপারে উত্তরপারে বীরভূম এবং ওই উত্তরপারেই ছিল চৌধুরীদের জমিদারী পত্তনী এলাকা। বীরভূমে সেবার দাঁড়িয়েছিলেন একজন রায়বাহাদুর এবং একজন রাজাবাহাদুর। রাজাবাহাদুরের ম্যানেজার এবং সর্ব যজ্ঞে কর্মকর্তা ছিলেন তাঁর পিসতুতো ভাই একজন জমিদার—অবনীশ রায়। কংগ্রেস কোন প্রতিনিধি পায় নি। কিন্তু হঠাৎ ওই ইলেকশনের কোন একটা ব্যাপার নিয়ে রাজাবাহাদুরের ক্রোধ হ'ল তাঁর পিসতুতো ভাইয়ের উপর। বিরোধটা হঠাৎ এমন দাবানলের মত জ্বলে উঠল যে দাউ দাউ ক'রে জ্বলতে জ্বলতে এই রায়মশায়ই রাজ এস্টেট ছেড়ে—ইলেকশনের কর্তৃত্ব ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে—সটান গিয়ে উঠলেন—বিপিসিসি অফিসে। এবং কংগ্রেসের সভ্য হয়ে—বীরভূম জেলা থেকে কংগ্রেস নমিনি হিসেবে ভোটযুদ্ধে অবতীর্ণ রথী হয়ে ফিরে এলেন। ট্রাঙ্গুলার ফাইট হয়ে গেল।

নিরঞ্জনের দাদা পুরঞ্জনের সেই খ্যাতনামা মামাশ্বশুর তাঁর বন্ধু রায়বাহাদুরের পক্ষ নিয়ে পুরঞ্জনের বাড়ী এলেন। তাকে নিয়ে বীরভূমের অজয় তীরবর্তী এলাকাগুলো ঘুরলেন। এবং পুরঞ্জনকে সব কাজের ভার দিয়ে গেলেন। আপিস পর্যন্ত খোলা হয়ে গেল। মাইনে ক'রে দু'তিনজন বেকারকে বসানো হ'ল।

নিরঞ্জন তার বাইসিক্ল নিয়ে অজয়ের উত্তর তীর থেকে সিউড়ী—সে অনেক কয়েক ক্রোশ পথ—সেখান পর্যন্ত গিয়ে সিউড়ি বীরভূম কংগ্রেস আপিস থেকে কংগ্রেসপ্রার্থী রায়মশায়ের নির্বাচন ব্যবস্থার সকল ভার নিয়ে ফিরে এল। শুধু তাই নয় পরদিন বর্ধমান শহরে বর্ধমান জেলা কংগ্রেস আপিসে গিয়ে—নগদ চাঁদা দিয়ে নিজে কংগ্রেসের সভ্য হল, তার সঙ্গে তার ক্লাবের অনুগত সব ছেলেগুলির নামে রসিদ কাটিয়ে—দেবগ্রাম কংগ্রেস কমিটি ফর্ম করে, বাজার থেকে একটা সাইন বোর্ড লিখিয়ে নিয়ে বাড়ি ফিরল রাত্রি প্রায় দশটায়।

তাই তো বিরোধী ছিলই। সেই বিরোধ থেকেই এত কাণ্ড। স্ত্রী-পুত্রেরা নিরঞ্জনের তখন খুব ছোট ছিল না। তারাও এতে বিরোধী হয়েছিল। কিন্তু নিরঞ্জন শোনে নি। শোনে নি নয়, কর্ণপাতও করে নি, গ্রাহ্যও করে নি।

একটা যুগের ভাবজীবন যেটা সেটাই হ'ল মানুষের জীবনস্রোতের শক্তির সৃষ্টি। তীর এবং তরঙ্গের সংঘর্ষে তার উদ্ভব। যেখানটিতে কোন একটি বিশেষ কিছু ঘটে সেখানেই গঙ্গার ঘাটের মত ঘাটের সৃষ্টি হয়।

এই ঘটনার মধ্যে বড় ঘটনা হল—বহুর জীবনস্রোতে একটি কোন বিশেষ স্রোতের ধারার মিশে যাওয়া। নদীর দুই কূলের জল—কূল ভাসিয়ে নদীতে এসেই পড়ে। কিন্তু যেখানে সেই কূলের জল অন্য একটি স্রোতকে সৃষ্টি করে—সেই ধারা বেয়ে এসে নদীতে পড়ে তখনই হয় সংগম তীর্থ। যুক্তবেণী। আবার সেই স্রোত ছেড়ে যখন কোন স্রোত বেরিয়ে সাগর-সন্ধানে ছোটে তখন সেটা হয় মুক্তবেণী।

যে ধারা মরুপথে হারা হয় সে ধারা অভিশপ্ত।

যে ধারা সাগর পর্যন্ত যায় সে ধারা—

থাক।

সেদিনের কথাই বলি। সেদিন নিরঞ্জন জনতার জীবনস্রোতে এসে মিশেছিল অনেকগুলি জীবনের জলধারাকে নিয়ে। লোকে নিরঞ্জনের দিকে সবিস্ময়ে তাকিয়ে থেকেছিল।

* * *

১৯২৪ সালে কংগ্রেস বীরভূমে জিতেছিল।

রায়বাহাদুর রাজাবাহাদুর দু'জনকেই হারিয়ে জিতেছিলেন রায়মশায়। সঙ্গে সঙ্গে নিরঞ্জনও বিখ্যাত হ'ল। তাকে রায়মশাই ভালবেসেছিলেন। রায়মশায়কে ভালবাসতেন—দেশবন্ধু। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের ডান হাতের মত তাঁর জীবনকাল পর্যন্ত অবনীশ রায় অহরহই পাশে থাকতেন। স্বর্গীয় জিতেন বন্দ্যোপাধ্যায় স্বর্গীয় সত্যেন মিত্র তাঁরা অবনীশ রায়ের

সঙ্গে তাঁর বাড়ী আসতেন। বীরভূমে সভা-সমিতি ক'রে বেড়াতেন। নিরঞ্জন তাঁদের সঙ্গে ঘুরত। এবং তার আগ্রহাতিশয্যে দু'চার বার দেবগ্রামেও এসেছিলেন।

নিরঞ্জন ক্রমে ক্রমে কলকাতায় পরিচিত হয়েছিল। সুভাষচন্দ্র কিরণশঙ্কর যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত প্রভৃতি-দের সঙ্গেও পরিচিত হয়েছিল। দেশবন্ধুর তিরোধানের পর যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের দলের সঙ্গে থাকতেন। ১৯৩০ সালে নিরঞ্জন চৌধুরী আইন অমান্যও করেছিলেন কিন্তু জেলে যান নি। তা বলে বণ্ড বা দাসখত লিখে ছাড়ান নিয়ে ঘরে ঢোকেন নি। নিরঞ্জন চৌধুরী ছিলেন পাকা জ-জো-ম অর্থাৎ জমিদার জোতদার ও মহাজন; টেনেন্সী অ্যাক্ট থেকে ইণ্ডিয়ান পেনাল কোড, ছেলেবয়েস থেকে বাড়ির গাইয়ের দুধ, বাড়ির পিছনের কৃষ্ণসায়রের জল এবং মোকররী মৌরসী স্বত্বের জমির গোবিন্দভোগ চালের সঙ্গে এবং ক্ষেতের গুড় ও পুকুরের মাছের সঙ্গে আয়ত্ত করেছিলেন। সেই আইন-জ্ঞানের বলে দস্তুরমত মামলা লড়ে ভারত সরকারকে হারিয়ে দিয়ে খালাস পেয়ে বাড়ি এসেছিলেন। এত কথার হয়তো প্রয়োজন হত না কিন্তু এই কথা বা এই অতীত ঘটনাগুলির সঙ্গে অংশুমানের জীবনের যোগ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ; এমনই ঘনিষ্ঠ যে এই ঘটনাগুলি না ঘটলে অংশুমান হয়তো এ সংসারে আসত না, এবং তার মতিগতি প্রকৃতি ঠিক এমনই হত না।

১৯৩০ সালে দেবগ্রাম গ্রামে ১৪৪ ধারা জারি করে সভা সমিতি মিছিল নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। কিন্তু সরকারের খেয়াল ছিল না যে দেবগ্রাম গ্রামখানি সরকারী খতিয়ান অনুযায়ী একটি মৌজা নয়; সদর রাস্তার উত্তর দিকে একসারি বসতি এবং থানাটিই হল সরকারী খতিয়ান অনুসারে দেবগ্রাম। সদর রাস্তাটি থেকে দক্ষিণ দিকে গোটা গ্রামটি হল অন্য একটি মৌজা—তার নাম চক দক্ষিণপাড়া—এবং এইটিই মূল বসতি।

নিরঞ্জন চৌধুরী প্রসেসন নিয়ে গেলেন সদর রাস্তার উপর দিয়ে, থানার সামনে দিয়ে। থানার দারোগা নিরঞ্জন চৌধুরী এবং তাঁর সঙ্গে আরও চারজনকে অ্যারেস্ট করে প্রসেসন ভেঙে দিলে। এখন ১৪৪ ধারা অমান্যের জন্যে মামলা করলে। চৌধুরীর জেলে যাওয়াই ঠিক ছিল। কিন্তু ওই আইনের ফাঁকটা হঠাৎ মনের চোখের সামনে একদিন তাকে-ফেলে-রাখা দুর্লভ বস্তুটির মত চোখে পড়ল; চৌধুরী তাকে উপেক্ষা করলেন না। জামিন নিলেন। উকীল দিলেন। এবং প্রমাণ করে দিলেন, তিনি প্রসেসন নিয়ে গেছেন, ধ্বনি তুলেছেন সবই করেছেন আইনসংগত ভাবে। কারণ ১৪৪ ধারা জারি আছে দেবগ্রামে। তিনি প্রসেসন নিয়ে গেছেন যে রাস্তার উপর দিয়ে সে রাস্তায় দেবগ্রামের এক ইঞ্চি জমি বা সীমানা নেই। পুলিস তাঁকে বা তাঁদের অ্যারেস্ট করে বেআইনী এবং সাম্রাজ্যবাদী খামখেয়ালী অত্যাচারের চরম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। আদালত চৌধুরীকে এবং তাঁর সহকারীদের সসম্মানে ছেড়ে দিয়েছিলেন। দু'চারটে সকৌতুক মন্তব্যও করেছিলেন। কিন্তু সে কথা থাক। ব্যাপারটার ওখানেই শেষ নয়। চৌধুরীরা মামলায় খালাস পেলেন বটে কিন্তু গার্লস স্কুলের শিক্ষয়িত্রী কুমারী শোভা চক্রবর্তীর চাকরিটি গেল।

মেয়েটি মাস ছয়েক আগে সরোজনলিনী মেমোরিয়াল জাতীয় একটি প্রতিষ্ঠানে পড়ে পাস করে দেবগ্রামে চাকরি নিয়ে এসেছিল; বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশও হয় নি। অল্প বয়সের চাপল্যবশে

বা তারুণ্যধর্মের দুঃসাহসবলে মেয়েটি কংগ্রেসের সঙ্গে গোপন যোগাযোগ রেখে তাদের সাহায্য করছিল।

কথাটা কিন্তু গোপন রাখার চেষ্টা সত্ত্বেও অগোচর কারুর ছিল না। তার কারণ শোভা চক্রবর্তী নাটকাভিনয়ের মুগ্ধা ভক্ত ছিল—উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করত। এবং নিরঞ্জন চৌধুরীর লেখা নাটক একখানি ওই শোভা চক্রবর্তী কপি করে দিয়েছিল। এবং এর জন্য শোভা চক্রবর্তীকে কেউ নিন্দা বা অশ্রদ্ধাও করে নি কিন্তু একখানা বেনামী দরখাস্ত গিয়েছিল পুলিসসাহেবের কাছে এবং ডিস্ট্রিক্ট ইন্‌স্‌পেক্টর অব স্কুলের কাছে যে শোভা চক্রবর্তী শুধু গোপনে কংগ্রেসকে সাহায্যই করছে না, নিরঞ্জন চৌধুরীর সঙ্গে তার যে যোগাযোগ ও মেলামেশা তা অত্যন্ত আপত্তিজনক।

তদন্ত একটা হল এবং শোভা চক্রবর্তীর চাকরিও গেল। কিন্তু শোভা চক্রবর্তী দেবগ্রাম থেকে গেল না। স্কুলের শিক্ষয়িত্রীদের বাসা থেকে সোজা এসে উঠল নিরঞ্জন চৌধুরীর বাড়ির অন্দরমহলে। নিরঞ্জন চৌধুরী টোপর মাথায় দিয়ে শোভা চক্রবর্তীকে বিয়ে করলেন।

নিরঞ্জন চৌধুরীর প্রথম পক্ষের স্ত্রী পুত্র কন্যারা ঘরে প্রবল প্রতাপেই দখলিকার ছিলেন। দরখাস্তটা তাঁদের দিক থেকেই হয়েছিল ; বড়ছেলের বয়স তখন বাইশ-তেইশ। বি. এ. পাস করে ল পড়ছিল। মেয়ের বিয়ে হয়েছিল। ছোটছেলে ম্যাট্রিক ক্লাসে পড়ত। তারা প্রবল বাধার সৃষ্টি করেছিল এ বিয়ের পথে কিন্তু নির্বন্ধ,—সে নির্বন্ধ যারই হোক সে এমনি যে তাকে রোধ করা যায় নি। নিরঞ্জন চৌধুরী শোভাকে বিবাহ করলেন জেলা কংগ্রেসের আপিসের বাড়িতে ছাদনাতলা পেতে এবং জেলার ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের খাতায় সই করে। বছরখানেক থাকলেনও সদরে বাসা ভাড়া করে। সেই বাসাতেই সেই বছরের মধ্যে জন্ম হয়েছিল অংশুমানের। অংশুমানকে কোলে করে অংশুর মা মাথায় নামমাত্র ঘোমটা দিয়ে দেবগ্রামের চৌধুরীবাড়ির ছোট তরফে আর একটা ছোট তরফের সৃষ্টি করে সেইতরফে এসে ঢুকেছিল।

নিরঞ্জন চৌধুরীর বৈঠকখানাবাড়ির পশ্চিমদিকে কুলিরাস্তার পশ্চিমদিকে ছিল সাবেক অন্দরমহল—এবার চৌধুরী বৈঠকখানার পূবদিকে কৃষ্ণসায়রের পাড়ে নতুন একটা ছোট দোতলা বাড়ি তৈরী করিয়ে নিয়েছিলেন, সেই বাড়ি হল ছোট তরফের ছোট তরফ।

* * *

অন্ধকার এবং আলো, আলো এবং অন্ধকারের মত পর পর জীবনের মধ্যেকার ফাঁকি মেকী নকল আর সত্য ও আসল নিয়ে টানাপোড়েন দিয়ে তৈরী হয় বোধ করি ইতিহাস। আজ সৃষ্টির বিচিত্র ভঙ্গিতে অংশুমান দেখছিল শুধু ফাঁকি মেকী এবং নকলের দিকটাই। মনে হচ্ছিল সব ফাঁকি সব ফাঁকি সব ফাঁকি। না। না। এমন ক'রে দেখলে চলবে না। না। ভগবান তুমি ক্ষমা কর।

নিরঞ্জন চৌধুরীর বড়ছেলের নাম রমারঞ্জন, ছোটর নাম রাধারঞ্জন। নিরঞ্জন তাঁর ছোটছেলের নাম রাখতে চেয়েছিলেন সুরঞ্জন। তখন এক বছর শোভা চক্রবর্তীর সঙ্গে ঘর করে রমা রাধা কৃষ্ণ কালী প্রভৃতি নামগুলি তাঁর কানে যেন কেমন-কেমন ঠেকতে শুরু

করেছে এবং রঞ্জন শব্দটিতে সু যোগ করে নামটিকে আধুনিক করে নেবার মত মন ও রুচিও হয়েছে চৌধুরীর। কিন্তু শোভা তার ছেলের নাম সুরঞ্জন রাখতে দেয় নি। সে চায় নি যে তার ছেলের সঙ্গে বড়গিন্নীর ছেলেদের নাম বা প্রকৃতির বা রুচির বা কোন কিছুর সঙ্গে এতটুকু মিল থাকবে। সে নিজেই পছন্দ করে নাম রেখেছিল—অংশুমান।

শোভা চৌধুরী বাড়িতে পড়ে একে-একে আই. এ. তারপর বি. এ. পাস করেছিল এবং গার্লস স্কুলের সেক্রেটারী হয়েছিল। চ্যারিটেবল ডিসপেনসারীর মেম্বর হয়েছিল। এবং অংশুমানকে নিজের মনের মত করে গড়ে তুলেছিল। তাঁদের আদর্শমত মানুষ করতে চেয়েছিল। তাতে এতটুকু ফাঁকও ছিল না। ফাঁকিও ছিল না।

* * *

সব মনে পড়ছে। এবং কিছুতেই একে বাঁকা চোখে দেখতে পারছে না। ১৯৪৭ সাল—তখন তার বয়স ষোল। তখনও পর্যন্ত সে ছিল নিষ্পাপ। হ্যাঁ, নিষ্পাপ অনায়াসে তাকে বলা যায়। ইস্কুলে পড়াশোনায় ভাল ছিল। কবিতা লিখত। ভাল আবৃত্তি করত। কাজী নজরুল ইসলামের 'বিদ্রোহী' কবিতা আবৃত্তি করে জেলার আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় সে মেডেল পেয়েছিল। প্রবন্ধ প্রতিযোগিতাতেও দ্বিতীয় হয়েছিল। তা ছাড়া সে তকলীতে সুন্দর সুতো কাটত।

তার বাবা মামলা করে জেল যাওয়া এড়িয়েছিলেন কিন্তু সুতো কাটতেন খদ্দর পরতেন, জাতিভেদ অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে মত পোষণ করতেন, বক্তৃতা করতেন; সকল লোকের—অন্ততঃ যারা পরিচ্ছন্ন তারা যে জাতের লোকই হোক—তাদের বাড়িতে জল খেতেন। জমিদারী জোতদারী ও মহাজনীর ক্ষেত্রে সূক্ষ্ম আইনের উপর চলতেন। ঠকিয়ে কাউকে নিতেন না এবং যেটুকু ন্যায্য পাওনা সেটুকুও ছেড়ে দিতেন না। গান্ধীজীর দৃষ্টান্তে মাছ মাংস খেতেন না। পূজা উপাসনা করতেন। তার এই বাবার অনুসরণে সেও তকলীতে সুতো কাটত, খদ্দর পরত, সকলজনের বাড়িতে এবং হাতে জল খেত। সেও মাছ মাংস খেত না।

তার মা গান্ধীবাদকে উপেক্ষা করতেন না কিন্তু তাঁর গান্ধী-মতবাদে কিছু উগ্রতা ছিল। পূজাটা তিনি পছন্দ করতেন না। বাড়ির দেবোত্তরের যা কিছু পর্বপার্বণ তা পালিত হত ছোটবাড়ির বড় তরফে—ছোট তরফ তার সঙ্গে সম্পর্ক রাখত না। সভাসমিতি করেই শোভা চৌধুরী বেশী বেড়িয়েছিলেন ১৯৪৪ থেকে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত। তারও আগে শান্তিনিকেতন গেছেন—রবীন্দ্রনাথকে দেখেছেন, প্রণাম করেছেন। অংশুমানের মা কখনও একটি সোনার গহনা ছাড়া দ্বিতীয় সোনার গহনা পরেন নি। সেটি হল সোনায় মোড়া বিয়ের লোহার বেড়খানি, তাছাড়া ডান হাতে থাকত সাদা শাঁখা। বাঁ হাতেও শাঁখা থাকত। কিন্তু বাইরে যাবার সময় খুলে ফেলে ঘড়ি বাঁধতেন। মাথায় সিন্দুর ভাল বোঝা যেত না কিন্তু কপালে সিন্দুর বা কুমকুমের টিপটি থাকত নিখুঁত সুন্দর। অংশুমান প্রায় তাঁর সঙ্গে সঙ্গেই থাকত।

মা শোভা চৌধুরীর আকাঙ্ক্ষা ছিল ছেলে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় স্ট্যাণ্ড করে। কিন্তু তা হয় নি—ফার্স্ট ডিভিসনে তিনটে লেটার নিয়ে পাস করেছিল। সংস্কৃত বাংলা অঙ্ক। ইংরিজীটায়

কম নম্বর হয়েছিল—না হলে ডিস্ট্রিক্ট স্কলারশিপটা নিশ্চয় পেত। জেলায় সে সেকেণ্ড হয়েছিল।

১৯৪৭ সালের ম্যাট্রিক পরীক্ষায় পাস করে কলকাতায় পড়তে এল। কলকাতায় তখনও হিন্দু মুসলমান দাঙ্গা চলছে একটা সুদীর্ঘ খাণ্ডবদাহনের মত। বনে আগুন লাগার সঙ্গে এই দাঙ্গার যত মিল তত আর কিছুর সঙ্গে হয় না। কখনও দাউদাউ করে জ্বলে, কিছুক্ষণ জ্বলে, জ্বলা শেষ হয়, সেখানটায় আগুন নেভে কিন্তু দেখতে দেখতে আর এক জায়গায় জ্বলে ওঠে; এখান থেকে যে সব আগুনের টুকরো বা ফুলকি উড়েছে তা গিয়ে অন্য এক বা দু'তিন জায়গায় ঘাসের মধ্যে পড়ে আগুন জ্বালিয়েছে। জ্বলতে জ্বলতে আজও জ্বলে চলেছেই। শুধু এইটুকুই নয়। ১৯৪০ সাল থেকে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত বিরাট বিশ্বযুদ্ধ হয়ে শেষ হয়ে গেল। দেশে স্বাধীনতা আন্দোলনের একটা গান্ধীবাদী আন্দোলন গেল। সুভাষচন্দ্র কলকাতা থেকে বার্লিন—সেখান থেকে সিঙ্গাপুর টোকিয়ো হয়ে কোহিমা এলেন। নেতাজী হলেন। বাংলাদেশে সাইক্লোন হ'ল; বন্যা হ'ল। দুর্ভিক্ষ হ'ল। কালোবাজার পর্দা খুললে। দেশে কম্যুনিস্ট আন্দোলন প্রবল হ'ল। হ'ল অনেক। আদর্শবাদ ভেঙে গেল।

চিন্তিত নিরঞ্জন ও শোভা দুজনে পরামর্শ করে ছেলেকে এনে শোভার এক দিদির বাড়িতে রেখে গেলেন। শোভার ভগ্নীপতি পুলিস কোর্টের উকীল। ভালো উকীল। সংসারটি পরিচ্ছন্ন। ছেলেরা সব চাকরে। বিদেশে বিদেশে ঘোরে। বাড়িতে থাকবার মধ্যে স্বামী-স্ত্রী অর্থাৎ শোভার ভগ্নীপতি এবং শোভার দিদি। থাকার ব্যবস্থা অত্যন্ত সম্মানজনক। মাসে মাসে একটি বেশ ভালো টাকা নিতে হরিচরণবাবু আপত্তি করেন নি। এ ছাড়া লোকজন আসা যাওয়ার মারফৎ তরিতরকারি টাটকা মাছ এবং মিহি চালের উপঢৌকন আসত। ১৯৪৬।৪৭ সাল। তখন সারা বাংলাদেশেই চালের অভাব হয়েছে। গম খেতে হচ্ছে এক.বেলা। কলকাতা শহরে যারা ৪২।৪৩ সালে এসে 'একটু ফেন দেবে মা?' 'দুটো এঁটোকাঁটা?' বলে দোরে দোরে ফিরত তারা, মরেও শেষ হয় নি, দেশে ফিরেও যায় নি, চুপও হয় নি। বরং তাদের দল পুরু হয়েছে, প্রতি বছরে বর্ষার সময় গ্রাম থেকে নতুন নতুন লোক এসেছে।

মা শোভা চৌধুরী যাবার সময় বলে গেছলেন—মন পাতিয়ে পড়। সাবধানে থাকিস। মুখটা আমার উজ্জ্বল করিস। আমার অনেক আশা। তোর বাপেদের গুষ্টির ওই গেঁয়ো জমিদার দেবগ্রামের দেবতা হোস নে যেন। তোর বাপ যে কি ছিল সেকালে, ধারণা করতে পারবি নে। ওই তো মুখের সামনে বলছি। নিজের দাদাদের বড়মায়ের ছেলেদের তো দেখেছিস। বড়দার মত যদি সত্তাগণ্ডার উকীল হোস তাহলে কিন্তু আমি গলায় দড়ি দেব।

বাপ বলেছিলেন—She is right. দেখ আমি মহাত্মাজীর শিষ্য। বুঝেছ। হয়তো ঠিক পারি নে। তবু মনে মনে আমি তাই। একটা বড় কিছু হও তুমি। আর সাবধানে থেকো। দাঙ্গাহাঙ্গামা চলছে। মানুষের জীবনের কোন দাম নেই। সন্ধ্যের আগেই বাড়ি ঢুকো। মাসীমা মেসোমশাইকে যা হবে সব বলবে। ওঁদের অকারণে ভাবাবে না।

And be a good boy—ভবিষ্যতে যাতে man হতে পার। Either a leader or an I. A. S.

হানাহানি হাঙ্গামার মধ্যে সে কলকাতা এক আশ্চর্য কলকাতা। অন্ততঃ তাই দেখেছিল অংশুমান। এক আশ্চর্য কলকাতাকে দেখেছিল।

সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষে তখন মানুষ প্রায় পাগল হয়ে গেছে। বিষপ্রয়োগের ফলে একটা গোটা জাত যেন বিষজর্জরতায় উন্মত্ত হয়ে উঠেছে। বিচারবোধ বিবেচনাশক্তি বিষাক্ত হিংসার কাছে পঙ্গু, বোবা। কিন্তু তারও মধ্যে মধ্যে বিচিত্র মানুষ অকস্মাৎ এসে দাঁড়াচ্ছে। নোয়াখালি থেকে অত্যাচারিতেরা এখানে এসেছে। মুসলমানেরা হিন্দু পাড়া থেকে চলে গিয়ে মুসলমান-প্রধান অঞ্চলে দলে ভারী হয়ে বাস করছে; হিন্দুরা যারা মুসলমান-প্রধান অঞ্চলে ছিল তারা হিন্দু পাড়ায় এসে জমেছে। বস্তির মানুষেরা এক একটা আশ্রয়ে গাদাগাদি হয়ে দিন কাটাচ্ছে। বীভৎস সাম্প্রদায়িকতার মধ্যে একটা যেন বড় কিছু করার মত ভাব বা ভঙ্গি ছিল। এরই মধ্যে নেতারা অহরহ ব্যস্ত। কংগ্রেস ও মুসলীম লীগকে নিয়ে লর্ড ওয়াভেল ও তারপর লর্ড মাউন্টব্যাটেন কথাবার্তা বলছেন। ইংরেজ চলে যাবে বলছে—কিন্তু কাকে দিয়ে যাবে ভারতবর্ষের ভার। সারা ভারতবর্ষ দুর্দশার মধ্যে চরম আত্মঘাতে লিপ্ত থেকেও মনে করছে তারই মধ্যে আছে কল্যাণ এবং মুক্তি।

মেসোমশায় হরিচরণবাবু তখন খুব ব্যস্ত। পুলিস কোর্টের উকীল। সে-সময় পুলিস দাঙ্গার জন্যে যাকে পারছে তাকেই ধরছে। গুণ্ডারা যারা পাকা দাঙ্গাবাজ তারা গা-ঢাকা দিয়ে লুকিয়ে আছে। তারা ছাড়া পাড়ায় পাড়ায় যে-সব তরুণেরা প্রথমে আত্মরক্ষার তাগিদে পরে প্রতিশোধ নেবার ডাকে সাড়া দিয়ে মালকোঁচা মেরে দাঁড়িয়েছে তারাই ধরা পড়ছে বেশী। এই দিক থেকে পুলিস কোর্ট এবং ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের উকীলদের কাজের খুব ভিড় পড়েছে। এবং এই সব নিয়ে আলোচনারও শেষ নেই। সে-আলোচনা উঁচু পর্যায়ের দার্শনিক আলোচনা নয়, বৃহত্তর জীবনের ন্যায়-অন্যায় নিয়ে আলোচনা নয়। সে-আলোচনা একেবারে যা পথে-ঘাটে ঘটছে তাই নিয়ে আলোচনা।

এরই মধ্যে ভারতবর্ষ ভাগ হয়ে স্বাধীন হবে ঠিক হল। সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জীবন যেন পূর্ণিমায় সমুদ্রের মত উথলে উঠল। এবং তারই মধ্যে একদিন সে দেখলে আজাদ হিন্দ ফৌজের একজন সিপাহীকে। বাগবাজার স্ট্রীটের উপর প্যাণ্ডেল বেঁধে সভা হয়েছিল। বক্তা ছিলেন হেমন্ত বসু। অংশুমান দেখতে গিয়েছিল আজাদ হিন্দ দলের সেই সৈনিকটিকে। কালো রঙ, নির্দোষ সরল মুখ, ফৌজী পোশাক পরে ফুলের মালা পরে বসেছিল। আজ মনে প্রশ্ন জাগে—কি ছিল সে মুখের মধ্যে? আজ তার উত্তরও মেলে;—কিছুই ছিল না। না; তার মুখে কিছুই ছিল না! যা ছিল তা ছিল তরুণ অংশুমানের দৃষ্টির মধ্যে। সে দৃষ্টিতে সে দেখতে পেত স্বাধীন ভারতবর্ষকে। সে স্বাধীন ভারতবর্ষ আশ্চর্য এক ভারতবর্ষ। আজ মনে হয় সে হল তার নির্বোধ এবং মূর্খ মনের অতিহাস্যকর এক কল্পনা। পরীদের ডানা মেলে উড়ে বেড়ানো কল্পনার মত একটা বোকা এবং ছেলেমানুষী কল্পনা। সে দেখত স্বাধীন ভারতবর্ষ—সত্যবাদী মানুষের দেশ ভারতবর্ষ। অহিংস মানুষের দেশ ভারতবর্ষ। জ্ঞানী

তপস্বীর দেশ ভারতবর্ষ। কম্যুনিস্ট না হয়েও আশ্চর্য এক সাম্যের দেশ ভারতবর্ষ। সে এক অতিবিচিত্র এবং বাস্তবে অতি-অসম্ভব সোনার পাথরবাটি ভারতবর্ষ। সেদিন কিন্তু এতটুকু অসম্ভব মনে হয় নি। এক তিল এক চুল না। বরং চোখের সামনে সে ভারতবর্ষ রূপ নিচ্ছিল—এ সে স্বচক্ষে দেখেছে।

সে বেলেঘাটায় গান্ধীজীকে দেখতে গিয়েছিল। গান্ধীজী তখন বেহার থেকে কলকাতায় এসেছেন। এবং বেলেঘাটায় বিপন্ন মুসলমানদের রক্ষা করবার জন্যে সেখানেই গিয়ে বাস করছেন। মুসলীম লীগ সরকারের মুখ্যমন্ত্রী সুরাবর্দী সাহেব তখন নিজেকে বিপন্ন মনে করছেন। দেশের লোকও ভাবছে এই এত বড় নিষ্ঠুর এবং কুটিল রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী এই ব্যক্তিটিকে প্রতিহিংসাজর্জর দেশের মানুষ কিছুতেই নিষ্কৃতি দেবে না। ওদিকে ভারতবর্ষের শাসনক্ষমতা হস্তান্তরের দিন ঠিক হয়ে গেছে ১৫ই আগস্ট। সুরাবর্দী সাহেবও বেলেঘাটায় রয়েছেন গান্ধীজীর কাছে।

সেদিন অংশুমান গান্ধীজীকে দেখেছিল। প্রার্থনা সভার সামনের দিকেই বসে সে সারাক্ষণ ওই বিচিত্র মানুষটির দিকে তাকিয়েছিল।

সেই দিনই গান্ধীজী অনশনের সংকল্প ঘোষণা করলেন। এই হিংসা রক্তপাত বন্ধ না হলে তিনি অনশনে প্রাণত্যাগ করবেন।

"রঘুপতি রাঘব রাজারাম" ভজন গানের পর "হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী নিত্য নিঠুর দ্বন্দ্ব" গানখানি গাওয়া হয়েছিল। সে গান শুনে সে কেঁদেছিল। একা সে নয় আরও অনেকে। অনেকে চোখ মুছেছিল। এবং বুকের ভিতরটা যেন এক পরমাশ্চর্য পরমশুদ্ধ কিছু দিয়ে কানায় কানায় ভরে উঠেছিল। উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল জীবন মন। মনের কাছে অসম্ভব কিছু মনে হয় নি। এবং জীবনোচ্ছ্বাসে দেহের স্নায়ুশিরাগুলি রক্তস্রোতের চাপে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল।

কলকাতায় ফল হয়েছিল সঙ্গে সঙ্গে। বউবাজারের হিংসাশ্রয়ী দলের সব থেকে বড় নায়ক এবং উত্তর কলকাতার হিংসাশ্রয়ী দলের তেমনি একজন নায়ক রাত্রে গান্ধীজীর বাসস্থানে এসে টমিগান পাইপগান পিস্তল শটগান ছোরা ছুরি তলোয়ার সড়কি বর্শার বোঝা এনে তাঁর পায়ের তলায় নামিয়ে দিয়ে প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেছে যে, তারা নিজেরা আর হিংসা করবে না এবং অন্যদেরও করতে দেবে না। গোটা দেশে সে একটা আশ্চর্য ভাবস্রোত বয়ে গিয়েছিল। যার প্লাবনের মধ্যে সমস্ত ছোট ভাবনা ক্রূর ভাবনা কদর্য ভাবনা চাপা পড়ে গিয়েছিল। একটা পঙ্কিল বিষাক্ত বীজাণু-দূষিত বদ্ধ জলার উপর এই স্রোতটা এসে পড়ে সব কিছুকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল।

এরপর এসেছিল ক্লাইম্যাক্স।

শচীন মিত্তির সতীশ বাঁড়ুজ্জে এবং সুশীল স্বাধীনতা দিবসের আগের দিন নতুন হিংসার আকস্মিক প্রজ্বলনকে নেভাতে গেলেন এবং সেইখানেই ছুরি খেলেন। ছুরি খেয়ে হাসপাতালে এলেন কিন্তু দেশকে বললেন—"এ ওদের মর্মান্তিক ভুল। এ হিংসা নয়। একে ভুলে যাও।"

গান্ধীজী বললেন—শচীন স্মৃতীশ সুশীল অহিংসার সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেল।

মানুষ মরে। মরে শেষই হয়ে যায়। পরলোক নেই—জন্মান্তরও নেই। তবু গান্ধীজীর কথা সেদিন আশ্চর্যভাবে সত্য মনে হয়েছিল।

অংশুমানও পরলোক জন্মান্তর এবং দেবতাকে ঠিক বিশ্বাস করত না। কারণ তার মা এসবে বিশ্বাস করতেন না। দেবোত্তরের কোন দায়িত্ব তিনি নিতেন না। অংশুমানের বড়মা দেবোত্তর চালাতেন এবং দেবোত্তরের আয় আমদানী সব নিতেন তিনি। সে নেহাত তুচ্ছ ছিল না। নাথরাজ বাগান পুকুরের মধ্যে সব থেকে শ্রেষ্ঠ যা তাই ছিল দেবতার নামে। বাড়ির দোরে কৃষ্ণসায়র পুকুর এবং পাড়ের উপর কলমের বাগান ছিল ও অঞ্চলের সেরা সম্পত্তি। কৃষ্ণসায়রের জল যেমন ছিল কাজলকালো, মাছ হত তেমনি প্রচুর এবং মাছের স্বাদ ছিল তেমনি মিষ্টি। আর বাগানে ছিল ল্যাংড়া, হিমসাগর, বোম্বাই, ফজলী আমের গাছ—তার সঙ্গে ছিল লিচু পেয়ারা কলসা প্রভৃতি নানান ফলের গাছ। এই সম্পত্তিতে দেবোত্তরের অংশের মতই নিরঞ্জন চৌধুরীর অংশ ছিল আটআনা। সে আটআনার সবটাই নিতেন নিরঞ্জনের প্রথমা স্ত্রী; তাতে অংশুমানের মা আপত্তি করতেন না। নিরঞ্জন চৌধুরী একবেলা খেতেন ও-বাড়িতে একবেলা এ-বাড়িতে। সুতরাং অংশুমানের মা মেনে নেওয়াতেই কোন গণ্ডগোল হয় নি। এবং অংশুমানের মা এমন কড়া ছিলেন এ বিষয়ে যে, অংশুমানকে কোনদিন ও বাগানের একটা ফল বা ঠাকুরবাড়ির কোন প্রসাদের কিছুটাও খেতে দিতেন না। মাছ তো সে খেতোই না।

সেকালে অংশুমানের মন মায়ের আদর্শের এই নিষ্ঠার গৌরবে পরিপূর্ণ হয়ে উঠত। মুগ্ধদৃষ্টিতে মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকত।

আজ মনে হয়, না—। থাক সে কথা।

গান্ধীজীর কথা এবং সেদিনের দেশ ও মানুষ ছিল আশ্চর্য এবং বিস্ময়কর। অন্ততঃ ১৪ই আগস্ট রাত্রি নটা পর্যন্ত ছিল। রাত্রি নটা পর্যন্ত সেটা যে রাত্রিকাল—তার রূপ যে কালো এ কথাও তার মনে ছিল না। শুধু আলো আলো আর আলো। কলকাতার সে আলোক-সজ্জার স্মৃতি আজও মনে পড়ে। কিন্তু তাকে আজ আর সেদিনের মত সত্য বলে মনে হয় না। সেদিন মনে হয়েছিল এই যে আলো জ্বলল—এই যে বিচিত্র বহুবর্ণের আলোর ঝলোমলো এ আর কোনদিন নিভবে না। এইটিই হল স্বাধীন ভারতবর্ষের স্বরূপ।

রাত্রি দশটার সময় হঠাৎ—।

সন্ধ্যেবেলা থেকে সে বেরিয়েছিল স্বাধীনতা উৎসব দেখতে। তার বাবা মা তাকে দেশে যেতে বলেছিলেন। কারণ ছিল। কারণ সেদিন দেবগ্রামে স্বাধীনতা উৎসবের কেন্দ্রস্থল ছিল নিরঞ্জন চৌধুরীর ছোট সংসার; শোভা চৌধুরীর বাড়ি। ১৯২৪ সাল থেকে নিরঞ্জন চৌধুরী যে তেরঙ্গা ঝাণ্ডা ধরেছিলেন সে-ঝাণ্ডা সেদিন সেই উড়িয়ে ঘোষণা করবে ভারতবর্ষের সঙ্গে সঙ্গে দেবগ্রামও স্বাধীন। এবং স্বাধীন দেবগ্রামে সর্বময় কর্তা হলেন নিরঞ্জন চৌধুরী এবং তাঁর ছোটস্ত্রী শোভা চৌধুরী।

দু'দিন আগে বাড়ির নায়েব এসে বাজার করে নিয়ে গিয়েছিল এবং অংশুমানকে

বলেছিল—বাবু যেতে বলছেন—ছোটমা যেতে বলেছেন। বাজারের মধ্যে বাতি মাটির প্রদীপ ছিল গাদা গাদা, তা ছাড়া বারুদের কারখানা।

আরও শুনেছিল, এই উপলক্ষ্যে বিশেষ ভোগরাগ হবে। সেই ভোগরাগে এবার ছোটমা যোগ দেবেন। এবং স্বাধীনতা উৎসবের উদ্যোগ-আয়োজনে বড়মা ইতিমধ্যেই এসে যোগ দিয়েছেন।

১৪ই সন্ধ্যে থেকে সকলে এসে থানা-কম্পাউণ্ডে জড়ো হবেন। সেখানে সন্ধ্যে থেকে গান হবে। স্বদেশী গান। রাত্রি একটায় শাঁখ বাজতে শুরু করবে। বোমবাজি ফাটতে আরম্ভ করবে। তারপর পুড়বে আতসবাজি—বারুদের কারখানা। পরদিন সকালে নিরঞ্জন চৌধুরী পতাকা তুলবেন। মিটিংএ সভাপতিত্ব করবেন। সেদিন সন্ধ্যেবেলা হবে থিয়েটার। বই হবে "চিতোরোদ্ধার"। এ নাটকখানি নিরঞ্জন চৌধুরীর লেখা নাটক। এতকাল রাজদ্রোহের ভয়ে অভিনীত হয় নি।

অংশুমান এতেও প্রলুব্ধ হয় নি।

অংশুমানের ভিতরের মানুষ সেদিন বোধ হয় জেগেছিল। না-হলে সে নিশ্চয় যেত। অথবা—।

আজ ১৯৩১ সালে মনে হচ্ছে হয়তো বা 'ভাগ্য'। সেদিন ভাগ্য সে মানত না। কাল সন্ধ্যেবেলা, তাই বা কেন, ভোরবেলা পর্যন্ত ভাগ্য সে মানে নি। এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে—ভাগ্য। ভাগ্যই তাকে যেতে দেয় নি। কলকাতায় রেখে দিয়েছিল।

১৪ই আগস্ট, ভাগ্য,—। না, ভাগ্য সে বলবে না। বলবে, বাস্তব। সন্ধ্যেবেলা উৎসবময়ী স্বাধীন কলকাতাকে দেখবার জন্য বেশ সেজেগুজেই বেরিয়েছিল। মেসোমশাই মাসীমা তাকে ছুটি দিয়েছিলেন খুশী মনে। বলেছিলেন—নিশ্চয় যাবে। যাও দেখে এস। যত রাত্রি হয় হোক, ভাল করে ঘুরে দেখ। শুধু সাবধান; হঠাৎ যদি দেখ হাঙ্গামা মানে সিচুয়েশন রায়টাস হয়ে উঠেছে তাহলে সেখান থেকে সরে এস। বুঝেছ?

খদ্দরের ধুতির সঙ্গে সিল্কের পাঞ্জাবি এবং কাবুলী চপ্পল পরে বেরিয়েছিল সে। শরীরে তার শক্তির অভাব ছিল না। দেহ তার শক্ত এবং সমর্থ—তার সঙ্গে লম্বা সে তখন থেকেই। এখনকার মত চওড়া সে হয় নি। চওড়া বলতে বুকের পাটা হাতের মাসল্ এবং হাড় মোটার কথা হচ্ছে। তখন সে ছিল হিলহিলে লম্বা তবে শক্তও নেহাত কম ছিল না। বয়স থেকে একটু বড়ই দেখাত তাকে।

আলোয় আলোময় কলকাতা। সুসজ্জিত তোরণে তোরণে, মালায় মালায়, আলোয় আলোয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের চন্দ্রগুপ্তের 'সেই বিবাহের কন্যার মত' সেজেছিল। মাইকে মাইকে গান গান গান।

"ধন ধান্যে পুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা।" একটু আগে বাজছে "অয়ি ভুবন-মনমোহিনী।" আর একটু আগে বাজছে—"বন্দে মাতরম্"। আরও একটু গিয়ে "বাংলা-দেশের হৃদয় হতে কখন আপনি এই অপরূপ রূপে বাহির হলে জননী।" হ্যারিসন রোড পার হয়ে বিচিত্র ভাবে তিনটে জায়গায় একটা গান বাজতে শুনেছিল—"উঠ গো ভারতলক্ষ্মী উঠ

আদি জগৎজনপূজ্যা!" ফায়ার বিগ্রেড মহম্মদ আলি পার্কের ওপাশে তখন বাজছে—"ছাড়ো গো ছাড়ো সুখশয্যা—কর সজ্জা পুণ্য কমল কনক ধন ধান্যে। জননী গো লহ তুলে বক্ষে, সান্ত্বনাবাস দেহ তুলে চক্ষে, কাঁদিছে তব চরণতলে ত্রিংশতি কোটি নরনারী গো!" অপরূপ একটি স্বপ্নাচ্ছন্নতা তার মন চিত্ত এমন কি বাস্তব সত্তাকেও অভিভূত করে ফেলেছিল। জনতার মধ্যে সে যেন ভাসতে ভাসতে চলেছিল সম্মুখের দিকে মেডিক্যাল কলেজের সীমানা পার হয়ে। ইডেন হসপিট্যাল রোডের মুখে তখন বাজছিল—"দুঃখ দৈন্য সব নাশি কর দূরিত ভারতলজ্জা।"

একই গান তিনটি জায়গায় বাজার জন্যে একটি বিচিত্র স্বপ্নঘোরের সৃষ্টি হয়ে উঠেছিল। অন্যের মনে সে স্বপ্নের ছোঁয়াচ লেগেছিল কি না সে বলতে পারবে না তবে তার মনে সৃষ্টি হয়েছিল। হঠাৎ স্বপ্নঘোরটা যেন হাত থেকে পড়ে কাচের জিনিসের মত ভেঙে গেল। কি একটা কারণে একটা হুড়োহুড়ির একটা চাপ চারিপাশে ছড়িয়ে পড়ছিল, কিছু ভেঙে পড়ার প্লাস্টের মত, সেই চাপটার মধ্যে সেও পড়ল। পিছন থেকে মানুষ পড়ল তার ঘাড়ে। সে উপুড় হয়ে পড়েই যেত কিন্তু শক্ত সবল তরুণ বয়স বলেই পড়তে পড়তেও সামলে নিয়ে দাঁড়িয়েই রইল। তবে ধস্তাধস্তির মধ্যে হাতের ঘড়িটা ব্যাণ্ড ছিঁড়ে পড়ে গেল হয়তো তারই পায়ের তলায়। অথবা চলে গেল কারুর হাতের মধ্যে। স্বপ্নঘোর কেটে গেল তার। সে সাবধান হল। একটু এগিয়ে গিয়ে সে ইডেন হসপিট্যাল রোডে ঢুকে একটু দাঁড়াল এবং দেখে নিলে আর কি গেছে! আরও গেছে—লাল রুবি বসানো চেনসুদ্ধ সোনার বোতামছড়াটা ছিঁড়ে নিয়েছে। কিন্তু মনিব্যাগটা আশ্চর্য ভাবে রয়ে গেছে। আশ্চর্য ভাবে ঠিক নয়। বোতাম ঘড়ি সম্পর্কে তো সাবধান হওয়ার উপায় ছিল না। ব্যাগটা সম্পর্কে সে উপায় ছিল। ব্যাগটা রেখেছিল পাঞ্জাবির নিচে টুইলের ফতুয়ারও ভিতরপকেটে। সেই কারণে থেকে গেছে। ব্যাগটার মধ্যে ষাটটা টাকা ছিল, কয়েকটা কাগজ ছিল, হাতের বোতাম ছিল। এবং একটা গুপ্ত খোপরে আলাদা একখানা একশো টাকার নোট ছিল। ওটা তার মা-বাবা বিপদে আপদের জন্যে রাখতে বলেছিলেন। এগুলো যায় নি। নিশ্চিন্তও হয়েছিল এবং বিচিত্র হেসে সজাগও হয়েছিল। মনে হয়েছিল বাস্তব স্বাধীন ভারতবর্ষ এইই বটে।

* * *

ঠিক এই সময়েই পিছন থেকে তার কাঁধে হাত দিয়ে কে মিহি মিষ্টি গলায় বলেছিল—আচ্ছা ছেলে বাবা! এমনি করে হাত ছেড়ে দিলি—এখন আমি যদি তোর পাত্তা না পেতাম!

চমকে উঠে সে পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখেছিল একখানি সুশ্রী মিষ্টি মুখ। তার থেকে বয়সে বড়। কিন্তু বেশী বড় নয়। তবে অত্যন্ত সপ্রতিভ। সেদিনের সেই আলোর মধ্যে তাকে যেন খুব উজ্জ্বল মনে হয়েছিল। না হলে অতসী এতখানি উজ্জ্বল ছিল না।

অতসী তার নাম। না। অতসীকে সে চিনত না। সে অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকেছিল। কিন্তু ভারী ভাল লেগেছিল। সমস্ত দেহ মন যেন আনন্দে চাঞ্চল্যে চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। অদ্ভুত ভাল লেগেছিল সমস্ত কিছুকে। তারপরই অতসী জিভ কেটে বলেছিল—না তো! তুমি কে? তুমি তো বাদল নও! বাদল কোথায় গেল! আমি তোমায় বাদল আমার ভাই বাদল মনে করেছিলাম। এই ভিড়ে যে কোথায় হাত ছেড়ে চলে গেল!

অংশুমান তখন কিশোর। সেই তার প্রথম রোমান্স। কলকাতার রাজপথের উপর এমন একটি আনন্দোৎসবের মধ্যে একটি যুবতীর সঙ্গে প্রথম আলাপ। সে সেধে আলাপ করছে। পৃথিবীর সব কিছু মিথ্যা হয়ে ওইটুকুই পরম সত্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তবে সে মুখচোরা ছিল না। জিজ্ঞাসা করেছিল—কোথায় যাবেন?

অতসী বলেছিল—দেখতে বেরিয়েছিলাম, ঘুরব ভেবেছিলাম অনেক। কিন্তু বাদলের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল।

একটু বিপন্ন ভাব দেখিয়েছিল। সেদিন তখন বুঝতে পারে নি অংশুমান, কিন্তু পরে বুঝতে পেরেছিল যে তার মধ্যে অতসীর মুচকি হাসি প্রচ্ছন্ন ছিল। তারপরই অতসী বলেছিল—বাড়ি ফিরে যাব, আমাকে একটু বাড়ি পৌঁছে দেবে?

অংশুমান বলেছিল—চলুন।

তার হাতখানা টেনে নিয়ে নিজের হাতে চেপে ধরে অতসী বলেছিল—আমার হাত তুমি ধর। চেপে ধর। কেমন?

সত্যিই সে চেপে ধরেছিল অতসীর হাত। অতসীর হাতখানা গরম সেই সঙ্গে অপূর্ব রকমের কোমল মনে হয়েছিল।

কয়েক পা উত্তরমুখে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে বলেছিল—তোমার নাম কি?

সে বলেছিল—অংশুমান চৌধুরী।

—বাঃ, খাসা নাম তো! অংশুমান চৌধুরী। অংশুমান মানে সূর্য? নয়?

—ঠিক বলেছেন তো!

—বলব না? মুখ্যু তো নই! আচ্ছা অংশু—।

—বলুন।

—তুমি আমাকে বাড়ি পৌঁছে দেবে তো?

—তাই তো যাচ্ছি।

—তাহলে চল না, আর একটু ঘুরি দুজনে। তারপর আমাকে পৌঁছে দিয়ে তুমি চলে যাবে। তোমারও দেখা হবে আমারও হবে।

খুব উৎসাহিত হয়ে উঠেছিল অংশুমান। বলেছিল—বেশ তো। খুব ভাল হবে। আমারও তো রাজভবন পর্যন্ত যাবার ইচ্ছে। চলুন।

আবার ফিরেছিল তারা দক্ষিণমুখে। অতসী নিজেই তার পরিচয় দিয়েছিল—সে অতসী। বলেছিল—তুমি ঠিক বাদলের মত দেখতে। বাদল তোমার থেকে একটু ছোট। কত বয়স তোমার?

অংশু বলেছিল—ষোল।

অতসী বলেছিল—ওরে ছেলে, তুমি তো সাবালক হয়ে গেছ। আমারই বয়সী প্রায়। আমি সতের। তোমার থেকে মোটে এক বছরের বড়। আমার দিদি বলবে। বলে তার তর্জনীটি তার মুখের কাছে নেড়ে দিয়েছিল।

বিচিত্র সে স্মৃতি। আজও মনে করতে তার মনে সেই চঞ্চলতা যেন চকিতের একটা চমক

দিয়ে মিলিয়ে যায়!

অতসী তাকে রাজভবন ফেরত এনে তুলেছিল বিডন স্ট্রীটের কাছাকাছি একটা বাড়িতে। —এস! বলে তার হাত ধরে উপরে একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে দু'হাতে জাপটে তাকে তার বুকে চেপে ধরেছিল। একটা কথা বলেছিল—ভেবে বলে নি কিন্তু কথাটা নিয়ে অংশুমান আজও ভাবে। বলেছিল—এস, আমরাও আজ স্বাধীন।

* * *

না। তার জন্য সে অনুতাপ করে না। অতসী যা বলেছিল সেটাও তার পক্ষে স্বাভাবিক। দুঃখ এই যে, সে প্রতারিত হয়েছিল; অতসীকে দিয়ে তাকে এমন ফাঁদে ফেলে মজা করতে চেয়েছিল ওই শিবকিংকর গুপ্ত।

তাদের গ্রামের গুপ্তবাড়ির ছেলে, শিবকিংকর বি. এ. পাস করা লোক; সম্পত্তি ওদেরও ছিল, ভাল সম্পত্তি। বেশ সচ্ছল অবস্থা। বয়স তখন ছিল সাতাশ-আটাশ। কলকাতায় দালালি করত। পাটের দালাল। থিয়েটারে খুব ঝোঁক ছিল। অভিনয় করতে ঠিক পারত না তবু অ্যামেচার ক্লাব নিয়ে মাতামাতি করতে তার জুড়ি বড় একটা মিলত না। থিয়েটারের ব্যবস্থা বন্দোবস্ত করত নিখুঁত। মদ খেতো। এসব কথা গ্রামের লোকেও জানত। তাদের গ্রামেও অ্যামেচার ক্লাব আছে। সেখানেও শিবকিংকর পাণ্ডা। গ্রামের বড়ঘরের ছেলেরা তার বৈমাত্রেয় ভাইরা জ্যাঠতুত ভাইরা অভিনয় করে। তার বাবারও এককালে শখ ছিল। শখ ছিল না তার মায়ের। মা তার বিরূপ ছিলেন থিয়েটারের উপর। সেই কারণে তার বাবা আর নামতেন না। তার মা অংশুমানকে অতি যত্নের সঙ্গে এই মাতিয়ে তোলা শখটি থেকে সরিয়ে রেখেছিলেন।

শিবকিংকরকে তিনি একটু বেশী কঠোর চোখে দেখতেন। সেকালে তাঁর নামে কম ব্যঙ্গবিদ্রূপ করত না শিবকিংকর। অর্থাৎ অংশুমানের মায়ের নামে।

সেদিন শিবকিংকরও অতসীকে নিয়ে স্বাধীনতা দিবস দেখতে বেরিয়েছিল। অতসী একজন অ্যামেচার থিয়েটারে পার্ট করা অভিনেত্রী—অতসী মুখার্জী। অতসী তাদের গ্রামের থিয়েটারে গিয়ে কিছুদিন আগেই অভিনয় করে এসেছে। এবং অংশুমানদের বাড়িও দেখে এসেছে। শিবকিংকর পথে দেখতে পেয়েছিল অংশুমানকে। এবং অতসীকে তাকে দেখিয়ে দিয়ে বলেছিল—ওকে যদি আজকের দিনে এঁটো করে দিতে পার তবে তোমাকে খেতাব দেব স্বর্ণমৃগী।

অতসী সেই জাতের মেয়ে যাদের সোনার-লোভ টাকার-লোভের চেয়ে রোমান্সের-লোভ কম নয়, বেশী। যে-মেয়েরা জীবনে অনেকবার সত্যিসত্যিই প্রেমে পড়ে এবং বার বার নিজেরাই সে প্রেম ভেঙে, নতুন প্রেমে পড়ে ও পড়তে ভালবাসে সে তাদেরই মধ্যে পড়ে। সেদিন ১৫ই আগস্টের মত একটি সমারোহের আলোয় আলোময়, গানে গানময়, উল্লাস ও উচ্ছ্বাসময় রাত্রে এ খেলার জন্য তার মন উদ্‌গ্রীব হয়েই ছিল। শিবকিংকর কথাটা বলবা মাত্র সে খেলায় নামতে এবং মাততে কোমরে যেন আঁচল বেঁধেছিল। এবং অংশুমানকে একটু কাছ থেকে দেখে মন তার দ্বিধা করে নি, ঝপ করে লাফ দিয়েছিল।

অংশুমানের চোখ দুটি আশ্চর্য সুন্দর দুটি ডাগর চোখ। সে চোখ কোমল নয়—সে চোখ দীপ্ত এবং উগ্র। সে চোখ যখন হাসে তখন বিদ্যুতের মত ঝলক দেয়। রাগলে ভয় করে। কাঁদলে, সে কান্না যে দেখে তার বুক ফেটে যায়। নাকের ডগাটা একটু মোটা। কপাল-খানা চওড়া ; এবং কপালের বাঁ দিক ঘেঁষে চুলে একটা ঘূর্ণি আছে। যেন সিঁথি কাটবার ঠাঁইটুকু চিহ্নিত করা আছে।

এর উপরেও আরও খানিকটা আকর্ষণ অতসী অনুভব করেছিল দেবগ্রামের চৌধুরীবাড়ির কথা মনে করে। নিরঞ্জন চৌধুরী এবং শোভা চৌধুরী স্বামী-স্ত্রীতেই সেবারকার ক্লাবের ফাংশনে সভাপতি এবং প্রধান অতিথির আসন দখল করেছিলেন। তখন দেশ স্বাধীন হবে-হবে হচ্ছে-হচ্ছের সময়। একসঙ্গে জমিদার মহাজন জোতদার এবং কংগ্রেসী—এ একেবারে সুদুর্লভ ব্যাপার। সুতরাং তাঁদের খাতিরের আর শেষ ছিল না। উইংসের ফাঁকে দাঁড়িয়ে অতসী তাঁদের সে-খাতির দেখেছিল। এবং নিজেও খানিকটা খাতির আবার খানিকটা ঈর্ষা মেশানো একটি মনোভাব অনুভব করেছিল। সেটাও তাকে যেন এ খেলায় উদ্দীপিত করে তুলেছিল।

এসব কথা অংশুমানকে অতসীই বলেছিল। পরের দিন সকালে। সেদিন রাত্রে সে স্তব্ধ হয়ে অতসীর বাহুবন্ধনে বদ্ধ হয়ে ছিল এবং কখন একসময় সেই তাকে অর্থাৎ অতসীকে তার বাহুবন্ধনের মধ্যে বেঁধে ফেলেছিল। তার সে বাহু দুখানি দুর্বল ছিল না। দেহ ছিল তার এক্সারসাইজ করা। পেশীগুলি কঠিন হয়ে উঠেছিল দেহক্ষুধায় উন্মত্ত আবেগের প্রচণ্ডতায়। অতসী লতার মত এলিয়ে পড়েছিল নির্বাক হয়ে।

কখন যে সারারাত্রি শেষ হয়ে গিয়েছিল তার খেয়াল ছিল না। তারও না। অতসীরও না। ঘুম যখন ভাঙল তখন রোদ উঠেছে। ১৫ই আগস্টের সূর্যোদয় হয়ে গেছে। অতসীই চমকে উঠে বলেছিল—কি সর্বনাশ! এ যে রোদ উঠে গেছে। ওঠো ওঠো! না হলে তুমি বিপদে পড়বে। তোমার চেনা লোকের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে।

সে-ই তাকে ঘর থেকে বের করে নিয়ে ঘরে চাবি দিয়ে পথে এসে বলেছিল—এ আমার রাত্রির আস্তানা। আমি ভদ্রঘরের মেয়ে। আমার মা আছে বাপ আছে ছোট ছোট ভাই আছে। লেখাপড়াও জানি। ক্লাস নাইন পর্যন্ত পড়েছি। তারপর—। বিচিত্র হাসি হেসে বলেছিল—যুদ্ধের সময় বাবার চাকরি গেল। তখন আমার দাদা ছিল একজন। সেই দাদা আমাকে হোটেলে নিয়ে যেত। দাদা দালালি করত আমি নিজেকে বেচতাম। তারপর এই অ্যামেচার থিয়েটারে পার্ট করতে লাগলাম। দাদা মারা গেল। এখন নিজেই বিচরণ করি। একটু চুপ করে থেকে আবার বলেছিল—দেখ দেহ নিয়ে কারবার করি আমি। গরীবের ঘরের মেয়েদের যাদের বিয়ে হয় না তাদের অনেকজনের ভাগ্যে এই হয়।

কথা বলতে বলতেই তারা হাঁটছিল। চলছিল বিডন স্ট্রীট সেণ্ট্রাল অ্যাভেন্যুর দিক থেকে কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটের দিকে। অতসীর বাড়ি কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট থেকে বেরুনো একটা এঁদো গলিতে। যে ঘরখানায় রাত্রে ছিল সেখানাকে অতসী বলত—আপিস। হেসেই বলত—এ হল আমার আপিস।

পথে একটা রেস্টুরেন্টে চা খেয়ে নিয়েছিল দুজনে। সেখানেই অতসী তাকে বলেছিল শিবকিংকরের কথা।—শিবকিংকর গুপ্তকে চেনো?

চমকে উঠেছিল সে—শিবকিংকর গুপ্ত?

—তোমাদের গ্রামের।

—তুমি কি করে চিনলে তাকে?

হেসে অতসী বলেছিল—সে-ই তোমাকে চিনিয়ে দিলে কাল। বললে—ওকে যদি ভোলাতে পার তাহলে বুঝব তুমি সত্যি স্বর্ণমৃগী। তোমাকে ভোলাবার জন্যেই তোমার ঘাড়ে হাত দিয়ে তোমাকে ডাকলাম 'বাদল' বলে। কিন্তু শেষে দেখছি তুমি ভোল নি, আমিই ভুললাম।

চমকে উঠে স্থিরদৃষ্টিতে সে তাকিয়ে থেকেছিল অতসীর মুখের দিকে। ভয় অনুতাপ পাপ বোধ সব কিছু একসঙ্গে মিশে তাকে যেন অধীর করে তুলেছিল একমুহূর্তে।

অতসী বলেছিল—ভয় নেই তোমার। তার হাতে তোমাকে আমি ধরিয়ে দেব না।

অত্যন্ত মৃদুস্বরে বলেছিল—তাহলে তার কথা তোমাকে বলতামই না। তোমাকে আমি ভালবেসেছি অংশু। তুমি বিশ্বাস করো।

অতসীর মত সহজভাবে সোজা কথা কাউকে বলতে শোনে নি অংশুমান। না-হলে—"পেটের যেমন একটা ক্ষিদে আছে দেহের তেমনি একটা ক্ষিদে আছে অংশু। এ ক্ষিদে পুরুষের মেটানো সোজা কিন্তু মেয়েদের পক্ষে এ বড় কঠিন। লজ্জা তাদের জন্মগত; তারা মুখ ফুটে বলতে পারে না। তা ছাড়া তাদের উপর সমাজের কড়াকড়ির আর শেষ নেই। চোর-ছ্যাঁচড়ের পরিত্রাণ আছে কিন্তু মেয়েদের এ অপরাধের আর মাফ নেই। আমার সব গেছে—আমি আজ সব হারিয়ে বেপরওয়া—আমি তাই বলতে পারছি। যারা বলতে পারে না তাদের যে সে কি জ্বালা—"

অংশুমান ভাবছিল নিজের কথা। অনেক কথা তার মনের মধ্যে পরের পর এসে দাঁড়িয়েছিল তার সামনে এবং প্রশ্ন করেছিল—এ কি করলে তুমি? তোমার লজ্জা হল না? ভয় হল না? তোমার কি হবে ভেবেছ? মায়ের সামনে কেমন করে দাঁড়াবে বল তো? বাবার সামনে? নিজের সামনে? ভগবানের সামনে? এ কত বড় পাপ বল তো?

ভাবতে ভাবতে একসময় দুই হাতের তেলোর মধ্যে নিজের মুখ লুকিয়ে সে ভেঙে পড়েছিল চায়ের টেবিলটার উপর। ভাগ্যে সেটা ছিল কাঠের পার্টিশন দিয়ে ঘেরা একটা ছোট কেবিন তাই রক্ষা। অতসী—আশ্চর্য অতসী। সে তাকে সোজা সহজ কথায় সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিল—ছি, এই রকম করে না। তাহলে তো আমাকে বিষ খেতে হয়। হয় না? তুমিই বল?

এ কথার সে উত্তর দিতে পারে নি। উত্তর সে জানতও না। সেদিন তাকে বুঝিয়ে নিজের আঁচলে তার চোখ মুছে দিয়ে অতসী তাকে সমাদরের মধ্যে সান্ত্বনা দিতে পেরেছিল। যুক্তির মধ্যে নয়। মনে পড়ছে অতসী বলেছিল—আমি তোমার। একদিনে আমি তোমার

হয়ে গিয়েছি। তুমি কাঁদলে আমি কি করব বল? আমি যে তোমার চোখের জলে ভেসে যাব। না—মুখ তোল—তুমি হাস। দেখ সংসারে এটা হয়তো পাপ। কিন্তু আজ থেকে আমি যদি আর অন্য পুরুষকে না ভজি আর তুমি যদি আর কোন মেয়েকে ভালো না বাসো তাহলে? তাহলে পাপ কেন হবে বলো? আমি তোমাকে কথা দিলাম। তোমার গা ছুঁয়ে বলছি। ভগবানের নাম নিয়ে বলছি। তোমাকে ছাড়া আর আজ থেকে আমি কারুর নই—কারুর নই—কারুর নই। এবার তুমি বলো—আমার গা ছুঁয়ে বলো।

অংশু কথা বলতে পারে নি, হেসে ফেলেছিল।

অতসী বলেছিল—বাবাঃ, তোমার মুখে হাসি দেখে বুকে আমার জল নামল। আমি যেন ডুবে মরতে বসেছিলাম। তুমি আমার নাগর—আমার বর। আমার সর্বস্ব।

সেখান থেকে বেরিয়ে দুজনে কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটে এসে ছাড়াছাড়ির মুখে অতসী বলেছিল—আজ ঠিক সন্ধ্যের সময় আসবে। আমি তোমার পথ চেয়ে থাকব। হ্যাঁ? না এলে আমি কিন্তু তোমার বাসা পর্যন্ত যাব।

অংশু কথাবার্তার মধ্যে বলে ফেলেছিল নিজের ঠিকানা।

* * *

অনুতাপ এবং অনুশোচনার মধ্যেই সে বাসায় ফিরেছিল এবং অনায়াসে মিথ্যে কথা বলেছিল মেসো ও মাসীকে; ওই শিবকিংকরেরই নাম করে বলেছিল—পথে শিবকিংকরদার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। আমাদের গ্রামের কবিরাজমশায়দের বাড়ির ছেলে। ব্যবসা করে—বি. এ. পাস। জোর করে ধরে নিয়ে গেল ওদের বাসায়।

মেসো এর জন্যে বিরক্তি প্রকাশ করেন নি, মাসীও না। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট যেখানে গতরাত্রে কোন দাঙ্গা বাধে নি কোন খুন হয় নি কোন বোমা ফাটে নি সেখানে যদি রাত্রে বাড়ি না ফিরে সারা কলকাতার পথে পথেই ঘুরে বেড়িয়ে থাকে তাহলে তাতে কোন দোষ হয় নি। এবং তাঁরা সত্যসত্যই কোন চিন্তা তার জন্য করেন নি।

ঘরের মধ্যে সে ঘুমিয়ে পড়েছিল সেই নটা সাড়ে নটার মধ্যে। এবং গভীর ঘুমে ঘুমিয়ে পড়েছিল। মধ্যে বার চারেক বোধ হয় ঘুম পাতলা হয়ে এলে স্বপ্ন দেখেছিল। একবার মাকে স্বপ্ন দেখেছিল। একবার শিবকিংকরকে। দুবার অতসীকে। শেষবার অতসীকে স্বপ্ন দেখে ঘুমটা তার চোখ থেকে ছেড়েই পালিয়েছিল, সে উঠে বসেছিল তক্তপোশের উপর, আর ঘুমোয় নি। অতসীকেই ভেবেছিল বসে বসে।

অতসী। অতসী। অতসী।

সব অনুশোচনা সব অনুতাপ সব গ্লানি কিভাবে যে কে মুছে দিয়েছিল নিঃশেষে, মনের মধ্যে যে কাঁটাগুলো ফুটে অস্বস্তি ও যন্ত্রণার সৃষ্টি করেছিল সেগুলো যে কে নিপুণ হাতে তার অজ্ঞাতেই টেনে টেনে বের করে নিয়েছিল তা সে জানে না। তবে মন তার কোন উত্তাপ বা কাঁটার ডগার স্পর্শ অনুভব করে নি; মনে মনে অতসীর বাড়ির দিকে পা বাড়াতে, পায়ের নিচে কোন ফুটে-থাকা কাঁটার জন্য তাকে খোঁড়াতে হয় নি। বেলার অগ্রগতির সঙ্গে বুকের মধ্যে একটা উল্লাসের আবেগ জমতে শুরু করেছিল। ঘড়ির কাঁটা যত সামনের দিকে

এগোচ্ছিল তত সে উল্লাস পশ্চিম আকাশের মেঘের মত পরিধিতে বাড়তে লেগেছিল। বেলা তিনটে থেকেই সে একবার শুয়েছে আবার উঠেছে; কিছুক্ষণ বসে থেকেছে; টাইমপিস ঘড়িটার টিক্ টিক্ টিক্ টিক্ শব্দ শুনেছে—আবার শুয়েছে। মনে হয়েছে অনেকক্ষণ শুয়ে থেকেছে বলে ব্যস্ত হয়ে উঠে বসেছে কিন্তু ঘড়িতে দেখেছে সময়টা দশ মিনিটের বেশী নয়। তখন উঠে এসে জানালার ধারে দাঁড়িয়েছে। বাইরের দিকে তাকিয়েই থেকেছে এবং মনে মনে অতসীকে নিয়ে কল্পনার জাল বুনেছে। হঠাৎ ক্লক ঘড়িতে চারটে বাজার শব্দ শুনে তার সে-জাল ছিঁড়েছিল। এবং সে উৎসাহিত হয়ে উঠে সুটকেসটি খুলে বসেছিল। সিল্কের পাঞ্জাবি বের করেছিল—নতুন ফতুয়া বের করেছিল। নতুন ধোয়া ধুতি রুমাল। একশিশি আতরও ছিল তার সুটকেসে। তাদের বাড়িতে তার মায়ের আমলে এই আমিরী স্বদেশীয়ানায় চলতি ছিল; সেখানে খদ্দরের জামা থেকে তসর মুগা সিল্কের জামার চলন ছিল বেশী। সভাসমিতিতে খদ্দর ছাড়া পরতেন না নিরঞ্জন চৌধুরী কিন্তু অন্যত্র তসরের প্রতি রুচিটা ছিল বেশী। রুমাল সিল্ক ছাড়া ব্যবহার করতেন না। সেন্টও আতর ছাড়া অন্য কিছু না। একশিশি আতর অংশুমানের সুটকেসে ছিল—সেটাও সে বের করে অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করেছিল, কখন সন্ধ্যা হবে। সন্ধ্যা সেদিন তার কাছে যেন অতসীর মূর্তি ধরে উঁকি মেরেছিল তার মনে।

সেদিন তখন ছটা। শ্রাবণ দিনের আলো তখনও ঝলমল করছে প্রায়। আকাশের পশ্চিমদিকে মেঘ ছিল। সে আকাশে রঙ ধরি-ধরি করছে। এরই মধ্যে সে কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটের সেই এঁদো গলির মুখে এসে দাঁড়িয়েছিল। রাস্তায় ভিড়ের অন্ত নেই। বাড়িতে বাড়িতে পতাকা—বাড়িতে বাড়িতে যার যেমন সাধ্য সজ্জা আলোয় ফুলে পাতায়। লোকেরাও তাই। উল্লাসে উচ্ছ্বসিত; অপ্রীতি নেই বিদ্বেষ নেই—কোথাও রাগারাগি নেই। কিন্তু গ্লানি কলুষ অন্ধকার অপবিত্রতা ছিল আশ্চর্য ভাবে সমান পরিমাণে, সমান ওজনে। হঠাৎ সেটা চোখে পড়েছিল তার। অতসী বাড়ির ভেতর থেকেই তার আগমনবার্তা জেনেছিল। সে একবার উঁকি মেরে দেখা দিয়ে একটু হেসে ইশারায় তাকে অপেক্ষা করতে বলেই বের-করা মুখ ঢুকিয়ে নিয়েছিল। প্রায় আধঘণ্টা পর সে প্রসাধন সাজসজ্জা সেরে বেরিয়ে এসেছিল।

অংশুমানের বুকের স্পন্দন বাড়তে শুরু করেছিল। আগের দিন সেটা হয় নি। সেদিন হয়েছিল। চলতে চলতে যেন হাঁপ ধরছিল—গলা শুকুচ্ছিল। অতসী হেসে তাকে বলেছিল—দেখ তো, স্বর্ণমৃগী বলে মনে হচ্ছে কি না? সোনার হরিণী—মনো-হারি-ণী! শেষের কথা কয়েকটা সুর করে বলেছিল।

কথার উত্তর দেবার মত অবস্থা ছিল না অংশুমানের।

অতসী প্রশ্ন করেছিল—কি হল তোমার?

তার হাতখানা চেপে ধরেছিল নিজের হাতের মুঠোর মধ্যে এবং সঙ্গে সঙ্গে তার মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছিল—বাপরে! হাত যেন জ্বলছে।

অতসীর গোপন বাসকক্ষ যে বাড়িটায় সে বাড়িটা আগের দিন প্রায় স্তব্ধ ছিল। কিন্তু সেদিন ঘুঙুরের আওয়াজে যন্ত্রসঙ্গীতের কণ্ঠসঙ্গীতের সুরে সুরে স্খলিত কণ্ঠের কথাবার্তায়

আর এক চেহারা নিয়েছে। অংশুমান একটু চকিত চঞ্চল এবং কিছুটা শঙ্কিত হয়ে অতসীর মুখের দিকে তাকিয়েছিল। অতসী হেসে বলেছিল—ওদের সব অষ্টপ্রহর চব্বিশপ্রহরের আসর পড়েছে। এখানে সব বাঁধা বাবুদের আসর। দেশ স্বাধীন হল, ওরা আসর পেতেছে। এ বাড়িতে হল্লা খুব হয় না। আজকের মত দিন বলেই এ হচ্ছে। তবে এ বাড়িতে পুলিস ঢুকবার হুকুম নেই। মাসে মাসে থানার বাঁধা টাকা পাওনা আছে। আগাম আগাম নিয়ে যায়।

তালা খুলে ঘরে ঢুকে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলেছিল—সারাটা দিন যেন আর যেতে চায় না। মা বলে তোর হল কি? কি আর বলি বল? "রাধার কি হইল অন্তরে ব্যথা।" সে বোঝে কে?

অংশুমান তখন বোবা।

জীবন তখন শুধুই জীবন, সেই আদিম জীবন, তার বেশী কিছু নয়। যার শুধু গ্রাসই আছে আর কিছু নেই। তার হাত-পা কাঁপতে চাচ্ছিল। মধ্যে মধ্যে কেঁপে উঠছিল। তবু অধীর হয়ে উঠছিল মুহূর্তে মুহূর্তে।

সেদিন আটটার সময়েই অতসী তাকে ছুটি দিয়েছিল। বলেছিল—আজ কিন্তু হে আমার নবীন নটবর, এর মেয়ে নয়া পিয়ার, মেরে মজনু, বাঁদীকে ছুটি দেনেকো হুকুম হোয় যায়। ছুটি দিতে হবে আজ। বুঝেছ? কখন যে শিবকিংকর আসবে তার ঠিক নেই। সে যে এখনও কেন আসে নি তা বুঝতে পারছি না।

ছুটি দিতে অংশুমানের ইচ্ছে ছিল না। অংশুমানের বুকে একটা প্রতিক্রিয়ার আঘাত লেগেছিল, মধ্যে মধ্যে তাকে সংকুচিত করছিল তার নিজের কাছেই। প্রশ্নও করছিল—কি করছি আমি? উত্তরে প্রতিবাদ করবার মত কণ্ঠস্বরও ছিল না ভাষাও ছিল না। কিন্তু একটা লোলুপতা তাকে শিকার-ধরা বাঘের মত করে রেখেছিল। তবু অতসীর কথা সে মেনে নিয়ে ফিরে এসেছিল ন'টার মধ্যে।

ফিরবার পথে সিগারেট খেয়ে নিজেকে ঘায়েল করেছিল সে কথা মনে আছে। সে সিগারেট খায় না শুনে অতসী বলেছিল—না খেয়ো না। সিগারেট ভাল নয়। খবরদার। তাহলে ঝগড়া করব। অতসীর তুমি বয়সে-ছোট বর। বুঝলে।

পথে বেরিয়ে সেদিন সে সিগারেট খেয়ে সত্যিকারের যুবক হতে চেয়েছিল। সিগারেট খেয়ে এমন কেশেছিল যে অতসীর ঘরে যা খেয়েছিল সব বমি হয়ে উঠে গিয়েছিল—তার সঙ্গে মাথাটা কেমন যেন হঠাৎ ধরে উঠেছিল। মেসোর বাসা উত্তর কলকাতায় গ্রে স্ট্রীটের একটা গলিতে। বিডন স্ট্রীট থেকে পথ সামান্যই কিন্তু এই সামান্য পথটুকু হাঁটতে অত্যন্ত কষ্ট হয়েছিল তার। কোনরকমে বাড়ি পৌঁছে সে চুপি চুপি নিজের ঘরটায় ঢুকে পড়ে শুয়ে পড়েছিল। মেসো-মাসীর সামনে যায় নি; ভয় হয়েছিল হয়তো সিগারেটের গন্ধ পেয়ে যাবেন তাঁরা। চাকরটাকে বলে দিয়েছিল—দেখ শরীরটা আমার খারাপ মনে হচ্ছে। আমি শুয়ে পড়ছি। খাব না কিছু। আমায় যেন না ডাকে। বুঝলি?

ঘুমিয়ে পড়তে দেরি হয় নি। অতসীকে নিয়ে বিচিত্র কল্পনা করতে করতে অল্পক্ষণের মধ্যেই কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল। মনের সংকল্প তখন তার স্থির হয়ে গেছে। অতসী তার থেকে বয়সে বড়, বাধ্য হয়ে সে সংসারকে বাঁচাবার জন্য এ পথে নেমেছে; তা নামুক। সে তাকে বর বলেছে। বলেছে এরপর সে আর এ পথে পা দেবে না। তাকে স্বামী বলে গ্রহণ করবে। সেও তাকে স্ত্রী বলে গ্রহণ করেছে। হ্যাঁ, অতসীই তার স্ত্রী। নাইবা হল মন্ত্র পড়ে বিয়ে। নাইবা থাকল সামনে শালগ্রাম শিলা। তার থেকে তাদের এ বন্ধন আরও দৃঢ়, আরও পবিত্র। একটা বাসা ভাড়া করবে। সেখানে সে রাখবে অতসীকে। সে আর অতসী। যতদিন সে পড়বে ততদিন অতসীর অজ্ঞাতবাস। তারপর সে—

ওঃ! সে কত আকাশকুসুম রচনা করেছিল মনে মনে! একদিন সে স্বাধীন ভাবে দাঁড়াবে নিজের পায়ের উপর। সে বিখ্যাত ব্যক্তি হবে। একজন বিরাট বড় রাজকর্মচারী—I. A. S. না। সে হবে একজন বিখ্যাত নেতা। পণ্ডিত জওহরলালের পরবর্তী কালের নেতা। হঠাৎ মনে পড়ে গিয়েছিল নেতাজী সুভাষচন্দ্রকে। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে তার হঠাৎ দেখা হবে। সেই তাঁকে ঠিক চিনবে। এবং বলবে—নেতাজী! নেতাজী বলবেন—চুপ করো। আমাকে সাহায্য করো। নেতাজী প্রতিষ্ঠিত হবেন—ভারতবর্ষ উথলে উঠবে। নেতাজীর পি-এ হবে সে। সে অতসীকে নিয়ে নেতাজীর সামনে নতজানু হয়ে বসবে—

ঘুমিয়ে পড়েছিল এইখানেই।

হঠাৎ তাকে ডেকে তুলেছিল। ডেকে তুলেছিল তাদের দেবগ্রাম বাড়ির একজন গোমস্তা। —ছোটবাবু! ছোটবাবু! ছোটবাবু!

ঘুম ভেঙে উঠে বসে সে বলেছিল—কে? কি?

বিরক্তির আর সীমা ছিল না তার।

গোমস্তা প্রাণকৃষ্ণ চট্টরাজ বলেছিল—আপনাকে বাড়ি যেতে হবে ছোটবাবু। বাবার খুব অসুখ!

—বাবার অসুখ!

—হ্যাঁ। খুব অসুখ। অজ্ঞান হয়ে গিয়েছেন। আমি ওষুধ নিতে এসেছি আর আপনাকে নিতে এসেছি।

* * *

নিরঞ্জন চৌধুরী ১৪ই আগস্ট সারাদিন উদ্যোগ আয়োজন করেছেন স্বাধীনতা দিবসের। মধ্যরাত্রি অর্থাৎ ১৫ই আগস্টের শঙ্খধ্বনির সময় থেকে শুধু চীৎকার করেছেন। চীৎকার করে অতীতকালের ঘটনা বলে গেছেন। হঠাৎ সেই সময় তাঁর প্রথম মনে হয়েছিল ১৯২১ সাল থেকে স্বাধীনতা আন্দোলনের কোন্ কাজটি এবং কোন্ ঘটনাটি কোথায় ঘটেছিল সেই স্থানগুলি চিহ্নিত করবেন। বাথারির মাথায় কাগজের বোর্ড এঁটে লিখে দেবেন—১৯২৪ সালের ১২ই পৌষ এই ঘরে প্রথম কংগ্রেস কমিটির উদ্বোধন হয়। সভাপতি নিরঞ্জন চৌধুরী। ১৯২৫ সালে এই গাছতলায় প্রথম জনসভা হয়—ভাষণ দেন বিখ্যাত নেতা ৺জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। গ্রামের ভিতরে কোথাও সভা করিতে দেওয়া হয় নাই। ১৯৩০ সালে

রথযাত্রার দিন এইখানে সভাপতি নিরঞ্জন চৌধুরী ১৪৪ ধারা অমান্য করিয়া গ্রেফতার হন।

সারারাত্রি পরিশ্রম করে এই ঐতিহাসিক ঘটনাবিন্যাস শেষ করে সকালবেলা কংগ্রেস প্রাঙ্গণে জাতীয় পতাকা তুলে থানায় পতাকা তুলবার কথা ছিল। কিন্তু কংগ্রেস প্রাঙ্গণে পতাকা তুলেই তিনি ক্লান্ত হয়ে বসে পড়েন চেয়ারে—তারপর অজ্ঞান হয়ে যান। ধরাধরি করে বিছানায় শুইয়ে দেওয়া হয়। ডাক্তার আসে। তারপর অনেক ঘটনা।

অংশুমানের মা স্বামীর করণীয় কাজগুলি শেষ করেন—সকলেই এটা চেয়েছিল। তিনিও এটাকে কর্তব্য মনে করেছিলেন। কিন্তু তিনি যখন থানায় পতাকা তুলতে এসেছিলেন সেই সময় নিরঞ্জন চৌধুরীর প্রথমা স্ত্রী এবং তাঁর ছেলেরা রমারঞ্জন আর রাধারঞ্জন ধরাধরি করে তাঁকে নিজেদের মহলে নিয়ে গেছেন।

তাঁর বিছানায় বসে তাঁর সেবা পর্যন্ত করতে দিচ্ছে না অংশুর মাকে। সেবা করছে রমারঞ্জন রাধারঞ্জনের স্ত্রীরা—মাথার শিয়রে বসে আছেন মহামায়া অর্থাৎ রমারঞ্জনদের মা। শোভাকে কেবল ঘরে ঢুকে দাঁড়িয়ে দেখতেই দিচ্ছে। এবং দাঁড়িয়ে থাকলে বলছে—আপনি বাইরের কাজগুলো দেখুন!

অংশুমান একটা প্রচণ্ড আঘাতে যেন অভিভূত হয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ একসময় ঘন গুমোট-ধরা অপরাহ্ণে পশ্চিম আকাশে পুঞ্জ পুঞ্জ ঘন কালো মেঘকে বিদীর্ণ করে বিদ্যুৎ খেলে যাওয়ার মতই একটা প্রশ্ন তার সমস্ত অন্তর মনকে চমকে দিয়ে জেগে উঠেছিল—কেন এমন হল? তার পাপে? অতসী—।

সেদিন সে বুঝতে পারে নি, উত্তর পায় নি। কিন্তু আজ পায়।

অনুশোচনার কিছু নেই। না, কোন অপরাধ তার নেই। লজ্জার কিছু নেই। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে—তাই বা কেন—দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ থেকেই দুনিয়ার সমাজের যাত্রার বা থিয়েটারের সাজানো আসর ভেঙে গেছে। অতীতকালের পৌরাণিক ঐতিহাসিক নাটকের আমল চিরদিনের মত শেষ। গ্রীনরুম থেকে রঙ মুছে সবাই বেরিয়ে এসে খোলা মাঠে ময়দানে নেমেছে। পয়সা বদলে নয়া পয়সা হয়েছে। মানুষের জ্ঞানের রাজ্যে পারমাণবিক বিস্ফোরণ হয়েছে; পারমাণবিক বোমার আঘাতে নাগাসাকি হিরোসিমার মানুষই শুধু মরে নি, সেখানকার সমস্ত প্যাগোডাগুলো এবং ভিতরের দেবতাগুলি ভেঙে গেছে। পৃথিবীতে কালোবাজার নামে নতুন একটা বিরাট বা বিশাল বাজার আপনাআপনি পথের ধারের হাটের মত বসে গেছে। সে-বাজারে যারাই পসরা নামিয়েছে তারাই হাটুরে থেকে হয়ে উঠেছে মহাজন। লক্ষ টাকার দাম পড়ে গেছে, কোটি টাকাটাই এখন প্রায় মুখের কথা। গত মহাযুদ্ধে যখন কালোবাজারের পত্তন হচ্ছে, কারবার শুরু হচ্ছে, তখন হাজার দরুনে মানুষ না খেয়ে এবং অখাদ্য খেয়ে পথের ধারে মরে পড়ে থেকেছে; পচে ঢোল হয়েছে। চোরা-বাজারের আশেপাশে রাত্রির প্রথম প্রহর দ্বিতীয় প্রহরে কালোটাকায় মেয়েরা দেহ বেচেছে। বেচেছে পেটের দায়ে বেশী, কিন্তু যুদ্ধবিভাগের ফৌজী কামার্ততা মেটানোর চাহিদা তার থেকে খুব কম ছিল না। আবার দেহ কেনা-বেচার নেশাও বড় একটা কম নেশা নয়। কারণ যুদ্ধ মিটবার পরও যে এই কারবার ফলাও হয়ে চলেছে, সে এই নেশার ঘোরেই বেশী

চলছে।

আরও আছে। যুদ্ধের পর যুদ্ধ জিতেও সাম্রাজ্যবাদীদের গিলটির জলুস কালের হাওয়ায় কেমিক্যাল অ্যাকশনে গেবে মলিন হয়ে গেছে, আবার ফেটেফুটে চটেও গেছে। পূর্ব ইয়োরোপে, চায়নায় কম্যুনিস্ট বিপ্লব হয়ে গেছে। ইন্দোনেশিয়া স্বাধীন হয়েছে, সেখানেও তখন কম্যুনিজমের ছোঁয়াচ লেগেছিল। বার্মা ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছে। স্বাধীন হবার জন্যে ভারতবর্ষকে ভারত ও পাকিস্তান দুই ভাগে ভাগ হতে হয়েছে। পাকিস্তান থেকে হিন্দু এবং ভারতবর্ষ থেকে মুসলমানেরা পালিয়ে গেছে ভিটেমাটি ছেড়ে। যাবার পথে কিছু মরেছে এবং বাকীরা গিয়ে পৌঁছে স্টেশনের ধারে পড়ে থেকেছে, ক্যাম্পে থেকেছে, ভিক্ষে করেছে, মেয়ে বেচেছে, ছেলে বেচেছে, মরেছে। রাজনৈতিক নেতারা এদের নিয়ে খেলা খেলেছে। ভাঙিয়ে টাকা রোজগার করেছে। ক্যারমের গুটির মত বাপ গেছে এ পকেটে, মা গেছে ও পকেটে, ছেলেমেয়েরা বোর্ডে পড়ে থাকবার মত পড়ে থেকেছে পথেঘাটে।

রাশিয়া অ্যামেরিকা স্পেস-শিপ উড়িয়েছে। রকেটের পর রকেট উঠেছে শূন্যমণ্ডলে। পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরেছে, চাঁদে গিয়ে পৌঁছেছে; অ্যাটম বোমার পর হাইড্রোজেন বোমা তৈরী হচ্ছে। মানুষেরা গরুর গাড়ি ঘোড়ার গাড়ি পার হয়ে রেল মোটরের যুগে এসে দু'দুটো মহাযুদ্ধ লড়া শেষ করে এরোপ্লেনে উড়তে আরম্ভ করেছে। এবং সে স্পীড একশো মাইল থেকে উঠতে উঠতে এখন জেট প্লেনে পাঁচশো মাইলে পৌঁছেছে। আগের কালে সমুদ্রে জাহাজে করে ভাসতে ভাসতে এসেছিল ইয়োরোপের বিদ্যা, ইয়োরোপের ফ্যাশন, তার সঙ্গে বাইবেলের উপদেশ এবং আদর্শ। এখন ওই প্লেনে করে এবেলা ওবেলা এসে পৌঁছচ্ছে ইংল্যাণ্ডের ডেমোক্রেসী, অ্যামেরিকার অ্যামেরিকানিজম, সোসালিজম, কম্যুনিজম—তার সঙ্গে আরও অনেক ইজম। ভারতবর্ষের গান্ধীবাদ অচল হয়েছে, গান্ধীজীকে এদেশের মানুষেরাই গুলি করে মেরেছে। গান্ধীজী গেছেন, রুজভেল্ট গেছেন, উইনস্টন চার্চিল গেছেন, জোসেফ স্টালিনও গেছেন। স্টালিন একবার যান নি দু'দুবার গেছেন, একবার ক্রেমলিন থেকে লেনিনের সমাধিমন্দির, লেনিনের কফিনের পাশেই তাঁর কফিন রাখা হয়েছিল। দ্বিতীয়বারে লেনিনের সমাধিমন্দির থেকে ক্রেমলিনের দেওয়ালের পাশে কবর দেওয়া হয়েছে।

এর মধ্যে কারুর অপরাধ হবার অবকাশ কোথায়। এবং হলে কার আইনে হবে। ঈশ্বর তো মৃত।

অংশুমান বলে—যার চোখ আছে, মন আছে, অনুভূতি আছে সে নিশ্চয় বুঝতে পারে যে গোটা পৃথিবীটিই একটি বিরাট কবরে পরিণত হয়েছে, সে কবরে গোর দেওয়া হয়েছে ঈশ্বরের কবর। ঈশ্বরের মৃতদেহকে সেখানে যুদ্ধের মড়ার সঙ্গে ফেলে মাটি চাপা দিয়ে লিখে দেওয়া হয়েছে—হতভাগ্য অজ্ঞাতপরিচয় ধিক্কৃতদের সমাধি।

এ কথা অংশুমানই বলতে পারে। ঈশ্বরের কবরের উপর দাঁড়িয়ে আছে আজ সবাই—সে পুরোহিত পূজক পাদরী থেকে শুরু থেকে সাধারণ সব মানুষই এবং একটি অস্বস্তি অনুভব করছেও সকলেই, প্রায় সমান অস্বস্তি; কিন্তু বলতে তারা পারে না। বলতে অংশুমানের

মত মানুষই পারে।

বহুনিন্দিত অংশুমান বহুবন্দিত না হোক, অনেক অভিনন্দনও সে পেয়েছে। শিবকিংকর গুপ্ত বলে—হ্যাঁ, হ্যাটস্ অফ তোমাকে অংশুমান। বাবা আমি শিবকিংকর, আমি বহু তরুণ মস্তক চর্বণ করেছি এবং বেমালুম হজম করেছি কিন্তু তোমার মাথায় আমার দাঁতই বসল না! বসা দূরের কথা নড়ে গেল পাটিকে পাটি! এবং চিরজীবনের মত ডিসপেপসিয়া ধরে গেল। শিবকিংকর গুপ্ত তার গ্রামের লোক। সেও এই বিচিত্র যুগের এক বিচিত্র মানুষ। সে মূর্খ নয়—এম. এ. পাস, সে অক্ষম নয়—সক্ষম উপার্জনশীল ব্যবসাদার মানুষ। সে সাহিত্য-রসিক, সে নাট্যরসিক। সে চতুর, সে রাজনীতিবিদ্; এককালে সে ছিল পার্টি সিমপ্যাথাই-জার, এখন হাতেকলমে রাজনীতি করে। যুদ্ধের সময় সে মিলিটারী কণ্ট্রাক্ট নিয়েছিল, মেজর কর্নেলদের সেলাম ঠুকতো। ডালি দিত। বাগানে পার্টি দিত। সেখানে ঘুঙুর পরে নটরাজ নৃত্য নাচত। এবং ফরওয়ার্ড ব্লককে মনে মনে সিমপ্যাথাইজ করত। স্বাধীনতার পর কংগ্রেসী হতে চেয়েছিল কিন্তু তখন কংগ্রেস নেয় নি। অগত্যা একটা লেফটিস্ট পার্টিতে নাম লিখিয়েছিল। এখন কংগ্রেসের দরজা দু'পাট খুলে ধরেছেন ওঁরা। শিবকিংকর সেখানে জাঁকিয়ে বসেছে। শুরু করেছে মণ্ডল কংগ্রেস গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে। ধীরে ধীরে উপরে উঠছে।

শিবকিংকর পারে না শুধু ছবির রাজ্যে মাতব্বরি করতে। শিল্প সে বোঝে না। দাবিও করে না। সাহিত্যে কিন্তু দাবি তার জোরালো; সেও এককালে সাহিত্য করত। জীবনে অংশুমান যখনই এমনই কোন সংকটের মধ্যে প'ড়ে জীবনকে খতাতে বসে তখনই তার মনে পড়ে শিবকিংকরকে। শিবকিংকরের প্রতি কৃতজ্ঞতা তার যত আক্রোশ এবং ঘৃণাও তার তত। শিবকিংকর তাকে মদ খেতে শিখিয়েছে, শিবকিংকর তাকে অতসীর মুখে তুলে দিয়েছিল। নারীদেহের প্রথম আস্বাদন পেয়েছিল সে অতসীর কাছে। তখন বয়স তার পনের বছর। বিচিত্র ব্যাপার—তারিখটা ছিল ১৫ই আগস্ট ১৯৪৭ সাল এবং শিবকিংকর তার বাবার নাটুকে দলেরই একজন সভ্য।

তৃতীয় পর্ব

সে সময় তার মনে হয়েছিল সে গান্ধীজীর কাছে প্রশ্ন করবে। এ কি তার পাপের ফল?

বাবা তার বাঁচেন নি। দু'দিনের দিন অর্থাৎ যেদিন তারা বাড়ি পৌঁছেছিল সেই দিনই তিনি মারা গিয়েছিলেন। তারপর পূর্ণ এক বছর। সে একটা অপব্যয়; তার জীবন থেকে একটা বছর খসে পরে ধুলোমাটির সঙ্গে মিশে গেছে।

বড়মা বড়দা মেজদা সকলে মিলে (ওরা অবশ্য মিলে এক চিরকাল) তার এবং মায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল। সে কুৎসিত একটা কাণ্ড। সেকাল এবং সেকালের বিষয়-কাণ্ড

চিরকালই জটিল এবং কুৎসিত। দেবোত্তরের বিষয় এবং অধিকার নিয়ে সেই প্রথম ঝগড়া লাগল তাদের সঙ্গে। বড়মা বড়দা মেজদা প্রথম নাকি তার মায়ের সঙ্গে বাবার বিবাহটাই অসিদ্ধ প্রমাণ করবে বলে মতলব এঁটেছিল। ঝগড়া লাগল দেবত্রের অধিকার নিয়ে। তার মা এই প্রথম ঠাকুরবাড়িতে ঠাকুরের পূজাঅর্চনায় অংশ নিতে গেলেন। বিষয় ভাগ হচ্ছিল। তার অনেক কৃত্য। সম্পত্তির ফর্দ—তার যাচাই (অর্থাৎ কোথাও কোন সম্পত্তি বাদ পড়ল কি না)—তারপর প্রত্যেকটির দাম নির্ণয়। তারপর তিন ভাগ করা। এই সব চলছিল।

অংশুমানের আর কলেজে যাওয়া হয় নি। তার মেসোমশায়ই তার মাকে বলেছিলেন —না, যখন ভাগ হচ্ছে তখন ও নিজে থাকুক, দেখুক বিষয়সম্পত্তি কোথায় কি আছে—কোন্‌টা কি চিনুক।

এরই মধ্যে একদিন শিবকিংকর এসে অর্থপূর্ণ হাসি হেসে বলেছিল—পড়া ছেড়ে দেবে? কলকাতায় যাবে না? থাকতে পারবে?

অংশুমান একদৃষ্টে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বুঝতে চেষ্টা করেছিল সে কি বলছে। শিবকিংকর বলেছিল—তোমার এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা হল। ভারী দুঃখ করছিল। বলছিল, হয়তো ভুলেই যাবে আমাকে। কি বলব বল তাকে?

অংশুমান ভয় পেয়েছিল কিন্তু সামলে নিয়েছিল—বলেছিল—কিছু না।

অতসীর কথা সে ভোলে নি। নিত্যই প্রায় মনে পড়ত তাকে। মনে পড়াতো তার বড়মা তার বড়দা।

তারা তার মাকে বলত—ওই—ওর পাপেই হল এটা। সব হল ওর জন্যে। দেবতাকে দেবতা বলে নি, গোসাঁই বলে নি, সেদিন ভোরবেলা আমি কাপড় ছেড়ে মন্দিরে দাঁড়িয়ে আছি—মালা গেঁথে রেখেছি, বলেছি সকালে মন্দিরে এসে ঠাকুরকে মালা দিয়ে প্রণাম করে যাবে। আগে ঈশ্বর, তারপর দেশ—স্বাধীনতা। তা না। শুনলাম দেরি হয়ে যাবে বলে ওই নাস্তিক অহিন্দু মেয়েটি তাকে আসতে দেয় নি। দু-তিন মিনিট দেরিতে মহাভারত অশুদ্ধ হত।

তার মাও বোধ হয় এ প্রশ্নে ও প্রসঙ্গে বিচলিত হয়েছিলেন। তিনি শ্রাদ্ধের দিন থেকে মন্দিরে নিয়মিত যেতে শুরু করেছিলেন। প্রথম প্রথম শুধু দ্বিপ্রহরে রুদ্ধদ্বার মন্দিরের সামনে নতজানু হয়ে চোখ বুঁজে বসে থাকতেন। শ্রাদ্ধের কয়েকদিন পরই অংশুমানই এটা আবিষ্কার করেছিল। তারও মনে এমনই একটা প্রশ্ন ঘনিয়ে ঘনিয়ে যেন বাষ্প থেকে বস্তু হয়ে উঠছিল।

অপরাধ কি তার?

অতসী-প্রসঙ্গটা বিচিত্রভাবে তার মনের মধ্যে ঘুরতে আরম্ভ করেছিল তখন। অনুতাপ দিন দিন যত উত্তপ্ত হয়ে উঠছিল ততই তার চিত্ত হয়ে উঠছিল অশান্ত অধীর। সেও সান্ত্বনা খুঁজে বেড়াচ্ছিল। একদিন ঠাকুরবাড়িতে সেও এসেছিল ওই প্রশ্ন রাখতে—"অপরাধ কি আমার? ওই অসতীর জন্যেই কি?" নির্জন দুপুরে এসেছিল ওই প্রশ্ন করতে। এসে দেখলে ঠাকুরঘরের দরজা খুলে সামনে নতজানু হয়ে বসে আছেন তার মা।

তাঁর কটি কথাও তার কানে এসেছিল।—আমার পাপেই এই হল?

সে নিঃশব্দে এসেছিল নিঃশব্দেই চলে গিয়েছিল। কিন্তু সেই দিন থেকেই ঝগড়া বেধেছিল তার মায়ের সঙ্গে বা তাদের সঙ্গে দাদাদের। বড়মা সন্ধ্যেবেলা চীৎকার জুড়ে দিয়েছিলেন—দুপুরে ঠাকুরঘর খুলেছে কেন? ঠাকুর বিশ্রাম করছিলেন। ভাত খেয়ে ভাত-খাওয়া কাপড়ে মন্দিরে ঢুকেছে কেন? যে নাস্তিক যে অবিশ্বাসী সে ঠাকুরঘর খুলবে কেন, ঢুকবে কেন?

মা যুক্তির অবতারণা করে বলেছিলেন—চেঁচিয়ো না দিদি; ঠাকুর কখনও ঘুমোন না, কিংবা ঘুমুলেও জেগে থাকেন। ওঁর নিদ্রাও জাগরণ, জাগরণও নিদ্রা। ভাত-খাওয়া কাপড়কে আমি অশুচি মনে করি না। আর নাস্তিকও আমি নই।

দু'একটা কথার পরই বড়মা ঘোষণা করে দিয়েছিলেন, ঠাকুরবাড়িতে তাদের কোন অধিকার নেই। ঠাকুরবাড়ি দেবোত্তর, তাঁর নিজস্ব। নিরঞ্জন চৌধুরীর প্রথম পক্ষের সংসারের। বরাবর তারাই ভোগ করে আসছে। নাস্তিক শোভা চৌধুরী বা তার পেটের ছেলেকে তারা ঠাকুরবাড়িতে ঢুকতে দেবে না।

সঙ্গে সঙ্গে তার মা ঠাকুরবাড়িতে হুকুমজারি করলেন—ঠাকুরের প্রসাদ ছোটতরফের অর্ধেক (অংশুমানের জ্যাঠামশাইয়ের অংশ বাদ দিয়ে) যথানিয়মে তিন ভাগ হবে। এবং অংশুমানের ভাগ এ বাড়িতে আসবে।

থাক, ঠাকুর-দেবতার প্রসঙ্গ থাক।

ঠাকুর নিয়ে সে মামলার কথা অবান্তর। ঠাকুরে দেবতায় তার বিশ্বাস বা অবিশ্বাস দুইই সমান ঝাপসা। কোনটারই রঙ গাঢ় ছিল না। ওই কাঁচা যতক্ষণ ততক্ষণ একটা রঙ রয়েছে বলে মনে হত। কিন্তু শুকুলেই সাদা হয়ে যেত। রঙও ছিল না, আকার-অবয়বও ছিল না। ক্রমে ক্রমে পড়াশোনার সঙ্গে এবং বেড়ে ওঠার সঙ্গে কাঁচাতে কোন রঙ আর দেখায় না। সম্ভবতঃ একেবারেই উবে গেছে। দুর্গাপূজার উৎসবের মধ্যে উল্লাসের মধ্যে জীবনে একটা পার্বণ আসে কিন্তু কোন দেবতা বা ঈশ্বরের কোন সংস্রবই তাতে নেই। না গন্ধ, না স্পর্শ, না কোন ক্ষীণ শব্দ। তার জন্য তার আপসোসও নেই উল্লাসও নেই। মধ্যে মধ্যে নিষ্ঠুরতম মুহূর্তে ভগবান বা হে ঈশ্বর বলে একটি শব্দকে প্রয়োজন হয়—বুক থেকে আপনি বেরিয়ে আসে—এই পর্যন্ত। তার বেশী কিছু নয়। ঈশ্বর নেই। থাকলেও তিনি অপরাধ নেন না বা অপরাধের জন্য কোন শাস্তি কাউকে দেন না। এটা সে নিশ্চয় করে জেনেছে।

তার মায়ের অপরাধ তো নিশ্চয় ছিল না। তারও ছিল না। না—ছিল না ছিল না। কথাটা তার নিজের মনেই ওঠে এবং নিজের মনেই না না বলে চীৎকার করে ওঠে। অতসীর সঙ্গে তার জীবনের যোগ যেভাবেই দেখুক তাতে তার কিছু আসে যায় না। অতসীর সঙ্গে তার জীবনের তার দেহের যোগ যেদিন হয়েছিল—সেই দিনই তার বাবার মৃত্যু হয়েছিল, এর জন্য দীর্ঘনিশ্বাস তার আজও পড়ে। আজও তার মন বিষণ্ণ হয়—চোখ দুটি যেন আপনাআপনি নেমে আসে এবং অবাঞ্ছিত ঘটনা মনে পড়লে অকারণে মানুষ নিজের অজ্ঞাতসারেও যে চঞ্চলতা প্রকাশ করে সেই চঞ্চলতায় চঞ্চল হয়ে ওঠে। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস

বেরিয়ে আসে, তাকে কিছুতেই রোধ করতে পারে না। মনের মধ্যে যুক্তি তাকে যাই বলুক এবং সে যুক্তি যত সত্যই হোক তাতে ওইটুকুর গতিরোধ হয় না।

হয়তো এইটেই শেষ দুর্বলতা।

হে ভগবান!

এই মুহূর্তে—আজ ১৯৩১ সালের এই সকালবেলাটিতে বাবার মৃত্যুর স্মৃতি থেকে হঠাৎ চোখের সামনে ভেসে উঠল কালকের সন্ধ্যেবেলার স্মৃতি। ভেসে উঠল তার হাতের ভাঁজের ওপর সে তুলে নিয়েছে একটি রক্তাক্তদেহ শিশুকে। অ্যাকসিডেণ্ট হওয়া গাড়ি থেকে সে-ই তাকে বের করেছিল। একটা হাত ছেলেটির ছেঁচে পিষে গিয়ে বীভৎস ভাবে ঝুলছিল। সে-ই তাকে ট্যাক্সিতে সারা রাস্তা সেই হাতের ওপরে শুইয়ে নিয়েই মেডিক্যাল কলেজ পর্যন্ত এসেছিল। সে-ই তাকে এমারজেন্সী ওয়ার্ডে টেবিলের উপর শুইয়ে দিয়েছিল। তার পাশে শুইয়ে দিয়েছিল আহত অচেতন সীতাকে।

ছেলেটির মুখের দিকে সে অনেকবার তাকিয়ে দেখেছিল। সুন্দর ছেলে। সব থেকে চোখে পড়েছিল কপালে বাঁদিক ঘেঁষে চুলের আরম্ভরেখায় একটা ঘূর্ণি। সেটা তারও আছে।

না। তবু তার মনে হয় নি সে সন্তান তার।

মনে হওয়া উচিত ছিল। নিশ্চয় উচিত ছিল।

ভগবানকে সে মানে না। অন্ততঃ মাথা ঘামায় না তাকে নিয়ে। বিপদ থেকে উদ্ধার করতে ডাকে না, প্রার্থনা পূর্ণ করতে ডাকে না; পূজা করব বলেও ডাকে না। মধ্যে মধ্যে রবীন্দ্রনাথের গানের মধ্যে গান গাইবার জন্যেই ডাকে, পূজা নিবেদন করে। সেও নেহাত অর্থহীন ভাবে। কিন্তু আজ সে এই অল্পক্ষণের মধ্যেই আবার ডাকলে। হে ভগবান! এবং বসে বসেই বিছানার বালিশটার উপর মুখ রাখলে।

বেশ কিছুক্ষণ এমনিভাবে মুখ গুঁজে বসেছিল সে। নিজেকে সামলাচ্ছিল। হঠাৎ হরি এসে বললে—শিবকিংকরবাবু আসিল। বাহিরে বসি আছে।

শিবকিংকর? শিবকিংকর গুপ্ত! শিবকিংকরের সঙ্গে আশ্চর্য সম্পর্ক তার। দরিদ্র প্রতিষ্ঠাহীন আত্মীয় যেমন অবাঞ্ছিত হয়েও প্রতিষ্ঠাবান ধনীজনকে ধরে থাকে—বার বার তার পিছনে ফেলে-আসা বাড়ির বংশের ইতিহাসের সঙ্গে তাকে জোর করে যুক্ত করে রাখে, তেমনিভাবেই তাকে ধরে আছে।

সীতাকে সে-ই নিয়ে এসেছিল।

আবার মনে পড়ে গেল অতসীকে। অতসীকে আবার দ্বিতীয়বার তার সামনে নিয়ে এসেছিল এই শিবকিংকর। এবং তারা সারা জীবনের স্রোতকে সে আজকের এই গতিমুখে মোড় ফিরিয়ে দিয়েছিল।

বাবার মৃত্যুর পর তখন তাদের পার্টিশনের কাজ চলেছে। দেবোত্তরের দাবি নিয়ে বাদ-প্রতিবাদ আদালত পর্যন্ত গড়িয়েছে। শেষ পর্যন্ত আদালত গ্রাহ্য করে সালিশ মান্য করা হয়েছে। তাদের জ্যাঠতুত ভাই, বাঁড়ুজ্জেদের শিবদাস ঋষি, গুপ্তদের হরিকিংকর কবিরাজ ডাক্তার এই নিয়ে সালিশী তৈরী হয়েছে। কর্মচারীরা কাগজ তৈরী করছে। সম্পত্তির

তালিকা, দেনাপাওনার তালিকা, দেবোত্তরের ব্যাপারের মীমাংসার যুক্তি তৈরী হচ্ছে। মেসোমশায় হরিচরণবাবুর পরামর্শমত সে কলেজে ফিরে না গিয়ে এই বিষয় ব্যাপার দেখছে এবং বুঝবার চেষ্টা করছে। তার পিছনে আছেন তার মা। মা তখন তার আদালত থেকে নিযুক্ত গার্জেন। তাদের কিছুটা জমিদারি আছে সেই কারণে সে সাবালক বলে গণ্য হবে একুশ বছর বয়সে। মা তার অনেক আগে থেকেই বিষয় ব্যাপার বোঝেন। তিনি পুরো অন্দরবাসিনীও কোন কালেই ছিলেন না। স্বামীর মৃত্যুর পর তখন আরও বেশী করে বেরিয়ে আসতে হয়েছে তাঁকে। নিরঞ্জন চৌধুরীর মৃত্যুর পর তিনিই হয়েছেন দেবগ্রাম কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট; ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের মেম্বর হয়েছিলেন নিরঞ্জন চৌধুরী—সে শূন্য আসনেও তিনি গিয়েছেন। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন। কেউ দাঁড়াতে সাহস করে নি। জেলা কংগ্রেসেরও মেম্বর তিনি। তা ছাড়া তখন চারিদিকে কাজ, চারিদিকে আহ্বান। সে একটা আশ্চর্য সময়—সে সময়ের দিন আলাদা ক্ষণ আলাদা; মানুষ আলাদা মন আলাদা; স্বাধীন ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িক হানাহানি নিষ্ঠুর রক্তপাত রাজনৈতিক 'ঘোর কুটিল দ্বন্দ্বের' মধ্যে ভারত যেন বসে আছে বোধিদ্রুমের তলে, অবিচলিত এবং ধ্যানমগ্নের মত। সমস্ত পৃথিবী তাকিয়ে আছে এই দেশের দিকে। এরই মধ্যে গান্ধীজী খুন হলেন ফ্যানাটিক হিন্দু গডসের হাতে। 'হা-রাম' বলে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। গান্ধীজীর মরজীবন শেষ হল কিন্তু তাঁর অহিংস ভারতের সাধনা যেন অশেষ হয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। দিকে দিকে আহ্বান। সভা, সভা আর সভা। দেবগ্রামের চারিপাশের গ্রাম থেকে তার মায়ের ডাক আসছে। তার মায়ের দু-তিনটে বক্তৃতা তার মুখস্থ হয়ে গেছে। বক্তৃতা তিনটে লিখেছিল সে-ই—মা সংশোধন করে নিয়েছিলেন। ওঃ সে কি প্রদীপ্ত কাল!

আজ তার মনে হয় গান্ধীজীর অহিংসা, গান্ধীজীর জীবনদর্শন, তাঁর রাজনৈতিক চিন্তা ও পন্থার পক্ষে সেই কয়েক মাস বা একটা বছরই ছিল শুক্লপক্ষের পূর্ণ তিথি। তারপরই ক্ষয় হতে লেগেছে। আজ—থাক। আজ গান্ধীজী ছবিতে আছেন। নিতান্ত অসহায়—একান্ত। কি বলবে? করুণার পাত্র বলতে ইচ্ছে করছে। লালবাহাদুর শাস্ত্রীজীর তিরোধানের পর—তাই। সত্যই তাই তিনি। থাক। থাক। আজকের কথা থাক। সেদিন গান্ধীজীর চিতাভস্ম অসংখ্য পাত্রে ভরে সারা ভারতবর্ষে নদীর ঘাটে ঘাটে ভাসিয়ে দিয়ে গান্ধীঘাট তীর্থ সৃষ্টির কাজ চলছে।

বাংলাদেশে প্রধান গান্ধীঘাট তীর্থ হয়েছে ব্যারাকপুরে। এ ছাড়া জেলায় জেলায়, বড় বড় গ্রামে, শহরে, যেখানে নদী আছে প্রায় সে সব জায়গায় সর্বত্রই চিতাভস্ম পাঠানো হয়েছে; এবং বিশিষ্ট গান্ধীবাদী বা ব্যক্তিরা সেই পাত্র মাথায় নিয়ে স্থানীয় ঘাটে বিসর্জন দিয়ে স্নান করে তীর্থ সৃষ্টি করেছেন। দেশের লোককে ডাকতে হয় নি। ডাক দেওয়াই ছিল। দিক থেকে দিকে তার প্রতিধ্বনি ক্রমান্বয়ে ধ্বনিত হয়েই চলেছে। হৃদয়ের ডাক—কর্মকর্তাদের সবল ও সচেতন পরিকল্পনার ডাক; বুদ্ধিমান মানুষের সজাগ মনের ডাক, পলিটিক্যাল পার্টির ডাক—থাক থাক। আজ চিত্ত তিক্ত হয়ে গেছে। কিন্তু ভুলতে যে পারছে না। ভোলা যে যায় না। সেদিন ওই গান্ধীজীর প্রভাবে আচ্ছন্ন মন নিয়েই সে শিবকিংকর এবং অতসীর

সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল। সে কি সময়!

মানুষের স্পর্ধা আছে—সে স্পর্ধা জীবন-প্রকৃতিকে ভেঙেচুরে সরিয়ে নড়িয়ে অনেক অদল-বদল করে নিজেকে প্রতিষ্ঠিতও করেছে। জন্তুজানোয়ার পশুদের থেকে সে সম্পূর্ণ পৃথক। সে মানুষ। এমন কি জীবজগতেও সে স্বতন্ত্র বিশেষণ নিয়ে সবার থেকে সরে পৃথক হয়েই দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু মধ্যে মধ্যে যখন সেই স্পর্ধাকে অশেষ ও অসম্ভব করে তুলতে চায় তখন যত ভোগ করে লাঞ্ছনা তত জর্জরিত হয় প্রহারে। এবং তারই ফল হয় এই যে জীবনটাই হয়ে ওঠে অশান্তিতে অসার্থক। এবং জীবনই করে তার প্রতিবাদ।

মনে পড়ছে তার সে কথা। অজয়ের ঘাটে গান্ধীজীর চিতাভস্ম ভাসিয়েছিলেন তার মা। অংশুমান ছিল তার মায়ের পাশেই। ভাইই থাকত তখন। মায়ের ঠিক পাশে পাশে থাকত। শিবকিংকর এবং অতসী যেদিন তার সামনে এল এবং সে তাদের সামনে গিয়ে অসীম স্পর্ধায় তাদের সঙ্গে সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়াল সেদিনও সে তার মায়ের পাশেই দাঁড়িয়েছিল একটি সমারোহের আসরে। ওই গান্ধীঘাটের উপরেই স্মৃতিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠার সমারোহ হচ্ছিল। সুন্দর একটি স্তম্ভ তৈরী করিয়ে তার গোড়ায় একখানি মার্বেল ট্যাবলেট লাগানো হয়েছিল। তাতে লেখা ছিল—"দেবগ্রাম মহাত্মা গান্ধী ঘাট। মহাত্মার আদর্শের উপাসক স্বর্গীয় নিরঞ্জন চৌধুরীর নামে উৎসর্গীকৃত হইল।"

অনুষ্ঠানে সভানেত্রীত্ব করছিলেন তার মা। উদ্বোধন করবার জন্য এসেছিলেন প্রসিদ্ধ গান্ধীপন্থী নেতা, জেলা কংগ্রেসের সভাপতি।

সে মায়ের পাশেই ছিল। সেই স্বাগত সম্ভাষণ জানিয়েছিল। ছাত্রজীবন থেকেই সে লেখে।

অবশ্য বাংলাদেশের ছেলে কে না লেখে। সেও লিখত। তার মা এর জন্য অহংকার করতেন—বাবাও খুশী হতেন। সেদিনের স্বাগত সম্ভাষণ সে লিখেই পড়েছিল। মনে পড়ছে, ভাষণে ভাবাবেগ কিছুটা বেশী থাকলেও ভাষণটি ভালোই হয়েছিল। ভাষণের শেষে হাততালির উল্লাসের মধ্যে সে বুঝতে পেরেছিল যে ভালো হয়েছে তার ভাষণ। বেশ একটু অহংকৃত আত্মতৃপ্তি নিয়ে সে চেয়ারে বসে রুমাল বের করে মুখ মুছছিল। হঠাৎ তার চোখে পড়ল সাজানো শামিয়ানার আসরের পরই যে সব লোকেরা দাঁড়িয়ে আছে তাদেরই প্রথম সারিতে একেবারে তাদের ডায়াসের ডানদিকে হাত কুড়ি দূরে দাঁড়িয়ে আছে শিবকিংকর এবং অতসী। একমুহূর্তে তার সমস্ত শরীরে যেন একটা ঠাণ্ডা প্রবাহ বয়ে গিয়েছিল। পুতুলের মত সে তাদের দিকে তাকিয়ে ছিল একদৃষ্টে। হাতের রুমাল হাতেই ধরা ছিল। মনে পড়ছে, তার মনে হচ্ছিল অতসী যদি এই সভার মধ্যে এগিয়ে এসে বলে—! পরমুহূর্তেই মন বলেছিল—বলে কি? বলবেই! তার দাদারাই তাকে বলাবার জন্য এনেছে। শিবকিংকর তাদের দাদাদের নামে বন্ধু, কাজে এজেন্ট! অতসী এখানকার থিয়েটারে পার্ট করে, সে থিয়েটারের কর্তা তার দাদারাই।

অতসীর মুখে কিন্তু একটি আশ্চর্য হাসি মাখানো ছিল। যে হাসিতে মানুষের মুখ প্রসন্ন দেখায় না সে হাসি নকল হাসি—মেকী হাসি। অতসী অভিনয় করত। কিন্তু তার সেদিনের

হাসি অভিনয়ের নকল হাসি ছিল না সে কথা তার ভয়ার্ত মনও বুঝতে পেরেছিল।

অতসী তখনও তার দিকে মুগ্ধদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল এবং ঠোঁটের হাসিতে প্রসন্নতা যেন শরৎকালের শুক্লপক্ষের জ্যোৎস্নার মত ঝরে পড়ছিল। তবু তার ভয় যায় নি, ধীরে ধীরে সে নিজের জোর সঞ্চয় করেছিল, গান্ধীজীকে স্মরণ করে। বেশ তো সত্যকেই সে—।

তার প্রয়োজন হয় নি। শিবকিংকর ভিড়ের মধ্য দিয়ে দিয়ে তার কাছে এসে পাশে দাঁড়িয়েছিল এবং একসময় তার কানের কাছে মুখ নামিয়ে ফিসফিস করে বলেছিল—ও তোমাকে দেখতে এসেছে। ভয় নেই, কেউ কিছু জানবে না।

* * *

সত্যই তাই। অতসী সত্যসত্যই তাকে দেখতেই এসেছিল। এবং বলতে এসেছিল—তুমি আমাকে মাফ্ করো। হয়তো সেদিন আমাকে ছুঁয়েই তোমার এমন ক্ষতি হল—তোমার বাবা চলে গেলেন সেই রাত্রে।

অংশুমান বলেছিল—না অতসী, ও তুমি মনে করো না। ও মনে করা ভুল। কিছুর জন্যেই কিছু হয় না। বিশেষ করে আমি পাপ করলে আমার মায়ের অনিষ্টও কখনো হতে পারে না। এটা বিংশ শতাব্দী। জান, গান্ধীজীর মত মানুষ এমন ধরনের কথা বলেছিলেন—তাঁকেই কেউ বিশ্বাস করে নি।

হেসে বলেছিল—তাহলে ইংরেজদের মত অধর্ম করে এত বড় জাত তারা হতে পারত না।

সেদিন তার সমস্ত মনকে যে-আলো যে-হাওয়া ব্যাপ্ত করে ছিল তা ছিল রাজনৈতিক ঋতুর আলো-হাওয়া। এ ছাড়া উপমা তার মনে যোগায় নি।

সন্ধ্যার পর শিবকিংকর তাকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল তাদের বাড়িতে। শিবকিংকরের বাড়িতে তার মা আর বিধবা দিদি ছাড়া কেউ ছিল না। অতসী তাদের বাড়িতে আগেও এসে থেকেছে। বন্ধুর বোন বলে পরিচয় ছিল তার। সেই শিবকিংকরের বাড়িতেই কথা হয়েছিল।

অতসী বলেছিল—আমার আর আপসোসের আক্ষেপের শেষ ছিল না অংশু!

থেমে গিয়েছিল একটুক্ষণের জন্য। তারপর বলেছিল—বর বলতে লোভ হচ্ছে কিন্তু বলব না। তোমার থেকে বয়সে আমি মাস কয়েক নয় বছর দু-তিনের বড়। খোকাবর মিথ্যে বলি নি। কিন্তু আর বলব না। নাঃ—তুমি অনেক বড় হবে। আজ সভায় যা সুন্দর বললে তুমি! আর ওই তোমার মা!

চুপ করে বসে ছিল অংশুমান, কথা খুঁজে পাচ্ছিল না। বুকের ভিতর হৃৎপিণ্ড লাফাচ্ছিল, অনেক কথা যেন তোলপাড় পাকিয়ে একটা ঝড়ের মত প্রচণ্ড প্রবল কিছু সৃষ্টি করতে চাচ্ছিল।

শিবকিংকর তাদের কাছেই ছিল অথচ ছিল না। অর্থাৎ ক্রমাগত বাইরে যাচ্ছিল আর আসছিল। কয়েক মুহূর্তের জন্য মধ্যে মধ্যে বসে দুটো চারটে কথা বলে আবার একটা প্রয়োজন খুঁজে নিয়ে বাইরে যাচ্ছিল। কথা বলছিল অতসী একাই।

এই ক'মাসের মধ্যে অনেক ঘটনা ঘটে গেছে। তার মধ্যে প্রধান ঘটনা হল—সে তার

সেই রাত্রির প্রয়োজনে ভাড়া করা ঘরখানা ছেড়ে দিয়েছে। শুধু ঘরখানাই নয় তার সঙ্গে জীবনের সকল সংস্পর্শ ছোঁয়াচও ধুয়ে মুছে ফেলেছে।

—মনে একটা সাধ বাসা বেঁধেছিল তোমাকে নিয়ে। আবার তোমার এই দুর্ভাগ্য ঘটল বলে আক্ষেপ হল আরও বেশী। সেই আক্ষেপে সব ছেড়ে দিলাম। জান, রোজ গঙ্গাস্নান করেছি। এই লোকটিকেও তাড়িয়ে দিয়েছি। বলেছি, আর আমার ছায়া মাড়াবে না। ছাড়তে পারি নি কেবল অভিনয়। ওটা ছাড়লে ভাইবোনদের পড়া বন্ধ হত। সংসার উপোস যেত। অ্যামেচার ছেড়ে পাবলিক থিয়েটারে চাকরি পেয়েছিলাম। সেখান থেকে চান্স পেলাম ফিল্মে। সেকেণ্ড হিরোইনের পার্ট পেয়েছি একখানা বইয়ে। নিঃশ্বাস ফেলে বেঁচেছি কিন্তু মনের মধ্যে অহরহ অশান্তি ছিল তোমার জন্যে। এই লোকটি—;

শিবকিংকরকে দেখিয়ে বলেছিল—এই লোকটিকে আমি ছেড়েছিলাম, সেও অন্যখানে বাসা বেঁধেছিল কিন্তু আমাকে ছাড়ে নি। মানে নিয়মিত থিয়েটারে আসত, বকবক করত। আর তোমার কথা বলত। মন্দ বলত না—ভালোই বলত।

হেসে অতসী বলেছিল—বলত কি জান। অংশু একদিন লীডার হয়ে যাবে। ভারী ভালো ছেলে। ওর অনিষ্ট করা আমাদের উচিত হয় নি। তোমার বক্তৃতা করার কথা বলত—তোমার সাহসের কথা বলত। তোমাদের এখানে নাকি হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গার সময় তুমি মুসলমানদের বাঁচাবার জন্যে যে সাহস দেখিয়েছিলে তার তুলনা হয় না। আরও কত কথা। শুনে শুনে সাধ হত একবার তোমাকে দেখে বলে আসব আমি তোমার অনিষ্ট করেছি, তুমি আমাকে ক্ষমা কর। এই দিন পনের আগে ওর কাছে হেরে গেলাম। ওকে বিয়ে করব বলে মন বাঁধলাম। কথা পাকা হয়ে গেল। হঠাৎ কাল এসে বললে, অতসী, যাবে দেবগ্রামে অংশুকে দেখতে? যাব যাব বলো। যাবে তো চলো। দেবগ্রামে অংশুর বাবার নামে অজয়ের ঘাটে স্মৃতিস্তম্ভ উদ্বোধন হবে। অংশুর চেহারাটা দেখতে পাবে। বললাম—যাব। চলে এলাম।

কথা শেষ করে সে হাসিমুখে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকেছিল। অংশুমান নিজেও তার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল নির্নিমেষ দৃষ্টিতে। মনের মধ্যে যেন একটা আবেগ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছিল। মনে হচ্ছিল গল্পে উপন্যাসে কাব্যে পুরাণে অতসীর মত মেয়ে বোধ করি হয় নি। সে অতুলনীয়া, সে অপরূপা।

হ্যাঁ, তার রূপেরও তুলনা ছিল না বলেই সে-দিন তার মনের ভিতর থেকে তার অন্তরাত্মা বলতে চাচ্ছিল—না—না না। অতসীকে ছেড়ে দিতে আমি পারব না। পারব না।

ঠিক তারই পাশাপাশি আরও একটা আবেগ ঝড়ের সঙ্গে নদীর বুকের মত বনের মাথার মত আন্দোলিত হচ্ছিল। সে-আবেগ অংশুমানের সেই ১৯৪৮।৪৯ সালের আদর্শবাদের আবেগ। সেদিন এমন করে নিজেকে পৃথক্ পৃথক্ ভাগ করে দেখতে পারে নি। সেদিন দুটো মিশে একটা হয়ে গিয়েছিল। ষোল-সতের বছরের অংশুমানের তরুণ চিত্তকে শুধু অতসীর আকর্ষণই আকৃষ্ট করে নি—সে আকর্ষণকে আরও প্রবল করে তুলেছিল তার সেদিনের সত্যনিষ্ঠার আদর্শ।

মানুষের মন চিরদিনই সত্যনিষ্ঠ। সত্যনিষ্ঠ তো নয়, সত্যকে প্রকাশ করাই তো স্বাভাবিক —উচিত। প্রকাশ করে না কেবল লজ্জার জন্যে সংকোচের জন্যে; অপরাধবোধের জন্যে। মানুষের চালাকির প্রথম শিক্ষা হয়েছে মিথ্যে কথা বলতে শেখার মধ্যে।

এই দুর্বলতাকে জয় করে মানুষ আবার যেদিন অবশ্যম্ভাবিত্বকে মাথা পেতে নিয়েও মিথ্যার পরিবর্তে নির্ভয়ে সত্যকেই প্রকাশ করে তখনই মানুষের হয় চরম জয়। এ জয়ের চেয়ে বড় জয় আর হয় না। মানুষ এর জন্যে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়েও মরে না, সর্বস্বান্ত হয়ে সর্বাঙ্গে ধুলো মেখেও রাজার চেয়ে বড় হয়ে ওঠে। এর এক আশ্চর্য শক্তি, বিচিত্র মোহ। সেই শক্তি সেদিন যেন এদেশের আকাশে বাতাসে জলের মধ্যে মিশে ছিল। অংশুমান দেবগ্রামের চৌধুরীবাড়িতে জন্মে মা-বাপের কাছ থেকে এরই দীক্ষা পেয়েছিল। ছেলেবেলায় ছেলেখেলার মধ্যেই এর কিছুটা সাধনাও করেছিল। বন্ধুদের কাছে এর জন্য তার অহংকারও ছিল। এবং সেদিন অতসী তাকে ভয় দেখালে এবং শিবকিংকর তাকে ব্ল্যাকমেল করতে চাইলে সে কি করত তা আজ বলতে পারে না তবে তারা দুজনেই যখন তাকে দেবতা বানিয়ে প্রশংসা করে তাকে মুক্তি দিতে চাইলে তখন সে চমকে উঠে সরে এসেছিল। কারণ মনে হয়েছিল তাকে ছোট করে অতসী শিবকিংকরই বড় হয়ে গেল। তাই বা কেন, নিজের কাছেও নিজে সে ছোট হয়ে যাচ্ছিল।

সে বলেছিল—না।

অতসী চমকে উঠে বলেছিল—কি না?

—এ হয় না।

—অংশু!

—না। তোমাকেই আমি বিয়ে করব।

শিবকিংকর বলেছিল—চুপ কর অংশু চুপ কর!

—না। চুপ করতে আমি পারব না শিবকিংকরদা!

* * *

"একটা ইমোশনাল ফু—ল।"

কথাটা বলেছিলেন তার মেসোমশাই হরিচরণবাবু উকীল।—"এর কোন মানে হয়, না মাথামুণ্ড আছে? এঁচোড়পাকা ফাজিল ছেলে—এ প্রিকসাস চাইল্ড! তার থেকে বয়সে পাঁচ-ছ' বছরের বড় একটা ফলেন গার্ল, তাকে বিয়ে করবে! আবদার!"

অংশুমান সত্যসত্যই অবিশ্বাস্য কাণ্ডটা করে বসেছিল। সে সেইদিন রাত্রেই গ্রাম থেকে কলকাতা চলে এসেছিল। এবং কলকাতা থেকে দীর্ঘ চিঠিতে আগাগোড়া সমস্ত কথা প্রকাশ করে তার মাকে লিখেছিল, আমি এই অসতীকেই বিবাহ করতে চাই। তাকে আমি ভালবাসি এ কথাও সত্য এবং লোভের বা মোহের বা যদি ভ্রান্তিই হয় সেই ভ্রান্তির মধ্যে যা ঘটে গেছে তারপর তাকে বিয়ে করা ছাড়া আমার আর অন্য পথ নাই।

কলকাতায় এসে এবার আর সে মেসোমশায়ের বাড়িতে ওঠে নি। এসে উঠেছিল একটি ভালো বোর্ডিং হাউসে। বাড়ি থেকে আসবার সময় তার দু সেট সোনার বোতাম,

গোটা পাঁচেক আংটি, হাতের বিছে তাগা, তার অন্নপ্রাশনে পাওয়া একছড়া হার, পৈতের সময় পাওয়া আর একছড়া হার এবং দশখানা গিনি সঙ্গে নিয়ে এসেছিল। সে নিজের ঘরকে বুঝত—তার নিজের মাকে চিনত এবং জানত যে এর জন্যে তাকে লড়াই দিতে হবে। সে লড়াই সহজ হবে না। বিষয়ী ঘরের ছেলে—বাপের কাছে কাছে ছিল ছেলেবেলা থেকে এবং বাপের মৃত্যুর পর বিষয় নিয়ে সৎমা ও সৎভাইদের সঙ্গে পার্টিশনের কাজ হাতে-কলমে করে এসব বিষয়ে অনভিজ্ঞ ছিল না। সে জানত তার সৎভাইরা এবং সৎমা তারস্বরে চীৎকার করবেন—তার জাত গেছে। এ বিষয়ে তার কোন অধিকার থাকতে পারে না। কাজে কিছু হবে না কিন্তু চীৎকার তাঁরা করবেনই। ভয় তার মাকে। তিনি কি করবেন সেটা সে ঠিক অনুমান করতে পারে নি। তার মা গান্ধীবাদিনী একথা সত্য। কিন্তু সত্য বলেই এই সমাজবিদ্রোহী সত্যকে কি তিনি স্বীকার করে নেবেন?

১৯৪৮।৪৯ সালের ঘটনা।

আজ ১৯৪৮ সাল। ১৮।১৯ বছর আগে সেদিন যখন সে তার জিনিসপত্তরগুলো নিয়ে কলকাতা চলে এসে হোটেলে উঠেছিল তখন ওইসব প্রশ্নগুলো সমস্যাগুলো এমন পরিষ্কার বা স্বচ্ছ ছিল না। মনে মনে আশঙ্কার মধ্যে সব কিছুই অনুভব সে করতে পেরেছিল—কিন্তু আজকের মত এমন পরিষ্কার ছিল না মামলার আরজির দাবির পিছনের যুক্তির মত।

আইনও সে পড়েছে বছর তিনেক, কিন্তু পরীক্ষা দেয়নি। জীবনে সাহিত্য এবং নাটক যদি তাকে না পেয়ে বসত তাহলে সম্ভবত সে উকীলই হত।

থাক। উকীল না-হওয়ার জন্য তার আক্ষেপ নেই। গল্পলেখক উপন্যাসকার নাট্যকার হয়ে তার জীবনে একবিন্দু ক্ষোভের কারণও ঘটে নি। কারণ উকীল হলে সে হয়তো সত্যকে এমনভাবে আঁকড়ে ধরে থাকতেও পারত না; যাকে সে সত্য বলে মানে তাকেই সে এমন করে রক্ষা করতেও পারত না।

জীবনে সেদিন সে সত্য থেকে এক পা পিছিয়ে আসে নি।

তার মেসো হরিচরণবাবু উকীলই তার কাছে এসেছিলেন প্রথম দিন। সে বোর্ডিংএ উঠেই চিঠি লিখেছিল তার মাকে। বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছিল। আর একখানা চিঠি লিখেছিল অতসীকে।

অতসী এবং শিবকিংকরকে সে দেবগ্রামে ফেলেই কলকাতা চলে এসেছিল। তারা জানতও না যে, অংশুমান এমন করে কলকাতায় চলে যাবে। তবে ততদিনে, অর্থাৎ সে কলকাতা চলে আসবার পর তারা নিশ্চয় দেবগ্রাম থেকে চলে এসেছে অনুমান করেই অতসীকে তার বাড়ির ঠিকানায় চিঠি লিখেছিল। লিখেছিল—'আমি তোমাকে মুক্তি দিতে পারব না অতসী।'

তখন তরুণ বয়স। সাহিত্যে প্রথম হাতেখড়ির কাল চলছে—অনেক কাব্য করেই সে লিখেছিল—"তোমাকে মুক্তি দিতে গেলে আমার হৃদয়কে বিদীর্ণ করে তোমাকে মুক্তি দিতে

হবে। কারণ আমার হৃদয় এখানে শুক্তি, তার মধ্যে তুমি মুক্তা হয়ে রয়েছ ; কোন দিন একটি বালুকণার মত তুমি হৃদয়ে প্রবেশ করেছিলে—তার যন্ত্রণায় জীবনের রস দিয়ে বালুকণাকে মুক্তা করে তোলার মতই তোমাকে অপরূপা করে আমিই তুলেছি এবং আমার দেহমনের সঙ্গে এক করে নিয়েছি। আমাকে শেষ না করে কি করে তোমাকে মুক্তি দেব ? তা ছাড়া আমার ধর্ম, আমার ন্যায়, আমার সত্য ? তোমাকে জড়িয়ে যে আমার সব দাঁড়িয়ে রয়েছে আজ। তোমাকে মুক্তি দিলে এক-মুহূর্তে যে সব মুখ থুবড়ে ধুলোয় লুটিয়ে পড়বে। আমার সত্য আমার ন্যায় তাসের ঘর নয়। পুরনো কালের সত্য এবং ন্যায়ের মত আধখানা রেখে আধখানা ভাসিয়ে দেওয়া যায় না। আমার সত্য, আমার ন্যায়ধর্ম মহাভারতের কর্ণের মত বীর্যবান এবং সহজাত কবচকুণ্ডলধারী। তাকে ভাসিয়ে দিলেও সে ধনুর্বাণ হাতে নিয়ে ফিরে আসে।" মস্ত বড় চিঠি : এবং খুব দৃপ্ত চিঠি। সে নিজেও সেদিন দৃপ্ত ছিল। আপোস সে কারুর সঙ্গে বা কিছুর সঙ্গে করে নি।

মায়ের সঙ্গেও না।

এই নিয়েই মায়ের সঙ্গে তার চিরদিনের মত বিচ্ছেদ হয়ে গেল। তার মা তেজস্বিনী ছিলেন—তার থেকেও তাঁর জেদ এবং তেজ বেশী ছিল। অংশুমানের সত্যকে তিনি মেনে নিতে পারেন নি। তবে বলেছিলেন—তোমার সত্য তোমার, আমার সত্য আমার। দুয়ের মধ্যে আপোস হতে পারে না।

অতি নিষ্ঠুর কথা বলেছিলেন মা। লিখেছিলেন—একটা অসতী মেয়েকে আমি পুত্রবধূ বলে গ্রহণ করতে পারব না। কোন একটি মেয়েকে কালো বলে তোমার অপছন্দ হলে যেমন তোমার না বলার অধিকার আছে, ঠিক তেমনি অধিকার আমারও আছে বলে আমি মনে করি। এবং সেই অধিকারেই আমি 'না' বলছি। তুমি মহাভারতের সত্যবতীর দৃষ্টান্ত দিয়ে লিখেছ—"দেহগতভাবে অশুদ্ধ হয়েও সত্যবতী ভারতের সম্রাজ্ঞী হয়েছিল ; চন্দ্রবংশের প্রথম রাজা পুরূরবা অপ্সরা উর্বশীকে বিবাহ করেছিলেন, উর্বশীও দেহগতভাবে শুদ্ধ নয়।" উত্তরে আমি জানাই যে, এই দৃষ্টান্ত আমার কাছে আদর্শই নয়। পৃথিবীতে এমন ঘটেছে এবং ঘটে এ কথা আমি মানি। কিন্তু এমনটিই ঘটা উচিত তা আমি কখনই স্বীকার করি না। এবং স্বীকার করব না জানবে।

অংশুমান লিখেছিল—দুর্ভাগ্যের কথা আজ গান্ধীজী আর বেঁচে নেই। থাকলে তিনি আমাকে আমার কৃতকর্মের জন্য তিরস্কার করতেন এ কথা নিশ্চয়, কিন্তু আমার এই সংকল্পকে তিনি সমর্থন করতেন।

মা লিখেছিলেন—তাহলে গান্ধীজীর এ সমর্থন আমি তুচ্ছ করতাম।

থাক। সে বাদানুবাদ দীর্ঘ।

আজও সে-কালের সেই সুদীর্ঘ বাদানুবাদের সমস্ত কথাগুলিই অংশুমানের মনে পড়ল। অন্যায় তার হয়েছিল এ কথা সে আজও মনে করে না। না। তবে হয়তো তার দিকের ন্যায়ের দাবিকে সে বড় বেশী রূঢ়ভাবে প্রকাশ করেছিল। মা তার দুঃখ পেয়েছিলেন। তিনিও তাঁর ন্যায়ের দাবি থেকে একবিন্দু ছেড়ে আসতে রাজী হন নি।

অথচ ন্যায় অন্যায় দাবি এবং জোর যার যা থাক, তাকে উপেক্ষা করে বাস্তব যা ঘটাবার তাই ঘটিয়ে যায়। কথাটা হয়তো ঠিক হল না—দু'পক্ষের ন্যায় অন্যায়ের দাবি এবং জোরের যোগবিয়োগ করে যা ঘটবার সেইটে ঘটে। তারা মা এবং ছেলে দু' পক্ষ যখন নিজের নিজের ন্যায় নিয়ে পরস্পরের মুখদেখাদেখি বন্ধ করলে তখন অতসী এবং শিবকিংকরের বিয়ে হয়ে গেছে। নববিবাহিত অতসী এবং শিবকিংকর একসঙ্গে অংশুর বোর্ডিংয়ে এসে তাকে জানিয়েছিল এবং বলেছিল—দোহাই তোমার, তুমি ক্ষান্ত হও। আর না। এসব আর করে না।

অংশু স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। এমনটা সে ভাবে নি। তবু সে অতসীর প্রতি অনুদার হয় নি। তার বাপের দেওয়া একটা হীরের আংটি ছিল, তার তের বছর বয়সের সময়ের অনামিকার বাপের আংটি সেটা, এখন তার ক'ড়ে আঙুলের মত হয়েছিল, সেইটে খুলে সে অতসীর আঙুলে পরিয়ে দিয়েছিল। এবং বলে দিয়েছিল—তোমাদের প্রীতিভোজে আমি যাব না, মাপ করো। এবং ভবিষ্যতেও সম্পর্ক না রাখলে আমি খুশী হব।

অতসী খানিকটা হেসেও ছিল, খানিকটা জলও সেই সঙ্গে তার দু'চোখ ভরে ছলছল করে উঠেছিল। বলেছিল—বাপরে! এত রাগলে আমি কি করি বল তো? কেমন করে তোমাকে বোঝাব বল তো যে, এ আমি করলাম তোমার ভালোর জন্যেই!

অংশু এসব আর শুনতে চায় নি। বলেছিল—দেখ—দয়া করে তোমরা এখন যদি এস তবে আমি খুশী হব।

তারা দুজনে হাসতে হাসতেই চলে গিয়েছিল। সে হাসির সাড়া এসেছিল বোর্ডিংয়ের সিঁড়িটার বাঁকের ওদিক থেকে। অংশু সেদিন সারাদিন দুরন্ত ক্রোধে যেন কারণে অকারণে ফেটে পড়তে চেয়েছিল।

বোর্ডিংয়ের চাকরটাকে চড় মেরেছিল। ম্যানেজার এবং মালিকের সঙ্গে ঝগড়া করেছিল। একখানা ট্যাক্সি নিয়ে চলে গিয়েছিল ব্যারাকপুর গান্ধীঘাটে। অবশিষ্ট দিনটা সেখানে বসে থেকে রাত্রি আটটার সময় বোর্ডিংয়ে ফিরে দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়েছিল। এবং ঘণ্টা দেড় দুয়েক কেঁদে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল।

পরের দিন সকালের ডাকেই মায়ের লেখা একখানা নিষ্ঠুর চিঠি এসেছিল। তার মধ্যে শিবকিংকর এবং অতসীর তাঁকে লেখা একখানা পত্র ছিল যাতে তারা তাদের বিয়ের কথা জানিয়ে অনুরোধ করেছিল তিনি যেন বালক অংশুমানকে ক্ষমা করেন। মা লিখেছিলেন, পত্রখানা পড়ে দেখো। এই মেয়েকে তুমি বিয়ে করবে বলেছিলে, তার জন্য লজ্জার আমার শেষ ছিল না। আজ কিন্তু মনে হচ্ছে মাথাটা কাটা গেল। কারণ তোমার অহংকার করে ঐ কথা বলার পর মেয়েটা তোমার গালে চুনকালি মাখিয়ে দিয়ে চলে গেল। এখন একমাত্র শর্তে তোমাকে আমি ক্ষমা করতে পারি। এই কথা যখন গ্রামে জানাজানি হয়েছে এবং দেবোত্তর নিয়ে যখন মামলা চলছে তোমার বৈমাত্রেয় দাদাদের সঙ্গে তখন তোমাকে শাস্ত্রমত একটা প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।

সে সেই মুহূর্তেই চিঠিখানার উত্তর লিখে নিজে হাতে ডাকে ফেলে দিয়ে এসেছিল।

লিখেছিল—প্রায়শ্চিত্তে সে বিশ্বাস করে না। ভোজ্য উৎসর্গ করে কাঞ্চনমূল্য দক্ষিণা দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করতে প্রস্তুত নয়। অতসীকে বিবাহ করাই ছিল, তার অপরাধের একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত। তাতে সে প্রস্তুতই ছিল। এবং সে-কথা প্রকাশ্যেই একরকম ঘোষণা করে জানিয়েছিল। কিন্তু অতসী শিবকিংকরকে বিবাহ করেছে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে। সুতরাং তার করণীয় কিছু নেই। যে অপরাধটুকু তার দেহে ও স্মৃতিতে বাল্যকালে চুরি করে খাওয়া পরের বাগানের ফলের পুষ্টির মত রয়ে গেল তা সে নিরুপায় হয়েই জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বহন করবে।

তার উত্তরে তার মা লিখেছিলেন—তোমার সহিত পত্রালাপেও শরীর মন অশুচি হয়ে ওঠে আমার। এর পর আর কোন পত্র তুমি আমাকে লিখো না। এবং এই বাড়ি এবং আমার সঙ্গে তোমার কোন সম্পর্ক আর রইল না এই কথাটি মনে রেখো। অতঃপর এস্টেট থেকে কোন টাকা তুমি পাবে না।

অংশুমানের মাথার মধ্যে যেন আগুন জ্বলে উঠেছিল। সঙ্গে সঙ্গেই সে পত্রখানার জবাব লিখে ফেলেছিল। বিষয়ী ঘরের ছেলে—সেই শৈশব থেকে এই সতের বছর বয়স পর্যন্ত সে বাপের কাছ থেকে শুধু দেশসেবা করতেই শেখে নি, তাঁর বিষয়কর্ম করা দেখে বিষয়কর্ম আইনকানুনও শিখেছে; বিষয়কর্ম করতে সে পারে, বৈষয়িক আইনকানুনও সে বোঝে; ইদানীং সম্পত্তি পার্টিশন নিয়ে হাতে-কলমে কাজ করে সে বোধ তার আরও ধারালো এবং স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। মায়ের চিঠির উত্তরে সে একেবারে আইনসম্মত পত্রলিখন-ভঙ্গিতে লিখেছিল—"আপনি আমার গর্ভধারিণী, আমার পিতৃদেব ৺নিরঞ্জন চৌধুরী মহাশয়ের পরলোকগমনের পর আমি বয়সে নাবালক থাকায় আপনি স্বাভাবিক অভিভাবিকা হিসাবে আদালত হইতে আমার (অর্থাৎ শ্রীঅংশুমান চৌধুরীর) গার্জেন নিযুক্ত হইয়াছেন। এবং সেই অধিকারে আমার অংশের এস্টেট পরিচালনা করিতেছেন। আদালতের কাছে আমার অভিভাবকত্ব গ্রহণের সময় এস্টেটের যাবতীয় আয়ব্যয়ের হিসাব রাখিতে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। তাহার সঙ্গে এ প্রতিশ্রুতিও আছে যে আমার জীবনে উচ্চশিক্ষার জন্য আমার ব্যয়ভার নির্বাহের জন্য আপনি প্রয়োজন হইলে সম্পত্তি বিক্রয়ও করিতে পারিবেন। অর্থাৎ আমার জন্যই সব হইবে। আমাকে বাদ দিয়া কোন ব্যয় করিবার আপনার অধিকার নাই। করিলে পরে ইহার জন্য আপনাকে দায়ী হইতে হইবে। আপনি আমাকে…সালের… তারিখের পত্রে লিখিয়াছেন 'এই বাড়ি এবং আমার সঙ্গে তোমার কোন সম্পর্ক রহিল না।…অতঃপর এই এস্টেট হইতে কোন টাকা তুমি পাইবে না।' ইহার উত্তরে আমি জানাই যে আমার সহিত কোন সম্পর্ক না থাকিলে বা না রাখিলে আপনি আমার গার্জেন থাকিতে পারেন না। আমার পিতার পরলোকগমনের মুহূর্ত হইতেই আমি আমার পিতার সম্পত্তির এক-তৃতীয় অংশের (আমরা পিতার তিন পুত্র হিসাবে) আমি মালিক হইয়াছি। কোনক্রমেই সেই অধিকার হইতে আমাকে কেহ বঞ্চিত করিতে পারে না।"

* * *

দেবগ্রাম থেকে খুব বেশী দূরে নয়, মাইল কয়েক পশ্চিমে অজয়ের ধারেই, দুর্গাপুর

ফরেস্টের মধ্যে যুদ্ধের সময় তৈরী মিলিটারী বেসের খানিকটা অংশ ছিল। পানাগড় থেকে পশ্চিমে অণ্ডাল উখরা এবং উত্তরে পানাগড় ইলামবাজার রোডের পশ্চিম গায়ে গায়ে অজয়ের তীরে শ্যামরূপার গড় পর্যন্ত বিস্তৃত মিলিটারী বেসটা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ভারতবর্ষের সেকেণ্ড ফ্রণ্ট হিসাবে তৈরী হয়েছিল। এর কিছুটা পানাগড়ে আজও আছে। মিলিটারী বেস হিসেবেই আছে।

এইখানে অংশুমান একটা বিস্ফোরণ দেখেছিল।

আতসবাজির বিস্ফোরণ নয়। বোমবাজির শব্দ সে নয়—হাউই চরকির ফুলঝুরি বা রঙমশালের রঙিন আলোর উচ্ছ্বাস সে নয়। সে বিস্ফোরণ বিচিত্র, বিস্ময়কর, ভয়াবহ।

১৯৪৭ সালের মার্চ মাস তখন। বর্ষার পরে শরতের রোদের মত স্বাধীনতার আগমনী হাওয়া এসেছে, রঙ লেগেছে; তার বাবা তখন ছোটখাটো কংগ্রেস নেতা হিসাবে চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। সেদিন ওই ইলামবাজার পানাগড় রোডের ধারেই একখানা মুসলমানপ্রধান গ্রামে সে তার বাবার সঙ্গে গিয়েছিল। গ্রামখানায় একঘর বর্ধিষ্ণু মিয়াসাহেবের বাস। তাঁরই দলিজায় বসে কথাবার্তা হচ্ছিল। সামনে খানিকটা খোলা জায়গার ওপাশে একখানি ভাঙাচোরা গরীবের বাড়ি। সেই বাড়িটা হঠাৎ একটা বিকট শব্দ করেই যেন মাটির উপর আছড়ে পড়ে গেল। তারপর উঠল ধুলো আর ধোঁয়া। সমস্ত জায়গাটা ঢেকে গেল। এর পরই একটা মেয়ে বুক চাপড়াতে চাপড়াতে ছুটে পালিয়ে গেল। বাড়ির মধ্যে চাপা পড়েছিল তার স্বামী এবং দুটো ছেলে। মেয়েটির স্বামী বনের মধ্যে কাঠ ভাঙতে গিয়ে লোহার একটা বেশ বড় রকম বস্তু পেয়েছিল। সেটাকে কুড়িয়ে বাড়ি এনে খুলতে চেষ্টা করেও খুলতে পারি নি। এবং কিছু হয়ও নি। ফেলে রেখেছিল ঘরের এক কোণে। আজ বিকেলে রান্না চড়িয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে মেয়েটির হঠাৎ নজর পড়েছিল সেটার উপর এবং মাথার মধ্যে খেলে গিয়েছিল—উনোনের আগুনে তাতালে কি হয়? তাইই সে করেছিল, উনোনের মধ্যে ফেলে দিয়ে সে গিয়েছিল খিড়কির ঘাটে—ইতিমধ্যে সেটা ফেটেছে। সেটা ছিল একটা সত্যিকারের শক্তিশালী বোমা। স্বামী এবং ছেলে দুটোকে চাপা দিয়ে ঘরটা ভেঙে পড়েছে।

সে বিস্ফোরণের শব্দ, সে ধুলো এবং ধোঁয়ার পুঞ্জের কথা ভুলতে পারবে না অংশুমান। মধ্যে মধ্যে চোখের সামনে সেই দৃশ্যটা অবিকল ভেসে ওঠে।

১৯৬৭ সালের এই সকালবেলাটিতে জীবনের পুরনো কথা মনে হতে হতে হঠাৎ তার মাঝখানে এই শব্দহীন ছবিটি মনের মধ্যে এসে দাঁড়াল।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে অংশুমান।

তার মায়ের সঙ্গে পত্রালাপের কথা মনে হলেই এই বিস্ফোরণের ঘটনাটিই মনে পড়ে। একবার সে উপমা খুঁজতে গিয়ে ওই বিস্ফোরণের ছবিটিকেই মিলিয়ে মিলিয়ে সাজিয়ে নিয়েছিল। অন্য জায়গায় মিল থাক বা না-থাক ওই মেয়েটির ছুটে পালিয়ে যাওয়ার সঙ্গে তার মায়ের সব ছেড়ে দিয়ে চলে যাওয়ার মিলটা খুব ঘনিষ্ঠ। তার মা এখন আশ্রমবাসিনী।

মা তার চিঠির আর উত্তর দেন নি। তিনি আদালতে দরখাস্ত দিয়ে নাবালকের

অভিভাবকত্ব ছেড়ে দিয়ে চলে গিছলেন কাশী। তার সম্পত্তি থেকে কোন মাসোহারাও চান নি।

মা তার আজও বেঁচে আছেন। সেও তাঁর খোঁজ করে না—তিনিও তার কোন খোঁজ রাখেন না। তার সৎভাইদের সঙ্গে তাঁর পত্রালাপ আছে। তার বড়মাও আজকাল তাঁর কাছে গিয়ে থাকেন। তার সঙ্গে বিরোধ হয়ে ওদের সঙ্গে অর্থাৎ সতীন এবং সতীন-পুত্রদের সঙ্গে তাঁর মিল হয়েছে। তাঁর নিজের নামে যে সম্পত্তি আছে সে সম্পত্তি তিনি গৃহদেবতাকেই দিয়ে যাবেন। তার সেবায়েত রমারঞ্জন এবং রাধারঞ্জন, অংশুমান নয়। তার মা নিজে বাদী হয়ে নালিশ করে আদালত থেকে এই ব্যবস্থা বাহাল করে গেছেন। নিরঞ্জন চৌধুরীর সন্তান হিসেবে তাঁর সম্পত্তির একের তিন অংশে অংশুমান চৌধুরীর অধিকারে কেউ কোন কারণেই হস্তক্ষেপ করতে পারে না—এমন কি ওই অতসী নাম্নী এক ভ্রষ্টা অসতীর সঙ্গে সংস্রবদোষের অপরাধ হলেও পারে না, কিন্তু ওই অতসী নাম্নী মেয়েটির সঙ্গে জীবনের সংস্পর্শ-দোষ নিজ মুখে ঘোষণা করেও যে প্রায়শ্চিত্ত করে না দেবতার বা দেবোত্তর সম্পত্তিতে তার কোন অধিকার থাকতে পারে না।

তার মা মূর্তিমতী সে-কাল। যতটুকু পারেন এ-কালের উপর আঘাত হেনে গেছেন—অভিসম্পাত দিয়ে গেছেন। তা যান তিনি, তাতে সে কোনদিন আক্ষেপ করে নি। করবেও না। সে-কাল সর্বদাই সে-কাল, সে সর্বস্বান্ত হয়ে বিগত হবার সময় এমনই করে অনুদার হয়ে অভিসম্পাতই দিয়ে যায় চিরকাল। বিচিত্র! সব দিয়ে যেতে হয় বলে যতটুকু পারে নিজের সঙ্গে নষ্ট করে দিয়ে যায়। যতটুকু পারে বুকে জড়িয়ে ধরে রাখে—তা খুলে নেওয়া যায় না; শেষ পর্যন্ত তা তার মৃতদেহের সঙ্গে হয় পোড়ে নয় কবরে চাপা পড়ে। পরবর্তীকালে প্রত্নতত্ত্বের সামগ্রী হয়। মা তার গেছেন দেবোত্তর সঙ্গে নিয়ে। তিনি তা দিয়ে যাবেন তার সৎদাদাদের। তারাও সে-কাল।

অতসী তাকে ধরে ছেড়ে দিয়েছিল। শিবকিংকরের সঙ্গে—। যাক সে। সে গেছে, তাকে মুক্তি দিয়ে গেছে তার জন্যে তাকে ধন্যবাদ। অতসী সেদিনের পচধরা দূষিত বর্তমান। যে ভবিষ্যতের দিকে অগ্রসর হবে তাকে ধরে তার সঙ্গে চলতে পারবে কেন? পারে নি। তাকে ছেড়ে দিয়ে শিবকিংকরের সঙ্গে চলে গেল।

যাক।

তার সম্মুখের পথ মুক্ত হয়েছিল। আশ্চর্যরূপে পরিষ্কার ছিল সম্মুখের দিগন্ত। আকাশ ছিল নীল নির্মল। সে একা।

চতুর্থ পর্ব

নির্মল নীল আকাশের নিচে একটি আশ্চর্য সুন্দর এবং সমৃদ্ধ পৃথিবী। কত সুখ সেখানে। যত সুখ তত সমৃদ্ধি। উজ্জ্বল পৃথিবী। অফুরন্ত ভাণ্ডার। আনন্দের সংসার। অধীনতার

সংকোচন নেই ; অপরাধের বেড়া নেই ; অবাধ গতিতে মাটিতে জলে আকাশে মানুষ চলবে সামনের পথে।

১৯৪৮ সালের পর ১৯৪৯ সালে আবার সে কলেজে ভর্তি হয়েছিল। ১৯৪৮ সালে সে ইউনিভারসিটি ছেড়েছে। আট বছর এমনই একটি পৃথিবীকে কল্পনা করে সম্মুখের দিগন্তের মুখে নিরন্তর চলেছে।

তার মা তার অভিভাবকত্ব ছেড়ে দিলেন। আদালত থেকে একজন উকীল অভিভাবক নিযুক্ত হবার কথা, কিন্তু বিচিত্র সংসার—তার বড় সৎভাই এগিয়ে এসে তাকে বললেন—আমি গার্জেন হলে তোর আপত্তি হবে ?

অংশুমান অবাক হয়ে গিয়েছিল। বলেছিল—আমার আপত্তি নেই। কেন হবে আপত্তি ? উকীল দেখত না হয় তুমি দেখবে। তুমি উকীলও বটে দাদাও বটে। কিন্তু পরে বিষয় বুঝিয়ে দিতে গোল বাধাবে না তো ?

এক বছরের মধ্যেই বিচিত্র ঘটনা সংস্থানে সারা ভারতবর্ষের সদ্যস্বাধীন মানুষদের মধ্যে নেতাদের বাদ দিয়ে সে-ই বোধ হয় সব থেকে বেশী স্বাধীন হয়ে উঠেছিল।

হয়তো আরও বেশী স্বাধীন সে হতে পারত। যা হওয়া হয়তো তার উচিত ছিল। কিন্তু ততখানি হতে পারে নি। যদি সে দেবগ্রামে ফিরে যেতে পারত এবং গোটা গ্রামের লোকের সামনে কথাগুলির মীমাংসা করতে পারত তাহলেই হয়তো ঠিক হত। কিন্তু ততটা পারে নি। কথাবার্তাগুলি হয়েছিল কলকাতার বোর্ডিং-হাউসে বসে। বোর্ডিংটি ভাল পরিচ্ছন্ন। সিংগল্-সীটেড রুম। আজ ১৯৪৮ সালে যখন চালের দর ষাট টাকা মণ তখন সেদিনের বোর্ডিং চার্জ মনে করতে বিস্ময় জাগছে মনে। বোর্ডিং চার্জ ছিল পঞ্চান্ন-ষাট টাকা। চায়ের কাপের দাম ছিল ছ' পয়সার নিচে। সেই বোর্ডিংয়ের ঘরেই এসেছিলেন তার বড়দা। সঙ্গে বউদিও এসেছিলেন। হিসেবের কথায় বউদি বলেছিলেন—আমি জামিন থাকব ঠাকুরপো। নিশ্চিন্ত থাক—হিসেব তুমি কড়ায় গণ্ডায় বুঝে পাবে।

বউদি কলকাতার মেয়ে এবং ভালঘরের অর্থাৎ অবস্থাপন্ন ঘরের মেয়ে। তাঁর বাবা পাট কয়লা অভ্র নিয়ে ব্যবসা করতেন। বড় ব্যবসাদার ছিলেন। এবং সেই সঙ্গে ছিলেন সেকালের প্রগ্রেসিভ মানুষ। ইংরেজ আমলে রায়সাহেব খেতাবও পেয়েছিলেন। মস্ত বড় সংসার। বউদিরা পাঁচ ভাই ছয় বোন। তিনটির তখন বিয়ে হয়ে গেছে—তিনটি তখনও কুমারী।

বউদির বাবা তখন বুড়ো হয়েছিলেন। তিনটি মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন ; এবং দীর্ঘ ষাট বছরের জীবনে পাট কয়লা অভ্র কেনাবেচা করে সে আমলে একটি সত্য তিনি উপলব্ধি করেছেন ; সেই উপলব্ধি থেকেই তিনিই বড়মেয়েকে বলে কয়ে এ কাজে সেদিন পাঠিয়েছিলেন। সেদিন জানতে পারে নি পরে জেনেছে অংশুমান যে, ভদ্রলোকের দুটি অভিপ্রায় ছিল ; প্রথম অংশুমানের সম্পত্তির অংশ উকীল গার্জেন হিসেবে করতলগত করে বড়জামাই যথেষ্ট লাভবান হতে পারবে। দ্বিতীয় মতলব ছিল আরও নিগূঢ় এবং বিচিত্র। ওই কুমারী তিনটি কন্যার একটিকে এই অংশুমানের জীবনের সঙ্গে বেঁধে দেবেন এই ছিল তাঁর ইচ্ছে।

এককালে তাঁর নিজের যাতায়াত ছিল সোনাগাছি অঞ্চলে। তাঁর বড় দুই ছেলে—তারা তখন ১৯৪৮।৪৯ সালে ময়দান হোটেলে ঘুরত। রিপন স্ট্রীট অঞ্চলে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান পাড়ার সন্ধ্যের সাহেব ছিল।

এদের কাছে শোনা অংশুমানের এই অতসী অধ্যায়ই তাকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে। বউদির বাবা তারিফ করেছিলেন অংশুমান যে চিঠিখানা তার মাকে লিখেছিল সেই চিঠিখানার। এবং বলেছিলেন—শক্ত ছেলে। গড়েপিটে নিতে পারলে হাতিয়ার হবে। তাছাড়া জাত বেটাছেলে। আর আমাদের পালটি ঘর। এ ছেলে অন্ততঃ হাতে রাখ।

তাঁর জীবনে তিনি মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধ সেই পুরনো আমলের ধারাতেই করে আসছেন। মেয়েদের বিয়ের সম্বন্ধ মেয়েদের সাত-আট বছর হতে হতেই ঠিক করে ফেলতেন। জানাশোনা অবস্থাপন্ন পালটি ঘরের ছেলের খোঁজ পেলেই কথা বলে রাখতেন এবং কথায়-বার্তায় চিঠিপত্রে সে কথা জিইয়ে রাখতেন এবং যথাসম্ভব সত্বর মেয়ের বিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতেন।

তাঁর ছেলেরা এত অল্প বয়সে বিয়ে দেওয়ার পক্ষপাতী নয়। মেয়েরা অন্ততঃ ম্যাট্রিক পাস করবে বা ফেল করবে একবার—তারপর বিয়ের পক্ষপাতী। ওদিকে ছেলের গ্র্যাজুয়েট হওয়া দরকার। তবে তারা চাকরে বাপের ছেলে চায়।

অংশুমানের ক্ষেত্রে অংশুমান চাকরে বাপের ছেলে নয় কিন্তু লীডার বাপের ছেলে, এবং এই যে কাণ্ডটি সে করেছে তার দ্বারা কিছুটা সমঝে চলতে পারলে অনায়াসেই সে ভবিষ্যতে লীডার হয়ে যাবে তাতে তাদের সন্দেহ ছিল না। সুতরাং এরা তাতে আপত্তি করে নি, তবে বলেছিল—আরও কিছুদিন যাক—ওর মতিগতি দেখি তারপর এগিয়ে যাওয়ার কথা।

সে-কালের শেষ এবং এ-কালের আরম্ভের সময়ে এইটেই ছিল স্বাভাবিক। হিন্দু কোড বিল, এস্টেট অ্যাকুইজিশন অ্যাক্ট অর্থাৎ জমিদারী উচ্ছেদ বিল তখনও অনেক দূরের কথা, তখনও স্বাধীন ভারতবর্ষের সংবিধানই পাস হয় নি। সে-কালে এই বোনের বড়দিদি হিসেবে তার বউদিদি তার কাছে এসে স্বামীর হয়ে হিসেবের জন্য জামিন থাকতে চেয়েছিলেন অনায়াসে। শুধু নিজে জামিন থাকব বলেই ক্ষান্ত হন নি, বলেছিলেন—শোন ঠাকুরপো হাসি-তামাশার কথা আমি বলছিনে। আমার ছেলেমেয়ের দিব্যি গেলে বলছি তোমার পাইপয়সাটি উনি তোমাকে বুঝিয়ে দেবেন, দেবেন, দেবেন।

তিন বছর পর অংশুমান আই-এ পাস করলে। ভাল ভাবেই পাস করেছিল আই-এ। প্রথম পঁচিশ জনের মধ্যেই ছিল তার প্লেস।

তার মা তখন কাশীতে। দেবোত্তরের মামলা আরম্ভ করেছিলেন তিনি, তিনিই সাক্ষী দিয়ে সেই মামলায় অংশুমানকে সৎভাইদের কাছে হারিয়ে দিয়ে কাশী গিছলেন। সাক্ষী দিয়েছিলেন—তিনি বা তাঁর পুত্র অংশুমান এমন কি তাঁকে বিয়ে করার পর থেকে তাঁর স্বামী স্বর্গীয় নিরঞ্জন চৌধুরীও দেবতায় বিশ্বাস করতেন না। সেই কারণেই তাঁরা মূল বাড়ি থেকে সরে পৃথক বাড়িতে বাস করতেন।

কাশীতে বাস করলেও তার মা সত্যঅর্থে কাশীবাসিনী ছিলেন না। বিশ্বনাথ বিশ্বেশ্বর অন্নপূর্ণা দুর্গা কালী থেকে তাঁর সম্পর্ক নিবিড় এবং গভীর ছিল খাদিমণ্ডলের সঙ্গে, ওয়ার্ধা আশ্রমের সঙ্গে, কস্তুরবা ট্রাস্টের সঙ্গে। কাশীতে বাড়িভাড়া করে থাকতেন কিন্তু ঘুরতেন দিল্লী ওয়ার্ধা প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে। বিনোবাজী জয়প্রকাশ নারায়ণ প্রভৃতি নেতাদের কাছে যেতেন। তেলেঙ্গানা ঘুরেছেন। পাস করার খবর দিয়ে একখানা চিঠি সে মাকে লিখেছিল—তার জবাব পেয়েছিল এক মাস পর। মা লিখেছিলেন—"তোমার পরীক্ষার খবর পেয়ে খুশী হলাম। কিন্তু পরীক্ষায় ভালো ফল করাটাই মনুষ্যত্ব নয়। সত্যকারের মানুষ হলে আমি সুখী হব। আমি দিল্লীতে ছিলাম বলে পত্রের উত্তর দিতে দেরি হল। কাল পাটনা যাচ্ছি—সেখানে সদাকত আশ্রমে কিছুদিন থাকব।"

এ চিঠির আর কোন উত্তর সে দেয় নি। সে তখন স্টুডেন্টস্ মুভমেণ্টে নামবার উদ্যোগ করছে। এবং মা কংগ্রেসে আছেন বলে তাঁর সব আদর্শ বাদ দিয়েছে। সিগারেট ধরেছে। এবং কফি হাউসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে পাঁচ সাত-কাপ করে কফি খাচ্ছে।

এদিকে তিন বছর পর ১৯৫১ সাল সেটা—তার পরীক্ষার ফলের কথা জেনে দেবগ্রাম থেকে তার বউদি এবং দাদা তাকে লিখলেন—একবার গ্রামে এস।

সে গিয়েছিল।

হঠাৎ অত্যন্ত বিষণ্ণ একটুকরো হাসি তার মুখে আজ ফুটে উঠল। একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললে সে।

সেই ষোল বছর আগে ১৯৫১ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে সে বাড়ি গিয়ে পৌঁছেছিল। তার বড়মা সেদিন কেঁদেছিলেন তাকে দেখে। কেঁদেছিলেন তার বাবার জন্যে। বলেছিলেন—"আঃ! সে নেই আজ! কত সাধ আশা তার অংশুকে নিয়ে! আমি সৎমা অংশুর, অংশুর আদর দেখে আমার নিজের ছেলেদের জন্যে দুঃখ হত। সেই অংশু আজ ভালো করে পাস করেছে—আজ সে থাকলে বাড়িতে সমারোহ জুড়ে দিত।"

এক টুকরো প্রক্ষিপ্ত উজ্জ্বল ঘটনা! তারও মনে পড়েছিল তার বাবাকে। শুধু বাবাকে কেন? মাকেও মনে পড়েছিল। মায়ের কোন খবর সে তখনও পায় নি। চিঠিটা সবে কাশী গিয়ে পৌঁছুবার সময় হয়েছে। তবু অভিযোগ গোপনে গোপনে মনের কোণে জমা হয়ে উঠতে ছাড়ে নি।

সমস্ত গ্রামের ছেলেরা তাকে আশ্চর্যভাবে অভিনন্দিত করেছিল। গ্রামে ইস্কুল ছিল, সেই ইস্কুল থেকেই পাস করেছিল সে। বুড়ো হেডমাস্টার পুরনো লোক। তিনি খুব গম্ভীরভাবে বলেছিলেন—I am glad that your result is not bad. অবশ্য আরও ভাল হওয়া উচিত ছিল।

কয়েক মুহূর্ত পরে নিজের কথার প্রতিবাদ করেই বলেছিলেন—Result এতখানি ভাল হবে এও অবশ্য ভাবতে পারি নি।

আবার বলেছিলেন—হ্যাঁ, মন দিয়ে পড়াশোনা কর। Forget everything else.

সেই লোকটার সঙ্গে সম্পর্ক যেন রেখো না। Don't.

অর্থাৎ শিবকিংকরের সঙ্গে।

থাক। শিবকিংবরের কথা থাক। তার সঙ্গে অতসীর কথাও থাক।

না।

অতসীর কথা আসবে। দেবগ্রামে গিয়ে অতসীর কথা ভুলবার উপায় ছিল না। গ্রামের ছেলেদের যে মুগ্ধ অভিনন্দন, সে কেবল ওই অতসীর জন্য। ঠিক অতসীর জন্য নয়, অতসীকে যে মর্যাদা ও সম্মান দিতে চেয়েছিল তারই জন্য। সারা গ্রামটার যেখানে পাকা দেওয়াল বা রাঢ়দেশের বেলেমাটি তুষমাটি করা পোক্ত মাটির দেওয়াল পেয়েছিল তার প্রায় সব জায়গাতেই খড়ি অথবা কাঠকয়লা দিয়ে তারা 'অংশুমান জিন্দাবাদ'—'অংশু অতসী' ধরনের নানান জয়গাথা লিখে ভরিয়ে দিয়েছিল। সুতরাং অতসীর কথা থাক বলে চাপা দিতে গেলেও যাবে না।

অতসীকে কিন্তু সে তখন ঘৃণা করত। তখন অতসী ছবিতে নামছে। পর পর কয়েকটা ছবিতেই সে চান্স পেয়েছিল। প্রথম ছবিখানায় ভাল করেছিল। তার নাম হয়েছিল। একখানা ছবিতে হিরোইনের পার্ট পেয়ে অতসী তখন আকাশে তারা হয়ে ফুটি-ফুটি করছে। মধ্যে মধ্যে সে স্মরণ করত অংশুকে। কিন্তু অংশু সাড়া দিত না। এবং অংশুর জন্যই সে হোস্টেলে যায় নি। কারণ কলেজ হোস্টেলে শিবকিংকর এবং অতসী গেলে ঢেলামারা মৌচাকের মত সারা হোস্টেলটা মুহূর্তে ভনভন করে উঠবার সম্ভাবনা ছিল। তা ছাড়া অংশুমান আশ্চর্যভাবে মনে মনে স্বাধীন হয়ে উঠেছিল, যে স্বাধীনতা তার কলেজ হোস্টেলে কোনমতেই বাঁচানো যেত না। নিত্যই কোন-না-কোন বাধা-নিষেধের গণ্ডী ভেঙে, নীতি নির্দেশ অমান্য করে সে স্বাধীনতাকে সম্প্রসারিত এবং অধিকতর প্রগল্‌ভ করবার চেষ্টা করত। কিন্তু তা বলে সে সস্তা কিছু করে নিজেকে খেলো করে নি। মোট কথা যে-অংশুমান সারা বাল্য কৈশোর মা ও বাবার স্নেহের মধ্যে গভীর বিশ্বাসে সত্যকে প্রকাশ করতে চেয়েছিল সে সেই সত্যের নির্দেশেই তার একদিনের ওই পদস্খলনের ঘটনাটিকে বা প্রাপ্তিকে নেহাত প্রক্ষিপ্ত একটি আকস্মিক ঘটনা বলে মনে করে নি; মনে করে নি এটা জীবনে এমনি একটা কিছুর সংস্পর্শ যেটাকে এক আঁজলা জল দিয়ে ধুয়ে মুছে দেওয়া যায়। তা মনে করে নি বা করতে পারে নি বলেই সে তাকে এবং ঘটনাটিকে সত্যের মর্যাদা দিতে চেয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে নিজেও আদর্শবাদের চরমে পৌঁছুতে চেয়েছিল এদেশের পদস্খলিতা মেয়ে ওই অতসীকে তার জীবনে ও গৃহে প্রতিষ্ঠা দিয়ে। কিন্তু অতসীও তা স্বীকার করলে না। তাকে স্বীকার না করে সে স্বীকার করলে শিবকিংকরকে। আর তার মা। তার মায়ের কাছেই সে সব থেকে বেশী সমর্থন এবং আশীর্বাদ আশা করেছিল। তাঁর সামনাসামনি দাঁড়িয়ে কথাগুলি বলতে গিয়ে কেমন একটা লজ্জা বোধ করেছিল বলেই অংশুমান কলকাতা চলে এসে চিঠি লিখে একথা তাঁকে জানিয়েছিল, না হলে তার আশা ছিল মা কয়েক মুহূর্ত বা কয়েক ঘণ্টা স্তব্ধ হয়ে থেকে সমস্ত ব্যাপারটি বুঝে নিয়ে তাকে ডেকে আশীর্বাদ করবেন এবং সারা দেবগ্রাম অঞ্চলটা জুড়ে এই নূতন সত্যপালনের আদর্শের একটা হাওয়া বইয়ে দেবেন। এ

সত্যপালনের একটা অলিখিত প্রতিশ্রুতি তাঁর দেওয়া ছিল কিন্তু তিনি তা পালন করতে পারেন নি।

সেটা ১৯৫১ সাল। অংশুর বয়স তখন ১৯ বছর। ওখানকার ছেলেরা এসে তাকে বলেছিল—অংশুদা আপনি ইলেকশনে দাঁড়ান। আমরা সবাই আপনার জন্যে খাটব। এবং নিশ্চয় জিতিয়ে দেব।

অংশু হেসে বলেছিল—না।

তারা বলেছিল—কেন?

অংশু বলেছিল—প্রথম আমার বয়স হয় নি। দ্বিতীয় আমার সময় নেই রে।

সত্যিই তার সময় ছিল না। কারণ বড়বউদি তখন বাড়িতে জমাট করে আসর পেতেছেন। সে আসরে জমিয়ে গান ধরেছে সদ্য থার্ড ডিভিশনে পাস করা বউদির চতুর্থ বোন অমিতা। বউদির তিন-তিনজন কুমারী বোন অমিতা নমিতা এবং শমিতা আম খাবার জন্য দেবগ্রামে এসে আগে থেকেই জমিয়ে বসেছিল।

অমিতারা তিন বোনেই গান শিখত। অমিতা এবং শমিতা শিখত গান—নমিতা শিখত সেতার। অমিতা শিখত রবীন্দ্রসংগীত শমিতা শিখত ক্ল্যাসিক্যাল।

তিন বছর পর সেদিন সন্ধ্যাকালে দেবগ্রামে এসে প্রায় একটা পর্যন্ত সে জেগে বসেছিল। মনের মধ্যে কত স্মৃতি এলোমেলো ভাবে আসা-যাওয়া করেছিল। কতজনে এসে দেখা করেছিল। কত কথা বলেছিল। সে সব কথা মনে নেই। মনে আছে এক প্রগল্‌ভ বৃদ্ধের কথা। হারু চাটুজ্জে। গ্রামসম্পর্কে তার বাপের খুড়ো। কটকটে লোক। বলেছিল—"যাক ফিরে এলে শেষে! এও ভাল করেছ। এখন বিয়েটিয়ে করে সংসারী হও। খুব বেঁচে গিয়েছ। মেয়েটাকে যে ঘাড়ে কর নি করতে হয় নি এ খুব বাঁচোয়া তোমার। তিলকে তাল করে তোলা। আরে এ হয় না, মানে, ঘটে না কোন্ মানুষের?" এবং মলমূত্র ত্যাগের নজীর সামনে ধরে একটি বিচিত্র জীবনদর্শন-তত্ত্ব তাকে শিক্ষা দিয়ে গিছল। বলেছিল—"এই দেখ আমার বয়স বাপু বাষট্টি হল, এখনও আমাকে লোকে বলে আমার স্বভাব খারাপ।"

অংশুমান লোকটার সঙ্গে কথা বলে নি।

লোকটার একটি ষোল-সতের বছরের কুমারী দৌহিত্রী ছিল।

মেয়েটির নাম রমলা। হারু চাটুজ্জের মেয়ে বিধবা হয়ে বাপের ঘরে এসে আশ্রয় নিয়েছিল ওই মেয়ে নিয়ে। ভবানীপিসী সারা গ্রামে কাজকর্মে লোকের বাড়ি খাটাখাটনি করত। রান্নাবান্না পুজোআর্চার কাজকর্ম। আর খুব বই পড়ত। সেই সূত্রে আসত তার মায়ের কাছে। তার মায়ের কাছ থেকে বই নিয়ে যেত। গ্রামের লাইব্রেরী থেকে তার মা-বই আনিয়ে তাকে পড়তে দিতেন। আরও কিছু করতেন—ভবানীপিসীকে সেলাইটেলাই শেখাতেন। মণীন্দ্রলাল বোসের 'রমলা' উপন্যাস পড়ে ওই নামকরণ করেছিল মেয়ের।

পরের দিন ভোরবেলা তার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল বউদির ছোট বোন শমিতার গলা সাধার আওয়াজে—আ-আ-আ। আ-আ-আ। বিরক্ত হয়েছিল মনে মনে। সে বিরক্তি অপনোদন

করে তার বউদি এসে তাকে বসে থাকতে দেখে বলেছিলেন—উঠেছ? আমি কাল জিজ্ঞেস করতে ভুলে গিছিলাম, কটার সময় ওঠো তুমি। অমি—অমি! চা নিয়ে আয়।

বউদির সন্ত ম্যাটি ক পাস বোন অমিতা চায়ের ট্রে হাতে এসে ঘরে ঢুকেছিল।

না, অমিতা তার কাছে আদৌ আকর্ষণীয় ছিল না। শমিতার কথা বাদই দিতে হবে—তখন সে সবে তেরোতে পা দিয়েছে। তবে মাঝের বোন নমিতা তাকে আকর্ষণ করেছিল। মেয়েটির রূপে বৈচিত্র্য ছিল, তার সঙ্গে মনের একটা দীপ্তি ছিল। সে ছিল খানিকটা গম্ভীর। প্রগল্‌ভা ছিল না। সেতার সত্যিই ভাল বাজাত। পড়াশোনাতেও ভাল ছিল। অমিতা ছিল গৌরী—ছোট শমিতা ছিল উগ্র রকমের ফরসা—নমিতা ছিল উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা। চোখ দুটি ছিল বিষণ্ণ সুন্দর। হাসত কম। কিন্তু হাসলে সে হাসিতে সমস্ত পরিপার্শ্বও হেসে উঠত। এবং চোখের দৃষ্টির সেই বিষণ্ণতা সে সময়টিতে মুছে দিয়ে জ্বলে উঠত প্রদীপের মত। অমিতার থেকে নমিতার বয়সের তফাতও খুব বেশী ছিল না, মাত্র বছর দেড়েকের মত।

প্রথম দিনের সকালেই চায়ের আসরটিই হয়ে উঠেছিল একটি স্বয়ংবর সভা। তাতে মেয়েরাই এসেছিল সেকালের রাজাদের মত এবং তাকেই নিতে হয়েছিল রাজকন্যার ভূমিকা। সে জমেও গিয়েছিল। সত্যিই সে আকৃষ্ট হয়েছিল নমিতার দিকে। দিদির হুকুমে সে সেতার বাজিয়ে শোনাচ্ছিল এবং বাজাচ্ছিলও বেশ ভাল; অংশুমান তার মুখের দিকে একাগ্র হয়েই তাকিয়ে ছিল। নমিতার সঙ্গে চোখাচোখিও হয়েছিল—তাতে সে লজ্জিতা হয়েও বেশ কৃতিত্বের সঙ্গে আত্মসংবরণ করে বাজিয়ে গিয়েছিল শেষ পর্যন্ত। এরই মধ্যে শেষ আসরে এসে হাজির হয়েছিল রমলা।

অবাক হয়ে গিয়েছিল অংশুমান।

তার মনে হল, দ্রৌপদীর স্বয়ংবর সভায় দীন ব্রাহ্মণবেশী অপরাজেয় অর্জুন এসে ঢুকেছেন এবং বলছেন, আমি ওই মৎস্যব্যূহ লক্ষ্যভেদ করব। মেয়েটার যেমন আশ্চর্য যৌবন এবং তেমনি মদির নিমন্ত্রণ তাতে। কিন্তু মেয়েটা মুখ খুলতেই অংশুমানের চেতনা হয়েছিল এবং বুঝতে পেরেছিল যে, এটা নেহাতই যাত্রার আসরের দ্রৌপদীর স্বয়ংবর সভা। এবং ওই রমলাকে অর্জুনের পোশাকে খুব ভাল মানালেও পার্ট করতে একান্ত অপটু। রমলা একটা চিনেমাটির ডিসে কতকগুলি বেলফুল এবং একটি খুব ভাল আম নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছিল সেই ঘরখানির দরজার মুখে। নমিতার সেতারের বাজনায় তখন সারা ঘরখানা একেবারে ভরে রয়েছে—মানুষের আপন নিঃশ্বাসের শব্দও মানুষ ঠিক শুনতে পাচ্ছে না এমনই একটা সময়ে সে ঘরে ঢুকে দিব্যি এগিয়ে এসে রেকাবিখানা তার সামনে নামিয়ে দিয়ে তার সঙ্গে কথাবার্তা জুড়ে দিতে চেষ্টা করেছিল।

—দাদু এগুলি পাঠিয়ে দিলে।

অংশুমান তার মুখের দিকে তাকিয়েছিল। রমলা ফিক করে হেসে বলেছিল—আমি রমলা। চিনতে পারছ আমাকে? বলে তার পায়ের দিকে হাত বাড়িয়েছিল।

অংশুমান বিরক্ত হয়ে বলেছিল—থাক। ওই হয়েছে।

—ও মা। তাই হয়? তুমি আমার দাদা হও না? তোমার বাবা আমার দাদুকে কাকা বলত। আমার মা তোমার বাবাকে বলত দাদা। তোমার মা আমার মাকে বলত ভবানী ঠাকুরঝি। দাদু তোমাদের জ্ঞাতি। দশ রাত্রের জ্ঞাতি। তোমরা চৌধুরী হলেও তোমরা কাশ্যপ গোত্তর।

ক্রমান্বয়ে সে বকেই চলেছিল। ওদিকে নমিতা ক্ষুব্ধ হয়ে উঠছিল। এই অবস্থায় হঠাৎ বউদি ঘরে ঢুকে সব দিক রক্ষা করেছিলেন। রমলার হাত ধরে তাকে টেনে খানিকটা দূরে এনে বসিয়ে দিয়ে বলেছিলেন—এইখানে বস্। মেলা বকবক করিস নে।

কিছুক্ষণ একটু বিমর্ষ হয়ে চুপচাপ ছিল মেয়েটি। কিন্তু তারপরই আবার যা কে তাই। কিছুক্ষণ পর সবে নমিতা সেতার বাজনা শেষ করে সেতারটি নামিয়ে রেখেছে, রমলা এই ক্ষণটিকে পাবামাত্র বলে উঠেছিল—তুমি একটা 'আব্বিত্তি' কর না অংশুদা! ইস্কুলে 'প্রেয়াইজের' সময় কি সুন্দর 'আব্বিত্তি' করতে। সব সভাতে করতে।

* * *

হারু চাটুজ্জে গরীব। তার বিধবা কন্যা ভবানী তার ঘাড়ের দায়; তার মেয়ে রমলা। তার যৌবন দারিদ্র্যের জন্য কুণ্ঠিত ছিল না। অভাবকে অগ্রাহ্য করেও সে মাটির তলার জলের মত জীবনে এসেছিল। তার সঙ্গে রূপও ছিল কিছু এবং সে শিখেছিল এই যে, কোনক্রমে কোন দরাল জনের রসনাকে বর্ণ বা গন্ধের নিমন্ত্রণে সরস করে তুলতে না পারলে সে একদা বৃন্তচ্যুত হয়ে মাটিতে পড়ে মাটিতেই মশে যাবে। সুতরাং তার মনোরঞ্জনের চেষ্টার আর সে বাকী করে নি।

তা যদি সে না করত তাহলে ভাল করত। হয়তো বা অংশুমান তার প্রতি কিছুটা আকৃষ্ট হত। রমলা মধ্যে মধ্যে নিজের বক্ষোবাস অসংবৃত করে নিজের যৌবনকে নিয়ে বিব্রত হয়ে লজ্জিত হত। এবং বার বার বলত—"বাবাঃ বাবাঃ! চুলের জ্বালায় আর—। মরণ হয় তো বাঁচি।"

এক্ষেত্রে ভুল করতে তার বার বার ইচ্ছে হয়েছিল—মনের মধ্যে ভুল করবার দিকে প্রচণ্ড ঝোঁক আছে—সেটা দাঁড়িপাল্লার ওঠা নামার মত স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু তবু অংশু সে ভুল করে নি।

আজ মনে হচ্ছে, ভুল যদি সেদিন সে করত তবে হয়তো ভাল করত। কারণ আজ যেখানে সে এসে দাঁড়িয়েছে সেখানে সে এসে পৌঁছত না।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললে অংশু।

অতসীর শিক্ষা তাকে এদিক থেকে সংযত করেছিল এবং হারু চাটুজ্জের কদর্য দীনতা ও হীনতা তাকে তার নাতনী থেকে অহরহ দূরে থাকতে বলত। আর সাহায্য করেছিল নমিতা। সে তাকে আকর্ষণ করেছিল প্রথম প্রথম ধীরে ধীরে—ক্রমশঃ গাঢ় আকর্ষণে দ্রুতবেগে।

সেবার দেবগ্রামে ছিল কুড়ি দিন। কুড়ি দিনের পর সে কলকাতা ফিরেছিল—বি-এ ক্লাসে ভর্তি হবার তাগিদ রয়েছে। তার সঙ্গে বউদির বোনেরাও ফিরেছিল কলকাতা।

তাদের নিতে এসেছিল অমিতা নমিতার পরের ভাই—শমিতার বড়—পনের বছরের—কি কুমার যেন। বউদির ভাইরা সবাই কুমার—অরুণ বরুণ তরুণ—তারপর দুজন কি কুমার তা অংশুর আজ আর মনে পড়ে না। অনেক দিনের কথা। সে ১৯৪৮ সাল—এটা ১৯৫১। ষোল বছর হয়ে গেল।

আসবার দিন হারু চাটুজ্জে তাকে খোলাখুলি বলেছিল—তোমাকে একটা কথা বলব ভায়া? কিছু মনে করবে না তো?

সে বলেছিল—না। বলুন। কিছু মনে করব কেন?

—রমলাকে কেমন লাগল?

—এ-কথা জিজ্ঞাসা করছেন কেন? চমৎকার মেয়ে রমলা।

—চমৎকার আরও চমৎকার মেয়ে রমলা হে! ও তো তোমার সাজতেগুজতে পায় না। পাবে কোথায় বল! ওই সব স্নো পাউডার। তা ছাড়া গাঁয়ের তো! ওসব পেলে ও আরও অনেক চমৎকার হবে। তা ছাড়া সেবা। সে তোমাকে কি বলব! আমার মাথা ধরলে বলি—রমি, দে না ভাই মাথায় হাত বুলিয়ে একটু! কি বলব ভাই ওর হাত এমন নরম আর এমন ঠাণ্ডা। মাথায় হাতটি রাখলেই যেন মাথা ছেড়ে যায়। আর তেমনি পায়ে হাত বুলোলে সঙ্গে সঙ্গে ঘুম আসে। তা তুমি তো সে সব নাও নি। আমি বলে দিয়েছিলাম। কিন্তু—। রমি বললে—দাদু অংশুদা ওসব চায় না।

একটু চুপ করে থেকে চাটুজ্জে বলেছিল—তোমাকে মেয়েটা ভালবেসে ফেলেছে হে! তুমি ওকে বিয়ে কর না ভাই!

এবার কর্কশভাবে অংশু বলেছিল—এই জন্য ওকে আমার কাছে পাঠাতেন নাকি?

চাটুজ্জে হুঁকোসুদ্ধ হাতটি পাশে নামিয়ে বলেছিল—তা ভাই বটে। তা পাঠাতাম বইকি

—ছি—ছি—ছি। কথার মাঝখানেই ধিক্কার দিয়ে উঠেছিল সে। কিন্তু তাতে চাটুজ্জে লজ্জিতও হয় নি, কুণ্ঠিতও হয় নি। হেসে বলেছিল—ছি কেন বলছ ভাই। আজকাল তো তোমার কোর্টশিপের যুগই পড়েছে। তুমি রমলাদের পালটি ঘর। রমলা ভাল মেয়ে। বিয়ে হলে ও নিজে সুখী হবে—তোমাকে সুখী করবে। তোমার কোন খুঁত ধরবে না। ওই ধর সেই পুরনো কথা তুলবে না। তা ছাড়া আমাদের টাকা নাই বিয়ে দেবার। তোমার ভাই অভাব নাই। তাই পাঠিয়েছিলাম। সে তো তোমার দাদার শ্বশুর—তিনি তো শুনি মস্ত লোক—তিনি তাঁর মেয়েদের পাঠিয়েছেন—

অত্যন্ত রূঢ়ভাবে সে বলেছিল—না। তারা এখানে তাদের দিদির কাছে এসেছে।

বলেই সে চলে এসেছিল। ঠাকুরবাড়ির ফটকের সামনে দুখানা ছইওয়ালা গরুর গাড়ি তখন সেজে অপেক্ষা করছে।

* * *

রমলাকে তার জীবনে যদি সে গ্রহণ করত তবে আজ এখানে এসে দাঁড়াতে হত না।

মেয়েটা বিচিত্র। সে তাকে সব দিতে চেয়েছিল। অনাবৃত যৌবন মেলে ধরে তাকে আহ্বান করেছিল। বলেছিল—তুমি আরও বিয়ে করো। আমি তোমাদের সেবা করব। দুটো বিয়ে তো তোমার বাবাও করেছিল।

সেদিন সে তাকে গ্রহণ করতে পারে নি। তখন সে নমিতার দিকে আকৃষ্ট হয়েছে।

দেবগ্রাম থেকে যাওয়ার পর থেকেই টেলিফোনে কথা হত তাদের।

ওদিক থেকেই ডাক এসেছিল প্রথম। তার বোর্ডিং হাউসের আপিসে চাকর ডেকে নিয়ে গিয়েছিল। তরুণ নারী কণ্ঠস্বর চকিত করেছিল প্রথমটা।

চকিতভাবেই প্রশ্ন করেছিল—কে?

একটুকরো হাসির সঙ্গে উত্তরে প্রশ্ন এসেছিল—কে বলুন তো?

দুটি নাম মনে ভেসে উঠেছিল। নমিতা আর অতসী। অতসীর তখন টেলিফোন হয়েছে খবর পেয়েছিল। অতসী তখনও মন থেকে মোছে নি।

নমিতা বলেছিল—হেরে গেলেন তো! আমি নমিতা।

—নমিতা?

—হ্যাঁ।

নমিতা বলেছিল—এক বান্ধবীর বাড়ি থেকে ফোন করছি। কেমন আছেন? আপনি তো খবর নিলেন না!

অপ্রস্তুত হয়েছিল অংশুমান। বোকার মতই বলেছিল—আমি কি করে খবর নেব বল—।

খিলখিল শব্দের হাসি উঠেছিল ওপাশে। তারপর বলেছিল—কেন টেলিফোন কিংবা বাড়ি এসে—

—তোমার মা বাবা কি দাদারা যদি—

—কি বোকা আপনি! তাহলে আমাদের দেবগ্রাম যেতে দিতেন নাকি! বাবা মা দাদারা কিছু মনে করবেন না।

এর কিছুদিন পর আরও স্পষ্ট হয়েছিল সমস্তটা। দাদার শ্বশুর তাকে বলেছিলেন—মন দিয়ে পড়। ফরগেট অল দোজ পাস্ট। বুঝেছ! মধ্যে মধ্যে এস। বুঝেছ! ভারী ভাল লাগে তোমাকে। বোল্ড ইয়ং ম্যান। আরও ভাল লাগে যে ছাট গাঁধীইজমের দড়ি খুলে ফেলতে পেরেছ।

এই পরিস্থিতিতে সে তখন বালিগঞ্জ যাচ্ছে। ওদের বাড়িতে চা খাচ্ছে। নমিতা অমিতা শমিতা এবং বাড়ির অন্যদের সঙ্গে হুল্লোড় করছে। ওদের গানের সঙ্গে বাঁশী বাজাচ্ছে। সাহিত্যালোচনা রাজনীতি নিয়ে তর্ক উত্তপ্ত। দাদার শ্বশুরেরা সদ্য কংগ্রেসে ঢুকেছেন। ১৯৫১ সালের ২৬শে জানুয়ারী ভারতবর্ষের সংবিধান পাস হয়েছে। বি-পি-সি-সিতে অতুল্য ঘোষ প্রেসিডেন্ট হয়েছেন। ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষ তাঁর দলবল নিয়ে মন্ত্রিসভা এবং কংগ্রেস দুই ছেড়ে বেরিয়ে গেছেন। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় চীফ মিনিস্টার হয়েছেন। দিল্লীতে আচার্য কৃপালনী কংগ্রেস ছেড়ে বেরিয়ে গিয়ে ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষদের সঙ্গে দল গড়েছেন। বাংলাদেশে কম্যুনিস্ট

পার্টি বেআইনী ঘোষিত হয়েছিল ১৯৪৯ সালে, সামনে নির্বাচন আসছে তার জন্য পার্টির উপর থেকে 'ব্যান' তুলে নেওয়া হয়েছে সদ্যসদ্য। বাইরের পৃথিবীতে চীনে কম্যুনিস্ট বিপ্লব হয়ে গেছে। চিয়াং কাইশেক ফরমোজায় হটে চলে গেছেন। আমেরিকা সারা পৃথিবীকে ঋণের পাকে পাকে জড়াচ্ছে। পাকিস্তানে এবং ভারতবর্ষে মতান্তরের সঙ্গে মনান্তরের উত্তাপের আর শেষ নেই। ১৯৪৬ সালে হিন্দু মুসলমানে যে দাঙ্গা বেধেছে তার জের মিটেও মিটছে না। বাংলাদেশে অন্ন নাই, বস্ত্র নাই, শাসন নাই, শৃঙ্খলা নাই। সমাজ নাই, শাস্ত্র নাই।

এরই মধ্যে নতুন সংগঠনের নামে কংগ্রেসের দুই দিকে দুটো দরজা খুলেছে। একদিকে নতুন লোক ঢুকছে—অন্যদিকে দরজা দিয়ে পুরনো লোকেরা বেরিয়ে যাচ্ছে। এই আলোচনা দাদার শ্বশুরবাড়িতে প্রচণ্ড উত্তাপের সৃষ্টি করত। এবং সে জ্বলন্ত আগুনের মত। সে কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে আসার দলের মানুষ হয়ে উঠেছে তখন। বি-এ ক্লাসে ভরতি হয়ে স্টুডেন্টস্ মুভমেন্টে অন্তরতম বৃত্তের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। সেখানে সে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট কিন্তু কংগ্রেস-বিরোধী।

আশ্চর্য। পৃথিবীর একটা ঘটনার সঙ্গে আর একটা ঘটনা, যত দূরদূরান্তরের হোক, আর ভিন্ন জাতি জাত্যান্তরের হোক, আশ্চর্যভাবে অতি সূক্ষ্ম বন্ধনেও পরস্পরের সঙ্গে বাঁধা। নমিতার সঙ্গে তার গোপন প্রীতির সম্পর্ক না থাকলে এদের সঙ্গে প্রচণ্ড বিরোধ হয়ে যেত এবং স্টুডেন্টস্ ফ্রণ্টে সে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট থাকত না।

কো-এডুকেশনের দিন। উজ্জ্বলা এবং প্রখরা সহপাঠিনীরও অভাব ছিল না এবং মৃদুহাসিনী সুকোমলা সলজ্জারও অভাব ছিল না। তবু জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করছিল ওই নমিতার আকর্ষণ। ওই নমিতার আকর্ষণেই সেদিন রমলার প্রলোভনও তাকে প্রলুব্ধ করে নি।

মেয়েটা বিচিত্র। আজকের মত অতি তীব্র বেদনার্ত দিনেও তাকে বার বার মনে পড়ছে। আজ সে ওই সন্তানটির জননী হলে তার পায়ে আছড়ে পড়ে পা দুটোকে জড়িয়ে ধরে পড়ে থাকত।

সে তাকে সব দিতে চেয়েছিল। জীবনের সব।

ওই জ্যৈষ্ঠ মাসের থেকে ছ মাস পর। গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষের প্রথম নির্বাচন। সারা দেশ জুড়ে গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে প্রতিটি মানুষের কাছে যেতে হচ্ছে ক্যাণ্ডিডেটকে। ভারতবর্ষের পুরাণে বর্ণিত দশ বিশটা অশ্বমেধ বা রাজসূয়েও এত আয়োজন প্রয়োজন হয় নি। এবং এতও কি পলিটিক্যাল মতভেদ ছিল!

দেবগ্রামে কংগ্রেস থেকে দাঁড়িয়েছিলেন এক ভিন্ন-ভাষাভাষী ধনী ব্যবসাদার। তাঁর বিরুদ্ধে ক্যাণ্ডিডেট ছিল আরও তিনজন। প্রজা সোসালিস্ট, কম্যুনিস্ট আর একজন ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট।

তার দুই দাদা সমর্থন করছিল কংগ্রেসকে। জ্যাঠতুত ভাইরাও তাই। এরই মধ্যে কাশী থেকে তার মা এসে হাজির হলেন দেবগ্রামে। কংগ্রেসকেই সমর্থন করছেন। নিজে গিয়ে তাঁকে কাশী থেকে নিয়ে এসেছেন ওই শেঠজী। কংগ্রেস সভাপতির অনুরোধপত্র নিয়ে

গিয়েছিলেন। দেবগ্রাম অঞ্চলে আপত্তি উঠেছিল—কংগ্রেস দিয়েছে বলে কি একজন পরদেশীকে সমর্থন করতে হবে আমাদের? সেই কারণেই মা এসে দাঁড়ালেন। স্বর্গীয় নিরঞ্জন চৌধুরীর সহকর্মিণী এবং সহধর্মিণী। সংবাদ পেয়ে পি-এস-পিকে সমর্থন করবার জন্য সে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিল।

উপস্থিত হয়ে বিপদটা সে বুঝতে পারলে। আসায় বিপদ আছে জেনেই সে এসেছিল কিন্তু বিপদটা যে কতখানি তা অনুমান করতে পরে নি।

তার বাড়ি যেখানা সে বাড়িতে উঠেছেন তার মা। তার দাদারাও কংগ্রেসের সমর্থক। সে উঠবে কোথায়? সে মাকে বলবে—বাড়ি ছেড়ে দাও?

তাদের প্রার্থী বলেছিল—আমাদের একটা আপিস আছে দেবগ্রামে—সেখানে থাকুন। না হয় চলুন আমার বাড়িতে গিয়ে থাকবেন। দেবগ্রামে হারু চাটুজ্জের বাড়ির বাইরের দুটো ঘর নিয়ে আমরা আপিস করেছি।

* * *

বিচিত্র ঘটনা সংস্থান। রাজনীতি এবং অর্থনীতি দুটো স্রোত একসঙ্গে মিললে আর রক্ষা থাকে না। অর্থনীতি যে কোন উপায়েই পেটের অন্নের সংস্থান করুক রাজনীতি সে অন্নকে গ্রহণ করবার বা দেবতাকে নিবেদন করবার মন্ত্র তৈরি করে দেয় এক মুহূর্তে।

হারু চাটুজ্জে ইলেকশনে ঘর ভাড়া দিয়ে একেবারে পি-এস-পি সমর্থক হয়ে উঠেছে। চাটুজ্জের কোন রাজনীতি ছিল না তা নয়, এর আগে পর্যন্ত সে হিন্দু মহাসভার গোঁড়া সমর্থক ছিল। এবারে এখানে হিন্দু মহাসভার প্রার্থী নেই সেই কারণে প্রথমটা ছিল বেকার। হঠাৎ ঘর ভাড়া দিয়ে প্রথম হয়েছিল পরোক্ষ সমর্থক, তার পর এখন হয়েছে প্রত্যক্ষ সমর্থক, কারণ কর্মী যারা ওখানে থাকে চাটুজ্জের বাড়িতেই তার হেঁসেলেই তাদের রান্না হয়। চাটুজ্জের স্ত্রী এবং মেয়ে ভবানী রান্না করে। দৌহিত্রী রমলা পুরোপুরি পি-এস-পির সভ্যই হয়ে গেছে বোধ হয়। সে খদ্দরের শাড়ি কেরতা দিয়ে পরে অতি আধুনিকার মত দেবগ্রামে ধ্বজাধারিণী হয়ে উঠেছে। শ্লোগান দেয়। বাড়ি বাড়ি মেয়েদের কাছে যায়। বিশেষ করে ব্রাত্য পাড়ার মেয়েদের কাছে যায়।

বিচিত্র ঘটনা সংস্থানে সে চাটুজ্জের বাড়িতে গিয়েই রাত্রির মত বাসা নিয়েছিল।

রমলার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল।

—অংশুদা!

অস্বস্তি বোধ করেছিল অংশু। রামলার মুখের দীপ্তি তাকে স্বস্তি দেয় নি। উদ্ধতযৌবনা রমলা যেন সেই মুহূর্তেই আগুনের সামনে দাহ্যবস্তুর মত চঞ্চল হয়ে উঠেছিল।

হারু চাটুজ্জে সেদিন বাড়িতে ছিল না।

রমলা তাকে বাইরের ঘরে থাকতে দেয় নি। দিয়েছিল বাড়ির ভিতরে হারু চাটুজ্জের শোবার ঘরের পাশের ঘরে। পুরনো কালের ভাঙা দোতলার দেড়খানার মত ঘর বসবাসযোগ্য ছিল। তারও মধ্যে ওই আধখানাটিই ছিল সব থেকে ভাল। প্রথম সে ওই ঘরে যেতে রাজী হয় নি কিন্তু বাইরের ঘর দুখানায় ভোট কর্মীরা এমন সার্থকভাবে

সমাজতান্ত্রিক ব্যবহার প্রাথমিক অবস্থাকে প্রবর্তিত করেছিল যে সে সহ্য করা সম্ভবপর হয় নি তার পক্ষে। বিড়ির কুটী এবং একটা ভ্যাপসা গন্ধ, তার সঙ্গে তৃক্তাপোশ বাজিয়ে হল্লোড় দেখে সে ঘরে ঢুকতে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়েছিল। এই সময়েই বাড়ির ভিতর থেকে ছুটে এসেছিল রমলা। অংশুদা—!

তারপর আর কোন কথা শোনে নি, কইতে দেয় নি, বলে নি, নিজেই সুটকেসটা তুলে নিয়ে একজন পনের-ষোল বছর বয়সের ছেলেকে বলেছিল—নে তুই বিছানাটা নে।

তার দাদা এসেছিল তাকে নিতে।

থাক সে সব কথা।

একেবারে হুড়মুড় করে এসে পড়ছে রাত্রির কথা। গভীর রাত্রে সে তখনও জেগে ছিল। কেমন যেন একটা অজানা আতঙ্ক তাকে চেপে ধরেছিল দুঃস্বপ্নের মত। সে ভাবছিল—কেন সে এল? বার বার মনে পড়ছিল নমিতাকে।

শ্যাম্পু করা চুল, মুখে পাউডারের একটি ধূসরতা, চোখে কাজলের রেখা, ঠোঁটে লিপস্টিকের আভাস। তন্বী তরুণী নমিতা শুধু সেতারই ভাল বাজায় না, সে নাচেও খুব ভাল। পূজোর আগে ওদের স্কুলের সোস্যালে নমিতা 'শ্যামা' নৃত্যনাট্যে শ্যামার ভূমিকায় অভিনয় করেছিল। সে অভিনয় দেখেছিল অংশুমান। এবং এরপর কোনদিন নমিতাকে চিত্রাঙ্গদার ভূমিকা দিয়ে তার নিজের অর্জুনের ভূমিকায় অভিনয় করবার কল্পনা যে কতদিন করেছে তার হিসেব নেই। এ কথা নমিতা জানে। নমিতার সঙ্গে অন্তরঙ্গতা ধীরে ধীরে প্রেমের কোঠায় পৌঁছেছে এ সত্যটা সে সেইদিন রাত্রেই প্রথম অনুভব করেছিল। পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে কেমন যেন একটা অনুভূতির স্পর্শ লাগে—পরস্পরের হাতে হাত ঠেকলে কেমন করে আঙুলগুলো কেঁপে ওঠে—মধ্যে মধ্যে কোন টেবিলের এপাশে ওপাশে বসে কথা কইতে কইতে হঠাৎ পায়ে পায়ে ছোঁয়া লেগে বুড়ো আঙুল চঞ্চল হয়ে ওঠে—সে-সব কথাই সে মনে করছিল। এরই মধ্যে, রাত্রি তখন গভীর, বাইরে সমস্ত গ্রাম স্তব্ধ, শুধু অগ্রহায়ণের শেষ রাত্রে এক একটা কুকুর ডেকে উঠছিল আর ডাকছিল আমবাগানে ঝিঁঝি পোকা; হঠাৎ তার দরজার বাইরে শব্দ উঠেছিল—ঠুক। আবার—ঠুক। আবার—ঠুক ঠুক।

শেকলটা দরজার গায়ে ঠেকছিল।

তার বুকটা ঢিপঢিপ করে উঠেছিল। সারা শরীরে একটা উত্তেজনার প্রবাহ বয়ে গিয়েছিল।

আজও মনে পড়ে দুটো সমান বিরোধী শক্তি তার জীবনের দুই প্রান্ত ধরে টানছিল। একটার টানে সে উঠে বিস্ফারিত চোখে পা টিপে টিপে যেতে চাচ্ছিল ওই দরজার দিকে দরজা খুলে দেবার জন্য—আর একটা সমান শক্তি তাকে নিষ্ক্রিয় করে ফেলে রেখেছিল বিছানার উপর। সমস্ত অন্তর সমস্ত বাহির যেন নিঃশেষে অবলুপ্ত এবং শূন্য হয়ে গিয়েছিল। শুধু ছিল হৃদ্‌স্পন্দনের গতির মধ্যে একটা অসহনীয় উদ্বেগ। শীতের রাত্রি, তবু শরীর তার ঘেমে উঠেছিল।

শেষ পর্যন্ত চাপা গলায় রমলা তাকে ডেকেছিল—অং—শু—দা—। অংশু—দা! চাপা গলায় দীর্ঘায়িত সতর্ক আহ্বান!

তবু সে দরজা খোলে নি।

কেন খোলে নি এ প্রশ্ন সে সেদিন করে নি। সেদিন সে প্রচণ্ড শঙ্কায় শঙ্কিত ছিল যে দরজা খুললে সে আত্মসংবরণ করতে পারবে না; রমলা তার বুকের উপর ঝাঁপ দিয়ে পড়বে। এবং সমুদ্রের ঢেউয়ের সামনে ঝাঁপ দিলে সমুদ্র যেমন তাকে নিবিড়ভাবে আত্মসাৎ করে ঠিক তেমনিভাবে তাকে আত্মসাৎ না করে সে কিছুতেই নিজেকে সংবরণ করতে পারবে না এ কথা সে নিশ্চিতরূপে জানত। এবং এও জানত যে তারপর রমলাকে বিয়ে করা ছাড়া তার আর নিষ্কৃতি থাকবে না। হয়তো সঙ্গে সঙ্গেই রমলার মা দিদিমা এসে দরজায় ধাক্কা দেবেন। অথবা ঘরের দরজায় শেকল তুলে দিয়ে গাঁয়ের লোক ডেকে জড়ো করবেন।

সারারাত্রি সে কাঠ হয়ে পড়েছিল। কতক্ষণ বলতে পারে না তবে সে রাত্রিটা ছিল যেন একটা যুগ অথবা অনন্তকালের অন্তহীন রাত্রির একটি রাত্রি। সে রাত্রিরও আর শেষ ছিল না এবং তার একটা টুকরোর দৈর্ঘ্যেরও মাপজোখ ছিল না। এরই মধ্যে একসময় রমলা কখন চলে গিয়েছিল সে ঠিক ধরতে পারে নি।

পরের দিন দুপুরবেলা একবার মাত্র এসে তাকে ক'টি কথা বলে গিছল।

—কাল রাত্রে দরজা খুললে না কেন?

সে চুপ করে থেকেছিল।

রমলা বলেছিল—আমি তোমাকে—

বলে আর বলতে পারে নি। কিছুক্ষণ পর বলেছিল—তুমি আমাকে বিয়ে কর অংশুদা। দয়া করে বিয়ে কর। আমাকে বিয়ে করে আমাকে তুমি এই গাঁয়ের বাড়িতে ফেলে রেখে কলকাতায় থেকে অমিতা নমিতা যাকে ইচ্ছে হয় বিয়ে করো আমি কিছু বলব না।

সে তবু চুপ করে বসে ছিল।

রমলা বলেছিল—দাদু আমার বিয়ে দেবে এক বুড়োর সঙ্গে।

সে তবু কথা বলে নি।

রমলা বলেছিল—দেখ এ গাঁয়ে তোমার দাদারা থেকে ছোঁড়ারা পর্যন্ত আমার পিছনে জন্তুর মত লেগে আছে। ছিঁড়ে খেতে চায়। তুমি আমাকে বাঁচাও।

এবার সে বলেছিল—না তা হয় না!

—হয় না! বেশ! বলে চলে যেতে যেতে ফিরে দাঁড়িয়ে বলেছিল—তবু রাত্রে আজ দরজাটা খুলে দিয়ো। ভাসতেই যখন হবে তখন তোমাতেই প্রথম ভাসান দেব। ভয় নাই —তার জন্যে কোন দাম চাইব না।

কোন মেয়ের এমনতর দুঃসাহসী আত্মদানের প্রস্তাব সে শোনে নি। মেয়েটা বিচিত্র।

অংশু কিন্তু রাত্রে আর থাকে নি। বিকেলে মিটিংয়ে বেরিয়ে ওই ক্যাণ্ডিডেটের সঙ্গে তার জীপে সেই দিনই রাত্রি দশটার সময় এসেছিল বর্ধমান। বাকী রাত্রিটা বর্ধমানে থেকে ভোরের লোকালে ফিরে এসেছিল কলকাতা। আর সে যায় নি গোটা ইলেকশনের

সময়ের মধ্যে।

এরই মধ্যে হঠাৎ সে একখানা নিমন্ত্রণ পত্র পেয়েছিল। বিয়ের নিমন্ত্রণ পত্র। হারু চাটুজ্জে তাকে রমলার বিবাহে নিমন্ত্রণ-পত্র পাঠিয়েছে। রমলার বিবাহ হচ্ছে গোপগ্রামের হরিধন ঘোষালের সঙ্গে। এই কয়েকদিন পরই মাঘ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে।

বউদি চিঠি লিখেছিল—রমলা মেয়েটার বিয়ে হয়ে গেল। গোফ-গাঁয়ের হরি ঘোষালের সঙ্গে; অবস্থা খুব ভাল। দেড়শো দুশো বিঘে জমি—পুকুর—সম্পত্তি অনেক। শুধু লোকটার বয়স হয়েছে। বাহান্ন-চুয়ান্ন তো হবেই কেউ কেউ বলে বেশী হবে। তা হোক। অনেক গয়না দিয়েছে রমলাকে। এক-গা পুরনো আমলের ভারী ভারী গয়না পরে রমলা ঠাকুরবাড়িতে প্রণাম করতে এসেছিল। খুব খুশী। বললে—অংশুদাকে লিখো তো বউদি আমি কত গয়না পেয়েছি! এছাড়া প্রথম পক্ষের ছেলে বউদের সঙ্গে পৃথক করে আলাদা সম্পত্তি দিচ্ছে। তোমাকে মেয়েটা বড্ড জ্বালাতন করত বলেই খবরটা জানালাম। তুমি কিন্তু ভালো করে পড়ো। 'লেখাপড়া করবে যেই নমিকে হয়তো পাবে সেই।' বুঝলে! বাবা বলেছে।

* * *

১৯৫২ সাল তখন পড়েছে।

তার জীবনের একটা মোড় ঘুরে গেল ওই অধ্যাপক পণ্ডিতের একটি 'ধর্ষিত' শব্দ অবলম্বন করে সীতা চরিত্রের ওই অদ্ভুত ব্যাখ্যা নিয়ে। সে তার প্রতিবাদ লিখে খ্যাতি পেয়ে গেল। কবিতা গান সে লিখত—এবার এই খ্যাতির সূত্র ধরে সেগুলি কাগজের পৃষ্ঠায় আত্মপ্রকাশ করতে লাগল।

তখনকার সব কবিতা তার নমিতাকে নিয়ে। মনে পড়ছে একটা কবিতায় পুরানো পদ্ধতিতে গোড়াকার অক্ষর ধরে উপর থেকে নিচের দিকে 'নমিতা আমার নমিতা' কথাটা লেখা ছিল।

"নদী ছুটে চলে সমুদ্র প্রেমে ভোর—
মিতার মতন তীর পাশে পাশে ছোটে;
তার সাধ শুধু তারই দুটি বাহুডোর,
আপন করিয়া বেঁধে রাখে দুই তটে।"

এইভাবেই ছিল নমিতা আমার নমিতা। টেলিফোনে নমিতাকে সে বলেছিল—কবিতাটা পড়ে দেখো, বলতে হবে কি আছে ওতে।

নমিতা ধরেছিল ঠিক।

সে তাকে বকেছিল। বলেছিল—এ সব কি হচ্ছে?

—কি হচ্ছে?

—জানিনে যাও। কিন্তু এসব করো না আর।

—কেন?

—দেখবে আমার দাদারা ঠেঙিয়ে দিয়ে আসবে। হেসে উঠেছিল নমিতা। হাসি থামিয়ে বলেছিল—কচিদি ধরে ফেলেছে—নমিতা আমার নমিতা। বুঝেছ?

—কেউ কিছু বলছিল নাকি?

—বলে নি তবে বলবে। আর করো না।

যে যা বলবে বলুক, অংশু থামে নি। সে গান রচনা করেছিল।

হঠাৎ একদিন শিবকিংকর দীর্ঘ চার বছর পর ওই গান যে কাগজে বেরিয়েছিল সেই কাগজ হাতে করে হাজির হয়েছিল।

সে খুব অখুশী হয়েই বলেছিল—তুমি ?

সে হেসে বলেছিল—হ্যাঁ—আমি।

—তুমি কেন এলে ?

—ওঃ তোর রাগ এখনও যায় নি!

সে চুপ করে অন্য দিকে তাকিয়েছিল—উত্তর দেয় নি।

—অতসী তোকে যেতে বলেছে।

—নাঃ! তুমি চলে যাও এখান থেকে।

শিবকিংকর রাগ করে না কখনও। সে বলেছিল—যাব—অতসী একটা কাজের জন্যে পাঠিয়েছে। আমাকে ফিরিয়ে দিলে সে নিজে এসে হাজির হবে।

এবার তাকে জিজ্ঞাসা করতে হয়েছিল—কি কাজ ?

—এই গান ? এ গান তোর লেখা ?

—হ্যাঁ আমার। আর একটা কথা; তোর নয় তোমার, তুই নয় তুমি বলে কথা বলবে।

—বেশ। তাই বলব। এখন এই গানের 'রাইট' অতসী কিনবে। কি নেবে তুমি বল ?

অবাক হয়ে গিয়েছিল সে। গানের রাইটের জন্যে টাকা!

শিবকিংকর বলেছিল—অতসী একখানা ছবি করছে। মানে প্রডিউস করছে। গানখানা কিনবে। আরও খানকয়েক গান লিখে দিতে বলেছে।

কলেজে তখন ফোর্থ ইয়ার। জীবনের মোড়টা আর একবার অতসী ফিরিয়ে দিলে। নমিতাকে ভালবেসেছিল—সেই ভালবাসাবশে তার হৃদয়ের উচ্ছ্বাস কাব্যে ধরা দিয়েছিল, তাই সমাদর করে কিনলে অতসী। চারখানা গান লিখে দিয়ে পেয়েছিল চারশো টাকা। একজন কবির প্রথম কাব্যের দাম হিসেবে সেটা কম নয়। তার সঙ্গে পেয়েছিল নাম। প্রতিষ্ঠা।

উদর চায় আহার, পেট পুরে আহার; তার সঙ্গে রসনা চায় রসের আস্বাদন। দেহ চায় দেহের সান্নিধ্য; তার সঙ্গে হৃদয় চায় প্রেমের স্পর্শ। না হলে খাওয়াও সত্য হয় না, দেহমিলনেও তৃপ্তি হয় না। তার বদলে ক্ষোভ হয়।

অতসীর দেহের স্বাদ তাকে একদা পাগল করেছিল, কিন্তু অতসীর প্রেমহীনতা সে স্বাদকে কটু করে তুলেছে তার কাছে।

সেই তিক্ততার স্মৃতিই তাকে রমলার দেহের স্বাদ গ্রহণ করতে দেয় নি। নিজের দিক থেকে তার লোভ ছিল। তার দেহের স্নায়ু শিরা রক্ত চঞ্চল হয়ে উঠেছিল কিন্তু তার হৃদয়

আর মন তাকে ধরে রেখেছিল, বেঁধে রেখেছিল।

নমিতার প্রেমে তখন সে ভোর হয়ে ছিল। বিচিত্র তার স্বাদ। দেহের স্বাদ থেকেও বোধ করি তার স্বাদ আরও মধুর।

এ মুহূর্তে পুরাণের দুটি নাম মনে পড়ে গেল।

দৈত্যরাজার কন্যা শর্মিষ্ঠা আর দৈত্যগুরুর কন্যা দেবযানী। দেবযানী ক্রীতদাসী করেছিলেন শর্মিষ্ঠাকে। রাজা যযাতিকে বিবাহ করে দেবযানী রাজপুরীতে এসেছিলেন—সঙ্গে শর্মিষ্ঠা এসেছিলেন ক্রীতদাসী হয়ে। কিন্তু শর্মিষ্ঠা প্রেমের বলে রাজাকে জিতে নিয়েছিলেন। দেবযানী ধর্মপত্নী হয়েও তাঁকে পান নি।

শর্মিষ্ঠা প্রেম—দেবযানী মানবীদেহ। বিবাহ তো মানুষ একটি মানুষীকে তার মানুষী দেহের জন্যেই করে থাকে। তার যৌবন তার রূপই তো তাকে আকর্ষণ করে।

* * *

১৯৫২ সালের তখন শেষ। তার চারখানা গানের রেকর্ড বেরিয়ে গেল।

ভোরের আলোয় ফোটা ফুলের মত
আমার প্রেমে ধন্য যে-জন হবে
ফেলবে খুলে অঙ্গ হতে রত্নমালা যত।
এগিয়ে এসে আমার মালা আপন কণ্ঠে লবে—

এ গানখানা হিট্ হয়ে গিয়েছিল।

নমিতাদের বাড়িতে এ গানখানার খুব সুখ্যাতি হয়েছিল। আরও অনেক বাড়িতেই হয়েছিল কিন্তু তার কাছে নমিতাদের বাড়িতে পাওয়া খ্যাতির দাম ছিল আলাদা। অমিতা শমিতা তাদের সঙ্গে নমিতাও সেতার রেখে এ গানখানা রেকর্ড বাজিয়ে শিখে নিয়েছিল।

ও বাড়ির বউদের কাছেও তার খ্যাতি আশ্চর্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল। দাদার শাশুড়ী গম্ভীর লোক। খুব হিসেবী মানুষ। তিনিও বলেছিলেন—তাই তো অংশু, তোমার তো খুব নাম করছে গো লোকেরা! আমার পিসতুতো বোন, আমার থেকে ছোট বয়সে। তার এসবে খুব বাতিক। জান—কালিদাস রায়, কুমুদ মল্লিক, প্রেমেন মিত্তির আরও সব কে কে বটে বাপু—তাদের চিঠি লেখে। কাজী নজরুলের বাড়ি মধ্যে মধ্যে গিয়ে ফুলটুল দিয়ে আসে। সে বলছিল, ভাল হয়েছে। আর রেকর্ড নাকি খুব বিক্রী হয়েছে। খুব। তা তুমি কি পেলে? বলছিল উনি বোধ হয় ফাঁকিই পড়েছেন। কমিশনের কথা থাকলে অ—নে—ক টাকা পেতে। তা এবার থেকে তুমি বাবুর সঙ্গে পরামর্শ করো। বুঝেছ—। ব্যাবসাদার মানুষ তো। ওঁকে ফাঁকি দেওয়া সহজ নয়!

পৃথিবী আশ্চর্য।

কোন একটি মানুষের যে কোন ক্ষুদ্র একটি ঘটনার ওপর বোধ হয় সারা পৃথিবীর ঘটনার ছাপ পড়ে।

নমিতার বাবা খুশী হন নি। ঠিক এই সময়েই উপর থেকে নীচে নেমে আসছিলেন।

তাকে দেখে বলেছিলেন—আরে তুমি! কাল থেকে তোমাদের কথা ভাবছি হে। তোমার কথা, তোমার দাদার কথা! তোমার দাদা তো উকীল হয়ে কিছু করতে পারলে না। বাড়ি থেকে চাল নিয়ে গিয়ে খায় বর্ধমানে। তুমি সব কি গান-ফান লিখছ। এদিকে যে কংগ্রেস জমিদারি উচ্ছেদ করবে ঠিক করেছে। কোন দিকে হালে পানি না পেয়ে, নে—ওই জমিদার বেটারা আছে—নেহাত বিয়ে করা সেকেলে পরিবারের মত—তাদের যা আছে কেড়েকুড়ে নিয়ে দেখিয়ে দে কেমন দেশসেবা হচ্ছে। রাবিশ! জমিদারি গেলে চলবে কি করে তোমাদের? ওসব গানটান লেখা ছাড়। ছেড়ে বেশ ভাল করে পাস কর। একটা হাই লেবেলের অফিসার হয়ে যাও—!

জমিদারি উচ্ছেদ করছে কংগ্রেস, এ খবরটা সে নমিতার বাবার কাছেই পেয়েছিল। কিন্তু তাতে সে ঘাড় ভেঙে পড়ে পড়াশুনো করে বি-এ পরীক্ষায় স্ট্যাণ্ড করবার মত প্রেরণা পায় নি। তার বদলে বিচিত্র সূত্রে দুটি অতিবিচিত্র ঘটনার কথা জানতে পেরে প্রথম তাই নিয়ে লিখেছিল একটি গল্প—কিন্তু লিখে তৃপ্তি হয় নি বলে তাই থেকে লিখেছিল একটি একাঙ্কিকা।

একটি ঘটনার কথা জেনেছিল একজন ডাক্তার সেনের কাছ থেকে। নমিতার এক বান্ধবীর কাকা। উত্তর কোরিয়া দক্ষিণ কোরিয়ার যুদ্ধে ভারতবর্ষ থেকে মেডিক্যাল মিশনের সঙ্গে গেছলেন। নমিতা তাকে বলেছিল, তার বান্ধবী তার সঙ্গে আলাপ করতে চায়—সে ওই রেকর্ডের জন্যে। চায়ে নেমন্তন্ন করেছিল। সেখানে গিয়ে আলাপ হয়েছিল তার কাকা ডাক্তারের সঙ্গে। দিলদরিয়া মেজাজের লোক। মতবাদে হয়তো কম্যুনিস্ট অথবা মার্কিনী। মোট কথা এদেশী মানুষ কোনমতে নন। তা হোক। ভালো গল্প বলেন। অংশু গল্প লেখে শুনে কথায় কথায় ফ্রয়েড ওঠে, এবং তা থেকে ডাঃ গিরীন্দ্রশেখর বোসের কথা উঠেছিল। ডাঃ সেন তাকে ডাঃ বোসের চিকিৎসা সম্পর্কে তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে একটি বিচিত্র গল্প বলেছিলেন।

বিচিত্র পৃথিবীর সূত্র। তার গানের সূত্র ধরে তাকে ডেকেছিল নমিতার বান্ধবী এবং তার কাকার সঙ্গে নর্থ কোরিয়া সাউথ কোরিয়ার সূত্র ধরে সে পেয়েছিল একটি জমিদারের ছেলে এবং একটি নার্সের বিচিত্র কাহিনী। নার্স মেয়েটিকে এই জমিদারের ছেলেকে নার্সিং করতে হয়েছিল এক জটিল পথে। তার সঙ্গে প্রেমের অভিনয় করে নিজের প্রতি ছেলেটিকে আকৃষ্ট করতে হয়েছিল। ফল তাতে হয়েছিল, কিন্তু এই নার্সটি পড়েছিল তার প্রেমে। অথচ মেয়েটি ছিল অত্যন্ত প্রগল্‌ভা এবং স্বৈরিণী অপবাদও ঠিক অসত্য ছিল না। তরুণ ডাক্তারদের সঙ্গে প্রেমের-খেলা খেলা তার একটা বিলাস অথবা প্রকৃতিধর্ম ছিল। মোটা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে সে এই কাজ নিয়েছিল। এবার আর প্রেম করা তার খেলা ছিল না, এবার ছিল নার্সিংয়ের অঙ্গ। অর্থাৎ ওই মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত ছেলেটিকে বিশ্বাস করাতে হয়েছিল যে সে তার সঙ্গে সত্যই প্রেমে পড়েছে। ঘটনা-বৈচিত্র্য এই যে, মেয়েটি এবার প্রেমের-খেলা খেলতে গিয়ে সত্যসত্যই প্রেমে পড়ল এই মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত তরুণটির সঙ্গে। তরুণটি সেরে উঠল। মেয়েটি তার প্রাপ্য নিলে বটে কিন্তু সে চোখের জলে ভেসেই নিলে এবং এরপর কোথায় যে চলে গেল কেউ জানে না।

আর একটি গল্প শুনেছিল নমিতাদের বাড়িতে। ওদেরই দূরসম্পর্কের আত্মীয়বাড়ির একটি মর্মান্তিক ঘটনা।

কলকাতার দক্ষিণে এক বর্ধিষ্ণু ঘরের একটি ছেলে। একটি ছেলে বললেই সব বলা হল না; ওই বাড়ির একমাত্র উত্তরাধিকারী। তরুণ বয়স, উজ্জ্বল চেহারা; লেখাপড়ায় মাঝারি কিন্তু বাঁশী বাজাতো গান গাইতো বড় ভালো। সংসারে একমাত্র বিধবা দিদি ছাড়া আর কেউ ছিল না। এক বছর আগে ছেলেটির বিয়ে হয়েছিল। বিয়ের পর বর বউ আসছিল নৌকোয়। ছেলের দিদি ব্যবস্থা করেছিলেন আলো জ্বালিয়ে শোভাযাত্রা করে ব্যাণ্ড ব্যাগপাইপ বাজিয়ে বর কনেকে গ্রাম ঘুরিয়ে বাড়িতে বরণ করবেন। সে-দিন কালরাত্রি। বর কনেতে দেখা হতে নেই। তার জন্য দুখানা পালকির ব্যবস্থা করেছিল। কিন্তু বিকেলের দিকে জল ঝড় হয়েছিল বলে বর কনের নৌকো এসে পৌঁছুতে খানিকটা রাত্রি হয়ে গিয়েছিল। এবং গ্রামের রাস্তাঘাট সে জলে ঝড়ে এমন বিপর্যস্ত হয়েছিল যে কলকাতার দক্ষিণের গাঙের ধারের গ্রাম্য রাস্তা পিছল হয়ে পড়েছিল। সেই কারণে বর কনেকে সতর্ক পাহারার মধ্যে ঘাটেই দুখানা স্বতন্ত্র নৌকোয় রাখার ব্যবস্থা করেছিলেন দিদিটি। কারণ সে-রাত্রিটা ছিল কালরাত্রি। সকালে আলো বাদ দিয়ে শোভাযাত্রা করে বর কনেকে গ্রাম প্রদক্ষিণ করিয়ে দেবতাদের দোরে দোরে প্রণাম করিয়ে ঘরে তুলবেন ঠিক করেছিলেন। কিন্তু রাত্রে এ নৌকোয় বর ও নৌকোয় কনে এই বিংশ শতাব্দীর একান্নতম বৎসরে কালরাত্রির বিরহ মান্য করতে প্রস্তুত ছিল না। তাদের চোখে ঘুম ছিল না—তারা জেগেই বসেছিল। আকাশে ছিল পূর্ণিমার চাঁদ। নদীতে ছিল বড় জোয়ার। নৌকোর সকলেই যখন ঘুমিয়েছে তখন দুই নৌকোর বাইরে পাটাতনের উপর এসে দাঁড়িয়েছে তারা। বর বাজাচ্ছিল বাঁশী, বউ মৃদুস্বরে গাইছিল গান। জোয়ারের ঢেউয়ে ঢেউয়ে নৌকো দুখানা পাশাপাশি যেন তালে তালে দোল দিচ্ছিল। একসময় বর তাকে ডেকেছিল—এস আমার নৌকোয়।

কনের নৌকো কালরাত্রিতে মিলিত হবার পক্ষে অনুকূল ছিল না। কনের সঙ্গে ছিল কনের বাড়ির একজন ঝি এবং বরের বাড়ি থেকে এসে রাত্রিকালে বউ আগলাচ্ছিল বরের সম্পর্কিত দুই বোন। তাদের মধ্যে একজন বয়স্কা।

—'এস আমার নৌকোয়' বলে বর বাড়িয়ে দিয়েছিল হাত। নৌকো দুখানা একেবারে পাশাপাশি, দুখানার দুই কিনারা পরস্পরের গায়ের সঙ্গে মিলে লেগেছিল। কিন্তু দুর্ঘটনা ঘটে বিস্ময়কর অভাবনীয় পথে। যা ভাবা যায় না তাই ঘটে বলেই অনিবার্যভাবে ঘটে যায় অ্যাকসিডেন্ট। বউ যে মুহূর্তে আসবার জন্যে এক পা বাড়িয়েছে ঠিক সেই মুহূর্তটিতেই উঠেছে একটা বড় ঢেউ। নৌকো দুখানা পরস্পরের গায়ে ঠোকা খেয়ে পরস্পর থেকে দূরে সরে গেল দুই উলটো দিকে এবং বউটি 'ওগো' বলে মর্মান্তিক এক আর্তনাদ করে পড়ে গেল জোয়ারের তুফানে। সঙ্গে সঙ্গে বর তার বাঁশী রেখে দিল ঝাঁপ। তারপর মাঝি মাল্লারাও ঝাঁপিয়ে পড়ল। কোলাহল উঠল। হইচই হল। ফল হল—বরকে পাওয়া গেল অজ্ঞান অবস্থায় কিন্তু বউকে পাওয়া গেল না। একদিন পর তাকে পাওয়া গেল কিনারার একটা

বাঁকে।

বর ছেলেটিও কঠিন আঘাত খেয়েছিল বুকে কিন্তু বাঁচল। তবে সে বাঁচা শুধু নামেই বাঁচা। ভগ্ন দেহ তার সঙ্গে অসুস্থ মন। তার ধারণা তার সেই বউয়ের আত্মা ঘুরে বেড়ায় এবং তাকে ডাকে। ওগো, ওগো বলে সে ডাক সে শুনতে পায়। কান পেতে থাকে সে। এইভাবেই চলছিল। হঠাৎ সেদিন সে মারা গেছে। এই মৃত্যুর মধ্যেও আছে তার খানিকটা বৈচিত্র্য। বৈচিত্র্য না বলে ছেলেটির অসুস্থ মনের অদ্ভুত সংস্কারের অনিবার্য পরিণতি বলাই ভাল। এক বৎসর পূর্বের তার সেই কালরাত্রির এক বৎসর পূর্ণ হল যেদিন সেদিন সে দিদিকে বললে—আজ তার বউ নিশ্চয় আসবে। সে সেজেগুজে বাসর সাজিয়ে বসে বাঁশী বাজাবে তার শোবার ঘরে। তার দৃঢ় বিশ্বাস তার বাঁশী শুনে তার বউয়ের আত্মা আসবে এবং তাকে হয়তো নিয়ে যাবে।

কারুর কোন বারণ সে শোনে নি। সে বাঁশী বাজিয়েছিল ডাক্তারের নিষেধ অমান্য করে এবং তার ফলে সে মারা গেছে।

ঘটনাটা আজ হোক কাল হোক ঘটবে এইটে প্রায় নিশ্চিতরূপেই স্থির ছিল। তবু সেইটে এইভাবে ঘটবে এমনটা কেউ ভাবে নি। এর মধ্যে অনিবার্যতার দুঃখের চেয়ে কিছু যেন বেশী ছিল যা এমন সকরুণ ঘটনাটিকে সুন্দর করে তুলেছে।

* * *

ঘটনা দুটো মনের মধ্যে অহরহ কয়েক দিন ঘুরতে ঘুরতে একসঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছিল। একটা মনে পড়লেই আর একটা মনে পড়ত। তার ফলে একটির শিকড় এবং অন্যটির ডালে জোড় বেঁধে একটি আশ্চর্য রোমান্টিক কাহিনীতে পরিণতি লাভ করে প্রথমে বেরিয়েছিল গল্প হয়ে—তারপরই তাই নিয়ে সে লিখেছিল একটি একাঙ্কিকা।

একাঙ্কিকা লিখিয়েছিল তাকে শিবকিংকর।

তার জীবনের সঙ্গে আশ্চর্যভাবে জড়িয়ে আছে সে। সে তাকে ডাকে না, সে তাকে চায় না তবু সে আসে, নিজে থেকে আসে। অতসীর খবর আনে, অতসীর অনুরোধের কথা বলে। অতসী তার অতীত জীবনের পুরনো কালের পাপ, তাকে সে যত পিছনে ফেলে এগিয়ে যেতে চায় তত সে তার পিছনে পিছনে এসে ওই শিবকিংকরকে দিয়ে তাকে ডাকে, তাকে ধরে। এদিকে নমিতা তার নতুন কাল। না—ভুল। নমিতা নতুন কাল নয়, ছদ্মবেশী নতুন কাল, সিউডো নতুন কাল। নতুন কাল সেজে এসে তাকে সেই পুরনো কালেই নিয়ে যেত। তার বাপ-ভাইয়েরা ছিল যুদ্ধের সময় কালোবাজারী। তারপর স্বাধীনতার পর কিছুদিন চুপ করে থেকে ভোল পালটে আজ সেজেছে প্রগতিশীল।

অতসী, পাপ অতসী। না—পাপ বলতে সিন্—sin নয়। Sinএ সে বিশ্বাস করে না। Crimeএও বিশ্বাস করে না, তবে crimeকে মানে। অতসী crime তো বটেই, crime থেকেও কিছু বেশী। তবু পাপই অতসীর একমাত্র বিশেষণ। নমিতা তার থেকেও বেশী।

অতসী তার ওই গল্পটা পড়ে শিবকিংকরকে পাঠিয়েছিল—গল্পটা সে ছবির জন্য কিনবে।

নমিতা তাকে বলেছিল—তুমি ওটা নিয়ে নাটক কর। তুমি বুরের পার্ট করবে, আমি বউ আর নার্সটার পার্ট করব। লুকিয়ে করব। বুঝলে আমাদের বাড়ির কাউকে জানতে দেব না। ছোট একটা হল ভাড়া করে—।

তা কিন্তু হয় নি। তার বদলে যা হল তার ফলে জীবনটা সোজাসুজি ঢালের পথেই মূল গঙ্গাধারার মতই বয়ে গিয়েছিল; যাকে দেশের লোক বলে 'কীর্তিনাশার ধারা'; লোকপরম্পরায় যে ধারা সম্পর্কে প্রবাদ আছে যে ওই ধারায় স্নান করলে পুণ্যক্ষয় হয়।

হঠাৎ নমিতা জীবনের ধারার খাত বদল করলে যেন। ইদানীং নমিতাদের বাড়ির বাইরেও তাদের দেখাশোনা হত। ওই যে ডাঃ সেনের ভাইঝি—নমিতার বান্ধবী, তার বাড়িতে হত। মধ্যে মধ্যে দুপুরবেলার শোয়ে সিনেমা হলে হত। টেলিফোন নিত্যই হত কোন কোন দিন এবেলা ওবেলা দু'বেলাও হত। হঠাৎ একদা অংশুমান আবিষ্কার করেছিল গতকাল একবারও টেলিফোন করে নি নমিতা। তার দিক থেকে টেলিফোন করার ঠিক উপায় ছিল না। কারণ কাকে টেলিফোন করবে? কি বলবে? এই আধুনিক ধনীদের বাড়ির বাঁধন ওখানে ঠিক আছে।

পরের দিনও টেলিফোন পায় নি। তৃতীয় দিনের সন্ধ্যেবেলা সে অজুহাত একটা খুঁজে নিয়ে দাদার শ্বশুরবাড়ি গিয়ে দেখেছিল বাড়ি প্রায় ফাঁকা; গোটা বাড়িটাই প্রায় চলে গেছে দেশভ্রমণে। সেই উত্তর সীমায় শ্রীনগর থেকে দিল্লী আগ্রার চারিদিকের অঞ্চল সবটাই সে ভ্রমণের এলাকায় পড়বে। হরিদ্বার মথুরা বৃন্দাবন এসব স্থানেও যাবেন তাঁরা। ওদিকে পুষ্কর কুরুক্ষেত্র সাবিত্রী পর্যন্তও যেতে পারেন। একটা ভালোরকম যোগাযোগ হয়েছিল। সারা ভারতের রেল বিভাগের একজন চিত্রগুপ্ত-জাতীয় কর্মচারী সপরিবারে ভ্রমণে বের হচ্ছেন। নমিতার বাবা তাঁর বন্ধু। তাঁর ট্রাঙ্ককলে ব্যবসা সংক্রান্ত কথা বলতে গিয়ে এই ভ্রমণের কথা জানতে পেরে বলেছিলেন—আমায় বললেন না। আমি যেতাম আপনাদের পিছু পিছু। সঙ্গে সঙ্গে সাগ্রহ নিমন্ত্রণ এসেছিল—"আসুন—কালই চলে আসুন। পারেন না? তার পরের সব ব্যবস্থা আমি করব।"

দাদার শ্বশুর সেল্‌ফ্‌ মেড ম্যান, তিনি বলেন—ফ্রম এ সচ্ছল চাষী গেরস্থ পরিবার টু দি হেড অফিস অব টোয়েন্টি-থ্রি লিমিটেড কম্পানীজ। ফ্রম লগ কেবিন টু হোয়াইট হাউসও যদি কোন দিন হয় তাতে আশ্চর্য হবে না কেউ। অন্ততঃ আমি তো হবই না। বাট্‌ ইউ সি—। আমার ভাল লাগে না। নইলে আমার ডিকশনারীতে অসম্ভব শব্দটি আমি ঘষে তুলে দিয়েছি।

দাদার শ্বশুর 'কালই' যেতে পারেন নি। পরশুই রওনা হয়ে গেছেন—সঙ্গে গেছে তাঁর স্ত্রী, তিন কুমারী কন্যা এবং মেজছেলে, মেজবউ এবং ছোটছেলে। ফিরবেন কবে তার ঠিক নেই তবে মাস দুয়েক যে হবে তাতে সন্দেহ নেই।

দাদার বড়শালাজ অর্থাৎ বড়শালার স্ত্রী, ও বাড়ির বড়বউদি—তিনি এদেশের সেই সব মেয়েদের একজন যাঁরা বছর তিরিশেক বয়সে পাঁচ-ছ'টি ছেলেমেয়ের মা হয়ে আধহাত চওড়া

হাতীপাঞ্জাপেড়ে শাড়ি ঢলঢলো করে পরে প্রবীণা এবং ভারিক্কী হয়ে পড়েন। তিনি বলেছিলেন —এখন মাস দুই আড়াই মন দিয়ে পড়াশোনা করগে। এবার তো তোমার পরীক্ষার বছর।

সেই তার ও-বাড়িতে শেষ যাওয়া। এর পর আর যায় নি। কারণ দু মাস পরই সে খবর পেয়েছিল দেশে ফিরেই দাদার শ্বশুর তাঁর দুই কন্যার বিবাহ দিচ্ছেন। অমিতার এবং নমিতার—পাত্র দুটিই দিল্লীর সরকারী দপ্তরের চাকরে; ওই রেলদপ্তরের ভদ্রলোকের পুত্র এবং ভ্রাতুষ্পুত্র। দুজনেই কুলীন—বিলাতফেরত।

* * *

না। সে মদ খেতে ধরে নি। ঠিক হল না। অতসীকে নিয়ে মায়ের বিরুদ্ধে প্রথম বিদ্রোহের সময় থেকেই সে মধ্যে মধ্যে মদ খেয়েছে। মদ খেলে কোন অন্যায় হয় না বা মদ খেয়ে অন্যায় হয় এইটে সে মানে না তাই প্রমাণ করবার জন্য খেয়েছে। লোকের কাছেও সে প্রমাণ করতে চায় নি। নিজের কাছেই প্রমাণ করতে চেয়েছিল। হঠাৎ কোন কোন দিন তার মনে একটা সংশয় জাগে। মনে হয় যে সে আগের কালের সেই গোঁড়া ধর্ম এবং গঙ্গাজলে ধোওয়া রাজনীতির গোবরমাটি-নিকোনো খামারবাড়িতেই পোষা পায়রার মত ঝরা ধান খেয়ে বেড়াচ্ছে; আকাশে উঠে পাক খেয়ে ডিগবাজি খেয়ে চক্কর মেরে কসরত যাই দেখাক মোটামুটি নজর তার কাবুর দিকে। এইটে মনে হলেই এমনিভাবে সে নিজের কাছেই নিজে প্রমাণ করতে চায় যে, সে পোষা কবুতর নয়, সে বাজপাখী—লক্ষ্য তার উদয়-দিগন্তের দিকে। সেখানে পৌঁছুনোর আগে পাখা সে বন্ধ করবে না।

তার জীবনের সব আনুগত্য আজ সন্ধানহীন নেতাজীর প্রতি। কেবল একটি কারণে প্রধানমন্ত্রী নেহেরুকে সে ধন্যবাদ জানায়। নেহেরুজী গান্ধীবাদের গোঁড়ামির এবং ভ্রান্ত আদর্শগুলোকে সুকুশল নৈপুণ্যের সঙ্গে এদেশের জীবনের উপর থেকে সরিয়ে দিয়েছেন।

নমিতার এই বিয়ের খবরের বিশদ বিবরণ সে পেয়েছিল মিস সেনের কাছে। নমিতার বান্ধবী মিস সেন। স্মৃতি সেন। দেখা হয়ে গিয়েছিল একটা স্টুডেন্টস্ র‍্যালিতে। সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে ছাত্র সমাবেশে সে সেদিন বক্তৃতা করেছিল।

আজ এই ১৯৪২ সালে ঠিক মনে পড়ছে না র‍্যালিটা ছিল কিসের জন্যে। কিন্তু বিশ্বরাজনীতি এসে পড়েছিল একেবারে শুরু থেকেই।

স্টুডেন্টস্ ফেডারেশনের জোরটা সেইই ১৯৪২।৪৩ থেকেই ছাত্রজগতে অনন্তমূলের মত মূলজাল বিস্তার করে রেখেছে। গ্রীষ্মে শীতে শুকনো শুকনো দেখায় কিন্তু বর্ষা এলেই সে মাটির ভিতরের শুকনো শিকড় জল শুষে সতেজ হয়—সঙ্গে সঙ্গে ঢেকে ফেলে মাটির বুক। তাদেরই একজন প্রথম শ্রেণীর বক্তা শুরু করেছিল বক্তৃতার এই ধারা।

সে সেদিন ক্ষুব্ধ হয়েই ছিল। সে ক্ষোভ তার নমিতার জন্য। সেই ক্ষোভ বিচিত্রভাবে, এই একটি ফাটল দিয়ে মাটির বুকের চাপা আগুন যেমন বেরিয়ে আসে তেমনিভাবেই বেরিয়ে এসেছিল।

চীন, ফরমোজা, নর্থ কোরিয়া, সাউথ কোরিয়া, নর্থ ভিয়েৎনাম, বার্মা, ইন্দোনেশিয়া, ইউনাইটেড আরব, মাও সে-তুঙ, চিয়াং কাইশেক, হো চি মিন, উনু, সুকার্ণো, কর্নেল নাসের, ইরান, ইরাক নিয়ে এক নয়া দুনিয়ার ছবি এঁকে পুরানো পৃথিবী পুরানো সমাজকে বরবাদ ঘোষণা করে গালাগালি দিয়েছিল, অভিসম্পাত দিয়েছিল ভ্রান্ত অহিংসাপন্থী এবং সর্বক্ষেত্রে ব্যর্থ ভারতবর্ষের বর্তমানকে। যার মধ্যে তার মনে মনে বার বার ভেসে উঠছিল তার মায়ের মুখ, তার দাদার শ্বশুরের মুখ, নমিতার মুখ, তার সঙ্গে বারকয়েক অতসীর মুখও বোধ হয় ভেসে উঠেছিল।

এই সমাবেশের মধ্যে গান গাইতে এসেছিল যারা তারই মধ্যে ছিল মিস সেন। স্মৃতি সেন। রুক্ষ চুল, ধূলিধূসর মুখ, পারিপাট্যহীন অথচ অপরিসীম এক আকর্ষণ তার সাজসজ্জায়, মেয়েটিকে দেখে প্রদীপ্ত মনে হচ্ছিল। অন্যেরা তার কাছে যে ম্লান ছিল তা ছিল না তবু তার পরিচিত মুখ তাকে আকৃষ্ট করেছিল বেশী। মিস সেনও তাকে লক্ষ্য করেছিল ওই পরিচয়েরই আকর্ষণে। সেও এই দলে খুব একটা বেশী অভ্যস্ত ছিল না। নতুন এসেছে। হাতেখড়ি নিচ্ছে। বিদেশী গানের সুর টান ওর গলায় ভাল ওঠে, ওই গান জানে বলেই তাকে এই বিশেষ ক্ষেত্রের জন্য রিক্রুট করা হয়েছে। অনেকেই বেশ ভাল বলেছিল। তার মধ্যে অংশুমান একজন।

বক্তৃতার শেষে সে বেরিয়ে এসে একটু নিরিবিলিতে সিগারেট ধরিয়ে টানছিল সেই সময় স্মৃতি এসে তাকে বলেছিল—আপনি তো বেশ চমৎকার বলেন অংশুবাবু।

একটু তিক্ত হেসে সে বলেছিল—ভাল লাগল?

—চমৎকার লাগল।

সে উত্তর দেয় নি। স্মৃতি একটু যেন কথা খুঁজে নিয়ে বলেছিল—আপনি সুন্দর গান লেখেন—সুন্দর গল্প লেখেন—এমন বক্তৃতা করেন—এমন চেহারা আপনার—আপনাকে ছেড়ে দিয়ে নমিতা ওই একটা চাকরে বাজে-মার্কা লোককে বিয়ে করতে গেল। এম-এ পাস করে আপনিও একটা বড় চাকরি পেতে পারবেন। না হলই বা সরকারী। পলিটিক্যাল লীডার হতে পারতেন।

অংশু বলেছিল—আমাকে ধরেছিল তা আপনাকে কে বললে?

—কে বলবে? এ আবার বলতে হয় নাকি? তবে ওর কথা ও আমাকে নিজেই বলেছিল। কি বলেছিল জানেন?

—কি?

—বলেছিল বাবা ওর সঙ্গে বিয়ে না দিলে লুকিয়ে বিয়ে করে ফেলব। অথচ—

—অথচ কি?

—অথচ আর কি? খুব খুশী বিয়েতে।

—খুব খুশী?

—ওরে বা-প-রে! বরের গল্প আর ফুরোয় না আমার কাছে। এই এতো টাকা মাইনে হবে। তিন হাজার পর্যন্ত। ফরেন সার্ভিসের চান্স আছে। তা হলে তো একেবারে

কথাই নেই। পৃথিবীর দেশে দেশে ঘুরবে। আমি তাও বললাম—তাহলে অংশুবাবুর সঙ্গে এমন করে ঢলাঢলি করলি কেন? বললে—ঢলাঢলি? ঢলাঢলি কোথায় করলাম! বললাম—প্রেম তো করছিলি? বললে, করছিলাম। কিন্তু সে তো এমন কতই হয়। তা ছাড়া বাবা-মা এদের কথা আছে। হাজার হলেও আমাদের হিন্দুর ঘর তো!

এই সময়েই রমেশ তাকে ডেকেছিল, শোন, ডাকছে তোমাকে।

—কে?

—বড় বড় লোক।

* * *

সত্যিই তাকে বড় বড় লীডারেরা ডেকে প্রশংসা করে স্টুডেন্টস্ মুভমেণ্টে তাঁদের দলে যোগ দেবার জন্ম ডেকেছিলেন। হয়তো সে তাঁদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে ঝাঁপিয়েই পড়ত সে মুভমেণ্টে। কিন্তু ঝাঁপিয়ে পড়তে দেয় নি তাকে ওই স্মৃতি মেয়েটি আর তার লেখা সেই রামায়ণ প্রসঙ্গ নিয়ে লেখা প্রবন্ধটি। স্মৃতিই তাকে লেখক অংশুমান চৌধুরী বলে পরিচিত করে দিয়েছিল। সেই কানে তুলে দিয়েছিল যে সে খুব ভাল লেখে। এবং এই পরিচয় থেকেই প্রশ্ন করেছিলেন লীডারেরা—এ কোন্ লেখক অংশুমান চৌধুরী? রামায়ণের 'ধর্ষিতায়াং সীতায়াং' শব্দ নিয়ে যে প্রগ্রেসিভ গবেষণা হয়েছে যাকে যুগান্তকারী বলা যায়—সেই গবেষণার প্রতিবাদে যে-লেখক অংশুমান চৌধুরী সমগ্র রামায়ণে কতবার ধর্ষিত শব্দ ব্যবহার হয়েছে এবং কোথাও ধর্ষিত বা ধর্ষণ বলাৎকার অর্থে ব্যবহৃত হয় নি দেখিয়েছে ও পরবর্তী সুন্দরকাণ্ডে রাবণের উপর ব্রহ্মার অভিশাপের কথা তুলে ধরে সীতার দেহগত সতীত্ব নিয়ে মাথা ঘামিয়েছে, এ কি সেই অংশুমান চৌধুরী? এ তো একটি ছেলেছোকরা বললেই হয়। তার আপাদমস্তক দৃষ্টি দিয়ে লেহন করে একজন নেতা প্রশ্ন করেছিলেন—এসব নিয়ে মাথাব্যথা কেন?

সে ভ্রূ কুঞ্চিত করে বলেছিল—মিথ্যের প্রতিবাদ করব না?

—সত্যি-মিথ্যে তুমি বোঝ?

—বুঝি বইকি।

—না। বোঝ না।

—মানে?

—মানে যাকে সত্য বলে এতকাল জেনে এসেছ তার কোনটাই সত্য নয়। সত্যকে নতুন করে জানতে হবে, বুঝতে হবে।

—কি বলছেন আপনি?

—বলছি। বুঝিয়ে দিচ্ছি। বল না, সূর্য রথে চড়ে পূর্বদিকে উঠে সারাদিনে পশ্চিমদিকে অস্ত যায়, না পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘোরে? বল না, ভূমিকম্প হয় বাসুকিনাগ মাথা নাড়লে না অন্ম কারণে? বল?

সে খানিকটা ভড়কে গিছল। তারপর বলেছিল—তাহলে আগে রাবণ দশটা মাথা কুড়িটা হাত নিয়ে কি করে কাত হয়ে শুতো বা ক'খানা থালা নিয়ে খেতো এবং ক'টা পাকস্থলী তার ছিল গবেষণা করতে বলব। বিজ্ঞানের সত্য আর দর্শনের সত্য এক নয়।

বিজ্ঞানে স্বর্গ নেই—দর্শনে আছে। কল্পনাই এখানে শ্রেষ্ঠ সত্য।

চলে এসেছিল সে। তার স্বভাবমতই কাজ করেছিল। পার্টি পার্টির মত কাজ করেছিল—কলেজ ইউনিয়নে সে নমিনেশন পায় নি। কিন্তু সে তাতে পিছিয়ে আসে নি। জেদ করেই ছাত্র মুভমেণ্টে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। এবং ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ক্যাণ্ডিডেট হিসেবেই বেশ ভালো ভোটে জিতে নির্বাচিত হয়েছিল।

তার উত্তপ্ত চিত্তলোকে অবাধ ঝড় বয়ে গিয়েছিল পুরো পাঁচ বছর। ১৯৪২ সাল থেকে ১৯৫৩সাল পর্যন্ত। বি-এতে আরও এক বছর। ইউনিভারসিটিতে এসে পুরো চার বছর। ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত। তখন আকাশে স্পুটনিক পৃথিবীকে বেষ্টন করে পিপ্ পিপ্ আওয়াজ করে ঘুরছে। আমেরিকা লজ্জায় মাথা কুটছে। ওদিকে বিকিনীতে অ্যাটম বোমার পর অ্যাটম বোমা ফাটছে। বৃষ্টির সঙ্গে পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ বিষ এসে পৃথিবীকে বিষাক্ত করছে। সুয়েজ নিয়ে একটা নাটকীয় দৃশ্য হয়ে গেছে একেবারে প্রথম দিকে; ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্সের গালে চড় মেরে নাসের সুয়েজ ক্যানেল কেড়ে নিয়েছে। বুড়ো সিংহের একথামচা কেশর খসে পড়ে গেছে সে চড়ের আঘাতে। রাশিয়ায় মেলেনকভ গেছেন, বেরিয়া গেছেন, (স্টালিন তার আগেই গেছেন), বুলগানিন এসেছেন—তার পিছনে পিছনে ক্রুশ্চেভ এসেছে। এদেশে আর একটা ইলেকশন হয়ে গেছে। তাতেও কংগ্রেস জিতেছে সর্বত্র। বি-পি-সি-সির প্রেসিডেণ্ট হয়েছেন অতুল্য ঘোষ। লোকে বলছে লোহার মনুষ্য বা পাথরের মনুষ্য। এর মধ্যে ধন্যবাদ জনাব রফি আহমেদ কিদোয়াইকে—তিনি কেন্দ্রে খাদ্যমন্ত্রী হয়েই রেশনিং তুলে দিয়েছেন। চালের দর কিন্তু নামে নি। বাংলাদেশের খাদ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল সেন কিছুটা বেকার হয়ে পড়েছেন।

বিগত কালের নেতারা পঞ্জিকা ফলের গ্রহদের মত একের পর এক অস্ত যাচ্ছেন।

তিব্বতের অভিভাবকত্ব গ্রহণ করেছে চীন সরকার। ১৯৫৪ সালে মে মাসে দলাইলামা এবং পাঞ্চেনলামা পিকিংয়ে গেছিলেন First National কংগ্রেসে যোগ দিতে। দলাইলামা বুদ্ধের অবতার হিসেবে নয়। জনগণের ডেপুটী হিসেবে।

১৯৫৬ সালে হয়ে গেল বান্দুং কনফারেন্স।

নেহেরু আনলেন 'পঞ্চশীল'। ভারতবর্ষেরই পঞ্চশীল; নেহেরু কিন্তু ওটা ধার নিলেন ইন্দোনেশিয়ার কাছে। আচার্য কৃপালনী বললেন পাঁচটি দুর্বোধ্য মূর্খতা নয় মূর্খামি। মোট কথা এই কয়েকটা বছরে সব কিছুর মানে যেন বদলে গেল। সব কিছুর রঙ যেন পালটালো।

অংশুমান একটা কবিতা লিখেছিল—

আকাশের মহাশূন্যে স্পুটনিক ঘোরে
অ্যাটমিক বোমার ধুলো হয়ে হারিয়ে যাওয়া
আকাশে চারিয়ে যাওয়া
প্রভু পিতা অথবা নেহাতই ভাঁওতা
ঈশ্বরের কণার সন্ধানে
পিপ-পিপ রব তুলে।

শুধু এই নয়। আরও আছে। অংশুমান এই পাঁচ বছরে কবি নাট্যকার গীতিকার হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করলে।

পথ তাকে আপনি ছেড়ে দিয়েছিল পৃথিবী।

তার শক্তি ছিল। কিন্তু তাই সব নয়। কাল এবং দেশ তাকে সাহায্য করেছিল। বাংলায় জমিদারি উচ্ছেদ বিল—আসলে এস্টেট অ্যাকুইজিশন অ্যাক্ট পাস হল। সেই সময়েই সঙ্গে সঙ্গে এল নমিতার দিক থেকে আঘাত। সে হঠাৎ ঠিক করে বসল তার জমিদারির অংশ বিক্রি করে দেবে। শুধু জমিদারির অংশ কেন, সব কিছু। দেবগ্রামের সব কিছু—বাড়ি ঘর বাগান পুকুর জমিজমা সব।

আরও কারণ ছিল। প্রথম, জমিদারির কমপেনসেসনের টাকাটা সে সরকারী খাতায় সই করে নিতে রাজী ছিল না। দ্বিতীয়, জমিদারি নেবার আগে একটা সেটেলমেণ্ট হবে। সেখানে তার বড়দা তার অভিভাবক হিসেবে তার সর্বনাশ করে সব আত্মসাৎ করতে পারে। তারই সম্ভাবনা বেশী। ইতিমধ্যেই পুরনো চেক কেটে খাসপতিত নিজের নামে পত্তন করে নিচ্ছে।

কে দেখবে তার স্বার্থ?

মা প্রতিদিন বদলাচ্ছেন। বদলাতে বদলাতে তিনি এক বিচিত্র মানুষ হয়ে উঠেছেন। না সন্ন্যাসিনী তপস্বিনী—না রাজনৈতিক নেত্রী। রাজনীতি থেকে সরে গিয়ে এখন সর্বোদয়ে যোগ দিয়েছেন। যত গালাগাল দেন নেহেরুকে, ভারত সরকারকে তত গালাগাল দেন বামপন্থী দলগুলিকে। যত গালাগাল দেন প্রাচীন সমাজকে তার থেকে বেশী গালাগাল দেন আধুনিকতাকে, আধুনিক সমাজকে। ধর্মকে কুসংস্কার বলেন। কিন্তু মানেন। জমিজমা যা তাঁর নামে আছে তা সব ভূদানে দিয়েছেন। ইচ্ছে, অংশুও সব ভূদানে দান করে দেয়। তার থেকে অংশু বিক্রি করে দিলে সব।

* * *

খদ্দের জুটিয়ে দিয়েছিল হারু চাটুজ্জ্যে। রমলার দাদামশাই। অংশুমানদের জমিদারির আয়তন খুব বড় ছিল না। আয়তন এবং আয় দুইই ছিল ছোট। মূল্য ছিল অন্য দিক দিয়ে। জমিদারির সবটাই ছিল স্থানীয় অঞ্চল জুড়ে। ফল ছিল অনেকটা সেকালের কোন ক্ষুদ্র রাজা তার রাজ্যের কেন্দ্রে রাজধানীতে বাস করার ফলের মত। শুধু খাজনা এবং ফলমূল ফসলের নিত্য নজরানাই সংগ্রহ হত না, দু'বেলা মানুষদের কাছ থেকে প্রণাম-নমস্কারও মিলত। জমিদারি চলে গেলে সেইটেই ছিল সব থেকে বড় লোকসান। আর আয়ের উপর ক্ষতিপূরণ মিলবে পাঁচ থেকে বিশগুণ পর্যন্ত। কম আয়ের জন্য অংশুদের কমপেনসেসন হবে বিশগুণ। সেইটে বর্ধমানের এক শেঠ কিনতে চাইলে বারোগুনো পণে। হাজার টাকা আয় বারো হাজারে কিনে রাখলে সরকারী কমপেনসেসন পাবে কুড়ি হাজার টাকা যার অর্থ হল আট হাজার লাভ। যারা পারসেণ্টেজ কষে তারা বলবে চল্লিশ পারসেণ্ট।

সেটা ১৯৫৪ সাল। বি-এ পরীক্ষার পর ঠিক করেছিল ১৯৫৭ সালের ইলেকশনে

দাঁড়াবে। এবং বাকী জীবনটা সে পলিটিক্সই করবে। পার্টি একটা ঠিক করে নেবে সেটা কংগ্রেসও নয় কম্যুনিস্ট পার্টিও নয়। হিসেব করে দেখেছিল বারোগুনো পণে জমিদারি সম্পত্তি বেচে অন্ততঃ সে আটচল্লিশ হাজার টাকা পাবে। এ ছাড়া চাষের জমি বাগান পুকুর এসবগুলো থেকেও অন্ততঃ হাজার বিশ পঁচিশ পেতে পারবে।

জমিজমা বাগান পুকুরের খদ্দেরও জুটিয়ে দিয়েছিল হারু চাটুজ্জে। সেটা কিনতে চেয়েছিল রমলার বুড়ো স্বামী। বৃদ্ধ রমলার নামে সেগুলি কিনতে চেয়েছিল। কারণ তার প্রথম পক্ষের ছেলেরা গ্রামের সম্পত্তিতে রমলাকে নখ ডোবাতে দেবে না এটা ছিল সর্বজনবিদিত ভবিষ্যৎ। সেই কারণেই দাদামশায়ের গ্রামে এই সম্পত্তির উপর রমলার আকর্ষণ হয়েছিল বেশী। এবং রমলা নাকি আবদার ধরে বলেছিল—ওই সম্পত্তি আমাকে তুমি কিনে দাও। চৌধুরীদের ভারী দেমাক। আর ওদের বাগান পুকুরগুলোর উপর আমার ভারী লোভ। ছেলেবেলা ওদের বাগানে কাঁচামিঠে গাছের আম চুরি করে পাড়তে যেতাম; ওদের লোকেরা দেখতে পেলে তেড়ে আসত। ওদের বাড়ির বউরা মেয়েরা আমাদের হেনস্তা করত। ওদের সব পুকুরে বড় বড় মাছ থাকত—এখনও আছে মাছ, খুব মিষ্টি। তুমি এই সম্পত্তি আমাকে কিনে দাও।

খরিদ্দার দাদারাও দাঁড়িয়েছিল। দাবিও তারা করেছিল, পৈতৃক সম্পত্তি, সে-হেতু তাদেরই দেওয়া উচিত এবং কম মূল্যেই দেওয়া উচিত। শুধু তাই নয় আইনগত বাধা যতরকম হতে পারে তাও তারা সৃষ্টি করতে চেয়েছিল কিন্তু কোন বাধাই সে-দিন তার সম্মুখের পথে দাঁড়াতে পারে নি। ছাত্র আন্দোলনের প্রথম সারির নেতা সে তখন; তার জীবনের আকাশের অবস্থা তখন বারিবর্ষণহীন ঘষা কাচের মত, মেঘের চাপে ঢাকা বিবর্ণ গ্রীষ্মের দুপুরের মত, সূর্য নাই চন্দ্র নাই তারা নাই; আলো আছে—সংশয়ের ছায়াচ্ছন্ন আলো; সে আলোয় জ্বালা আছে, গুমোট আছে কিন্তু তার মধ্য থেকে গাছেরা সবুজ রঙ পায় না, তার জ্যোতিতে বীজাণু মরে না। সে কোন কিছুতে বিশ্বাস করে না। তাই সে সেদিন অনায়াসে বলতে পেরেছিল দেবকীর্তি পিতৃকীর্তি কুলকীর্তি প্রভৃতি সংস্কারগুলি একান্তভাবে অর্থহীন ও আমার বিচারে নিতান্ত মিথ্যা বলেই আমি এগুলিতে বিশ্বাস করি না। এবং বিশ্বাস করি না বলেই আমার মা-সৎমা ও সৎ-ভাইদের এই দাবি মানতে আমি বাধ্য নই। এ সবের জন্যে যে সম্পত্তি দেবোত্তর হিসেবে নির্দিষ্ট আছে তার অংশ থেকে ওঁরাই আমাকে অধিকার দেন নি। সেই সম্পত্তির আয়ের বাইরে আজ যদি অর্থের প্রয়োজন হয়—যা ওঁরা দাবি করেছেন—তা আমি দিতে বাধ্য নই।

সকল বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করেই সে সব বিক্রি করে দিয়েছিল। জমিজমা বাগান পুকুরের দাম সে বেশীই পেয়েছিল। এতটা পাবে সে প্রত্যাশা করে নি। পঁচিশ হাজারের প্রত্যাশার স্থলে সে পঁয়ত্রিশ হাজার পেয়েছিল। দাদাদের সঙ্গে রেষারেষি করে রমলা শেষ ডাকে তিরিশ হাজার থেকে একেবারে পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা দর তুলে দিয়েছিল।

সে সময় দেবগ্রামে শেষ দশ দিন সে রমলার কাছে হারু চাটুজ্জের বাড়িতেই খেয়েছিল।

এই সম্পত্তি বিক্রির ব্যাপারটা নিয়ে দাদাদের সঙ্গে মুখদেখাদেখি বন্ধ হয়েছিল; করেছিল তারাই; তবে সে ধ্বনির প্রতিধ্বনি তুলতে এতটুকু পিছোয় নি বা দ্বিধা করে নি। শুধু মা তার আশ্চর্য। তিনি এগিয়েছিলেন কি পিছিয়েছিলেন তা সে বলতে পারবে না, তিনি সে সময় এসেছিলেন দেবগ্রামে। একই বাড়িতে অর্থাৎ তার বা তাদের বাড়িতেই ছিলেন—তবে তিনি খাওয়াদাওয়া করতেন ঠাকুরবাড়িতে।

মা শুধু একদিন তাকে বলেছিলেন—জমিগুলি তুমি ভূদানে দান কর এই আমার ইচ্ছে।

সে বলেছিল—তোমার জন্যে একটা অংশ থাকছে সেটা তুমি দিয়ে দিয়ো। আমি ভূদানে বিশ্বাস করি না।

মা অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলেছিলেন—সত্যিই দেবোত্তর থেকে দেবোত্তরের খরচ আজকাল কুলোয় না। পিতৃপুরুষের পুজো—তাতে তুমি কিছুই দেবে না?

সে বলেছিল—না। তোমরাই আমাকে—

মা বলেছিলেন—থাক কারণ দেখাতে হবে না।

তারপর বলেছিলেন—এ বাড়িও বিক্রি করবে?

সে বলেছিল—স্থির করি নি। তবে রেখে কি করব? কোন্ বাঁধনে বাঁধা থাকব গ্রামের সঙ্গে? বাড়ি রাখলেও ইটগুলো ক্রমে খসে পড়বে। জ্ঞাতিরা দরজা জানালা ছাড়িয়ে নেবে।

বাস্। এর পর আর কথাবার্তা হয় নি। মা মুখ বন্ধ করেছিলেন। পরের দিনই তিনি চলে গিছলেন। টেলিগ্রাম এসেছিল। গেছিলেন উড়িষ্যায়। নবকৃষ্ণবাবুদের ওখানে।

সে ছিল; তখন বিক্রীকবালা লেখা হচ্ছিল। বাড়ির সম্পর্কে শেষ মীমাংসা করে দিয়েছিল রমলা। তারই নেবার কথা ছিল বাড়িখানা। সেই শেষ পর্যন্ত বলেছিল—না বাড়ি তুমি বিক্রি করো না অংশুদা। ওটা তোমারই থাক। ও আমি নেব না। ওটা বাদ থাক। আমি বরং ভাড়া নেব। এখানে এসে ওই বাড়িতে থাকব। ভাড়া নগদ দেব না। বাড়িটা মেরামত করাব। পরিষ্কার রাখব।

এই লেনদেনের মধ্যে শেষের আসরে রমলাই ছিল প্রধান। অংশুমান অবাক হয়ে এই বৃদ্ধ অবস্থাপন্ন ব্যক্তিটির গৃহিণীটির কথা শুনেছিল। মনে পড়েছিল পুরনো রমলাকে। সে কি এই? বাহান্ন সাল থেকে চুয়ান্ন সাল—তিন বছরে রমলার পরিবর্তন দেখে তার বিস্ময়ের আর শেষ ছিল না। এ যেন সে প্রগল্‌ভা গায়েপড়া সেই মেয়েই নয়। এ এক আশ্চর্য মর্যাদাময়ী মেয়ে। বয়স বড়জোর আঠারো পার হয়ে উনিশে পড়েছে; দেহে যৌবন ওর প্রচুর ছিল—এখন তাতে ভাদ্রের পূর্ণিমার জোয়ার লেগেছে। কিন্তু সব উচ্ছলতা তখন শান্ত হয়ে গেছে। একেবারে গিন্নীবান্নীর মতই সে তখন ওই পঞ্চান্ন-ষাট বছরের পাকাচুল ভুঁড়িওলা স্বামীটিকে দিব্যি যেন দোক্তার কৌটো বা চাবির গোছার মত আঁচলের খুঁটে বেঁধে পিঠে ফেলে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। অথবা ভদ্রলোকই পোষা বিড়ালের মত বা চাষীর বাড়ির পুরনো বলদের মত তার পায়ে পায়ে বা গায়ে গায়ে ঘুরে বেড়াতেন।

রমলা সেদিন সকালেই কথাটা যখন বলেছিল তখন ভদ্রলোক নবীনবাবু রমলার কাছেই

বসেছিলেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে সায় দিয়ে বলেছিলেন হ্যাঁ, ওটা থাকবে। তার জন্যে টাকা কম করব না আমরা। দলিল পঁয়ত্রিশেরই হবে। তবে আমাদের বাসনা বাড়িখানা আমাদের রক্ষণাবেক্ষণে রাখেন, আমরা মেরামত করাব, যখন আসব থাকব।

রমলা বলেছিল—সেই কথাই ভাল অংশুদা। বাড়িটা বেচলে আর কোনদিন তোমাকে পাব না। তুমি আর এখানে আসবে না। দেখ, সম্পত্তি আজ যেটা তোমার কাল সেটা আমার হয়। কিন্তু বাড়ি নিতে নেই। তা ছাড়া তোমার মা রয়েছেন।

সে বলেনি কিছু, শুধু শুনেই গিয়েছিল।

দলিল রেজিস্ট্রি হয়েছিল বর্ধমানে ডিস্ট্রিক্ট রেজিস্ট্রারের আপিসে। আগের দিন সন্ধ্যেবেলা মনটা তার অত্যন্ত বিষণ্ণ ছিল। বিষয়কে ভূমিকে সম্পত্তিকে ঘৃণা করি, চাই না একথা মুখে বলা সহজ। বক্তৃতামঞ্চে হাততালি মেলে কিন্তু এই বিষয় বিক্রি করার যে এতখানি বেদনা এর আগে সে বুঝতে পারে নি। জমিদারির দলিল আগেই হয়ে গেছে কিন্তু তাতেও এতটা যেন যোগ ছিল না। চাষের জমি বাগান পুকুর। এর আশ্চর্য মমতা। সামনের বাগান পুকুরের দিকেই সে তাকিয়ে ছিল—দেখছিল নিষ্পলক দৃষ্টিতে।

একসময় রমলা এসে দাঁড়িয়েছিল তার সামনে। সে তার দিকে তাকিয়ে বলেছিল—রমলা?

—হ্যাঁ। একটা কথা বলতে এলাম।

—বল!

—বলছি, বছরে একবার করে যেন এসো। কেমন? এই উপরতলাটা পুরো তোমার জন্যে বন্ধ থাকবে। নিচেটা আমরা ব্যবহার করব। আমার কাছে থাকবে খাবে। কেমন?

সে তার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখেছিল।

মনে পড়েছিল সেই একরাত্রির কথা! সেই গভীর রাত্রে দরজার বাইরে থেকে চাপাগলায় আশ্চর্য বাসনাব্যাকুল ডাক, অংশুদা! অংশুদা!

রমলার চোখের দিকে তাকিয়ে মনে হয়েছিল আজও চোখের দৃষ্টিতে সেই ব্যাকুলতা মাখানো রয়েছে। মনে হওয়ামাত্র চকিতে চিত্ত উদ্বেল হয়ে উঠেছিল, কানের পাশ দুটো গরম হয়ে উঠেছিল, ভিতরে যেন আষাঢ়ের মেঘ ডেকে উঠেছিল গুরুগুরু ডাকে। সে হাত বাড়িয়ে রমলার হাতখানা টেনে নিয়েছিল নিজের উত্তপ্ত হাতের মধ্যে।

রমলা কিন্তু হাতখানা টেনে নিয়েছিল—বলেছিল—ছাড়ো।

বুকের মধ্যে যে আবেগটা আকস্মিক জেগে উঠে ফুলে ফেঁপে উঠছিল সেটা সেদিন তাকে সেই আদিম কালের মানুষে পরিণত করেছিল একমুহূর্তে, যে মানুষ নির্জনে নারীকে একাকিনী দেখলেই মুহূর্তে চঞ্চল হয়ে উঠে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। রমলার টেনে নেওয়া হাতখানা আবার হাত বাড়িয়ে খপ করে ধরে গাঢ়স্বরে অসহনশীলতার সঙ্গে বলেছিল—র—ম—লা!

রমলা তার দিকে কিছুটা সকৌতুক বিস্ময়ে ফিরে তাকিয়ে বলেছিল—কি?

সে আবার বলেছিল—রমলা। এবং ওই ডাকটির মধ্যেই তার সব কথা সে একটি বিগলিত আবেদনের মধ্যে ব্যক্ত করেছিল।

রমলা বলেছিল—পাগলামি করো না। আমার অনন্ত নরকে স্থান হবে না। আমি তা পারব না। তা হয় না।

বলেই সে পিছন ফিরেছিল চলে যাবার জন্যে। তার হাতখানা তখনও অংশুমানের হাতের মধ্যেই ছিল, সে হাতখানা আবার টেনে নিতে চেয়েছিল রমলা। অংশু দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে গিয়েছিল মুহূর্তে। সে হাতের মুঠি শক্ত করে সজোরে রমলাকে আকর্ষণ করেছিল তাঁর দিকে। রমলা টলে পড়ে গিয়ে এসে পড়েছিল অংশুমানের বুকের উপর। সে রমলাকে সবলে বুকে জড়িয়ে ধরতে চেষ্টা করেছিল।

রমলা একটা চাপা চীৎকার করে উঠেছিল—অংশুদা!

একটা গোখরো সাপের গর্জনের মত তার সে চাপা গর্জন। সে গর্জনকে উপেক্ষা করতে পারে নি। কেউই পারত না। একটু চকিত হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে আরও চকিত হয়েছিল অংশুমান। রমলার চোখ দুটো জ্বলছিল। এবং দু'পাটি ধারালো ঝকঝকে দাঁত মেলে সে তাকে মুখের উপরেই হিংস্র জন্তুর মত কামড়াতে উদ্যত হয়েছিল। অংশুমান বিব্রত হয়ে বাঁ হাতখানা দিয়ে আড়াল দিয়েছিল রমলার মুখকে। রমলা তার হাতেই কামড় বসিয়ে দিয়েছিল। ক'ড়ে আঙুলের নিচে বাঁ হাতের তেলোয় কয়েকটা দাঁতের দাগ আজও আছে। সেদিন দাঁত বসে গিয়েছিল। রক্ত পড়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে তার জ্ঞানও ফিরেছিল—সে তার হাতের বাঁধন আলগা করে দিয়ে বলেছিল—আমাকে মাপ কর তুমি। অপরাধ করে ফেলেছি।

রমলা কোন কথা বলে নি। নিঃশব্দে উঠে তার বিপর্যস্ত বেশবাস একটু সামলে নিয়ে দ্রুতপদে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। দরজার মুখে শুধু একবার দাঁড়িয়ে বলেছিল—পালিয়ে যাবার পাগলামি করো না যেন। ভালো হবে না। তা অংশুমান করে নি। করবার লোক সে নয়। অতসীর প্রসঙ্গের মত এ প্রসঙ্গকেও সে স্বীকার করতে প্রস্তুত ছিল।

রাত্রে রমলা আবার চাকর সঙ্গে করে খাবারের থালা হাতে নিয়ে এসেছিল তাকে খাওয়াতে। মেয়ে জাতটাই বিচিত্র। রমলাকে দেখে বুঝবার উপায় ছিল না যে কয়েক ঘণ্টা আগে এত কাণ্ড ঘটে গেছে। এ সম্পর্কে শুধু দুটি কথা বলেছিল। জিজ্ঞাসা করেছিল—হাতটা কতটা কেটেছে?

উত্তর শুনতে চায় নি। চাকরটাকে বলেছিল—টিঞ্চার আইডিন এনেছিস তো? ওই টেবিলে রাখ।

যাবার সময় বলেছিল—সব পারি অংশুদা এইটে শুধু পারি না। হাজার হলেও হিঁদুর মেয়ে তো!

উত্তরে কথা অনেক ছিল। অনেক হিঁদুর মেয়ের নজীর অংশু দিতে পারত। কিন্তু একটা কথাও সে বলে নি, বলতে পারে নি। পরের দিন সকালে উঠে ট্যাক্সি করে বর্ধমানে এসে দলিল রেজিস্ট্রি করে দিয়ে কাঁচা পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা নিয়ে সে কলকাতা এসেছিল। বাড়িটা দলিলের বাইরে থাকল কি বিক্রী করা সম্পত্তির সঙ্গে ভুক্তান হয়ে গেল তা আর যাচাই করে নি। এ নিয়ে কথাও হয় নি। তবে রমলা মধ্যে মধ্যে চিঠি লেখে—একবার এসো।

বাড়ির কিছু অদল বদল দরকার—সেগুলো এসে দেখে "হ্যাঁ" "না" অন্তত বলে যাও। কিন্তু সে যায় নি।

অনেকবার সে উত্তর লিখেছে—"রমলা, একালের ছেলে আমি অংশুমান—আমি সবই পারি শুধু—শুধু মাটি সম্পত্তির বাঁধনে বাঁধা থাকতে পারি না। আর ছোট জায়গায় থাকতে পারি না। তার চেয়ে কলকাতাতে বাড়ি করে তোমাকে নেমন্তন্ন করব, এসো দেখা হবে।" কিন্তু লিখেও ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছে।

* * *

এই বাড়িখানা সেই টাকায়।

একালের একটি আধুনিক জীবনের জন্ম একটি সুন্দর নীড় গড়ে তুলতে চেয়েছিল। গড়ে দিয়েছিল বলতে গেলে শিবকিংকর।

সাতান্ন সালে সে ইলেকশনে নামবে স্থির করেছিল। পার্টি নয় ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হিসেবে। ওই দেবগ্রাম থেকেই। কোথা থেকে শিবকিংকর খবর পেয়েছিল কে জানে সে এসে হাজির হয়েছিল তার হোটেলে।

সেই তার পুরনো বোর্ডিং-হাউস। সেটার এ ক'বছরে কিছু উন্নতি হয়ে হোটেল নাম দিয়েছে তখন। সে বললে—বাড়িটা তুমি কেনো। শুধু বাড়িটাই কেনালে না, আজকের এই ভবিষ্যতের পত্তন সেদিন সে-ই করে দিয়েছিল। সে ভেবেছিল রাজনীতি করবে। এককালে শুনেছিল কলিতে অশ্বমেধ যজ্ঞ আর হয় না, অশ্বমেধের রূপান্তর হয়েছে; শরৎকালে দুর্গাপূজাই হল অশ্বমেধ। সে আবিষ্কার করেছে কলিতে রাজসূয় যজ্ঞ আর হয় না কারণ রাজতন্ত্রই থাকবে না—একে একে রাজতন্ত্রের দেউটি নিভছে কিন্তু তা বলে রাজসূয় যাবে না, গণতন্ত্রের কালে রাজসূয় যজ্ঞের ফল মানুষ পেতে পারবে বা পাচ্ছে রাজনৈতিক ইলেকশনে। ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হয়ে ইলেকশনে নামবার সংকল্প থাকলেও ইলেকশন জিতে কোন পার্টির সঙ্গে হাত মেলাবে তারও একটা খসড়া তার করা ছিল। কিন্তু শিবকিংকর এসে সব গোলমাল করে দিলে।

শিবকিংকর হঠাৎ এসে হাজির হল রঞ্জন বোসকে নিয়ে। রঞ্জন বোস ছবির প্রডিউসার হিসেবে নামছে। ছবি করবে। ছবিতে অতসী নামবে। অতসী বলেছে অংশুর কাছে গল্প কেনো। ওই 'কালরাত্রি' গল্প। সেইখানেই শিবকিংকর তাকে দেশের সম্পত্তি বিক্রি করার কথা জিজ্ঞেস করে বলেছিল—টাকাগুলো নিয়ে কি করবে? ওড়াবে?

সে উত্তর দেয় নি। বিরক্তি বোধ করেছিল।

শিবকিংকর তাতে দমে নি। সে উত্তরের অপেক্ষা না করেই বলেছিল—একখানা বাড়ি কেনো না। কিনবে?

বাড়ি?

বাড়ির একটা মোহ আছে। শব্দটাই মুহূর্তে তাকে চকিত করে তুলেছিল একটু। মুখ থেকে বেরিয়ে এসেছিল প্রায় 'আপনাআপনি' যাকে বলে ঠিক সেইভাবে—বাড়ি?

সে বাড়ি এই বাড়ি। বাড়িখানা অতসীর।

কনট্রাক্টর হিসেবে তৈরী করাচ্ছিল ওই রঞ্জন বোস। ব্যবসাদার মানুষ রঞ্জন বোস। ব্যবসাদারের ছেলে ব্যবসাদার। কয়লা, অভ্র, পাট, কনট্রাক্টরী অনেক রকম শাখা আছে বোস অ্যাণ্ড সন্সের। সেই সূত্রেই রঞ্জন বোসই অতসী গুপ্তাকে জমি বিক্রি করেছিল ইনস্টলমেণ্টে এবং সেই বাড়ি তৈরীর কনট্রাক্ট নিয়েছিল। দু কাঠার উপর তিনতলা বাড়ি—নিচতলায় তিনখানা ঘর, দোতলায় দুখানা, তিনতলায় একখানা এবং তার বহুবিধ বৈচিত্র্য। ১৯৫৪।৫৫ সালে তার এস্টিমেট ছিল ষাট হাজারের কাছে। রঞ্জন বোস অতসীর নামের উপর বিশ্বাস রেখেছিল অথবা ব্যক্তিগতভাবে তার উপর বিশ্বাস রেখেছিল সে কথা সেই জানে। তবে তাকে ছবিতে নামিয়ে একখানি সাকসেসফুল ছবি করবার প্রত্যাশা সে করেছিল। একখানা ছবি মার খেয়েছে। এখানা দ্বিতীয় ছবি। এবার অতসীর কাছে প্রাপ্য টাকার জন্যে সিকি-সমাপ্ত বাড়িখানা বিক্রি না করে উপায় নেই। 'বাড়ি' এই শব্দটাই তার মনে মোহের সঞ্চার করেছিল। নতুন যুগে কংগ্রেস পর্যন্ত 'আবাদী' অধিবেশনে সোস্যালিস্টিক প্যাটার্ন অব সোসাইটির কথা বলছে; সম্পত্তি এবং মালিকানি মানুষের পক্ষে নিঃসন্দেহে নিন্দার কারণ হয়েছে; অংশুমান দেশের সম্পত্তি বেচে দিয়ে সম্পত্তিবানদের সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়েছে এ সবই সত্য; তবুও 'বাড়ি'—'আমার বাড়ি' এর একটা মোহ আছে সেটা তাকে পেয়ে বসেছিল সেদিন। সে সেই সিকি সমাপ্ত বাড়িটাকে কুড়ি হাজারে কিনে রঞ্জনদের বোস অ্যাণ্ড সন্সকে দিয়েই আরও আট হাজার টাকায় একতলা শেষ করে নিয়েছিল।

বাড়িটা নিয়ে কত কল্পনাই যে সে করেছে। এবং এই বাড়িখানাই বিচিত্রভাবে বঙ্কিম পথে অভাবিত সূত্র দিয়ে আকর্ষণ করে আজ তাকে এইখানে এই ভয়ংকর অনিবার্যের সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।

সে ভেবেছিল, মোটামুটি ঠিকই করে ফেলেছিল সে ইলেকশনে দাঁড়াবে। কিন্তু এই বাড়ির জন্যেই যোগাযোগ হয়ে গেল রঞ্জনের সঙ্গে। সেই যোগাযোগের জন্যই রাজনীতির পথে বাড়ানো পাখানা ফিরিয়ে নিয়ে ফেললে সে নাটকের পথে।

রঞ্জন শুধু অতসীর মোহে ছবি করতে নামে নি। তার ছিল অভিনয়ের শখ। নাটকের নেশায় ছিল পাগল। নাটকের জন্যই তার প্রথম পরিচয় হয়েছিল অতসীর সঙ্গে। অভিজাত গৌরবান্বিত একটি প্রতিষ্ঠান ছিল তাদের। ষোড়শী সংঘ। ষোড়শী সংঘের সত্যই খ্যাতি ছিল এবং খ্যাতির দাবিও তাদের মিথ্যে ছিল না। রঞ্জন ছিল তার হিরো। শচীন সেনগুপ্ত ছিলেন তাদের সভাপতি। ষোড়শী সংঘই তার কালরাত্রির নাট্যরূপকে অভিনয় করলে মঞ্চে। সে অভিনয়ের সমস্তক্ষণ একটা অস্বস্তি বোধ করেছিল অংশুমান। রঞ্জন ছিল নায়ক এবং নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করেছিল অতসী। দুটি ভূমিকাই অন্ততঃ সার্থক হয় নি অংশুমানের মতে। তবু সে খ্যাতি পেল।

প্রবন্ধকার হিসেবে যে-খ্যাতি একদিন পেয়েছিল সে-খ্যাতি তার গান রচনা করে গীতিকার হিসেবে বৃদ্ধি পেয়েছিল; আরও বৃদ্ধি পেলে সে-খ্যাতি গল্পলেখক হিসেবে। সে গল্প নাটক হয়ে যে খ্যাতি এনে দিলে সে অভাবিত। রেডিয়ো নাটকটি অভিনয় করলে। এবং সে

অভিনয় শুনে বাংলাভাষায় পারঙ্গমা বাংলার বউ এক বিদেশিনী সুইডিশ মেয়ে নাটিকাখানি অনুবাদ করলে তার মাতৃভাষায়।

এর ফলে, অংশুমান রাজনীতির দিকে পিছন ফিরলে, এম-এ পরীক্ষাও আর দিলে না। সে নাটক নিয়ে পড়ল। শুধু লেখাই নয়, সে অভিনয় করবার জন্যও এগিয়ে এল।

ষোড়শী সংঘের সভায় সে প্রস্তাব করেছিল, ষোড়শী সংঘ যদি অনুমতি দেয় তবে সে নিজে একবার 'কালরাত্রি'র নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করতে চায়। না হলে সে নিজে একটা সংঘ তৈরী করে অভিনয় করবে।

উৎসাহের সঙ্গে সর্বাগ্রে তার প্রস্তাব সমর্থন করেছিলেন সভাপতি সেনগুপ্ত। বলেছিলেন —আমি আশা করব চৌধুরী, তুমি পারবে অসাধারণ একটা অভিনয় করতে। গোটা দেশের জন্য আশা করব। স্টেজ আজ মেকানিক্যাল হয়ে যাচ্ছে। নাটক নেই। নতুন করে গিরিশচন্দ্রের মত নট-নাট্যকার একাধারে চাই। তুমি কর। আমরা দেখতে চাই তোমাকে যাচাই করে।

নায়িকার অভিনয় অতসীই করেছিল।

সেদিনের পথ বদলের পালায় অতসীর হাতছানিই কি সব থেকে বড় আকর্ষণ ছিল? অতসীই কি ছিল সেদিনের সোনার হরিণ?

সত্যকে অস্বীকার করতে তো পারবে না অংশুমান। আকর্ষণ একটা ছিল। কারণ এই অভিনয়ের পরই তার সঙ্গে অতসীর সম্পর্ক আবার একবার নতুন করে গড়ে উঠেছিল।

শিবকিংকর—অদ্ভুত শিবকিংকর—তার কাছে ন্যায় অন্যায় নেই, ধর্ম অধর্ম নেই—বাঁচবার জন্যই হোক আর আনন্দের জন্যই হোক যা প্রয়োজন হয় করে যায়। সেই তাকে হাতে ধরে অতসীর কাছে অথবা অতসীর হাত ধরে তার কাছে পৌঁছে দিয়েছিল। প্রথম দিনের রিহারস্যালে সেই নিয়ে এল অতসীকে। অতসীর পার্ট তৈরী ছিল। সে নিজে নাট্যকার। তার পার্ট তৈরী থেকেও বেশী কিছু ছিল। গোটা বইটারই জন্ম ছিল তার অন্তরের সূতিকাগৃহে। তবে কিছু অদলবদলের জন্য প্রয়োজন ছিল রিহারস্যালের। অতসীকে অংশুমান ছবির পর্দায় এবং স্টেজে দেখেছিল কিন্তু আসল অতসী হিসেবে তার সঙ্গে সেই ৪৮ সালে স্মৃতিস্তম্ভ-উদ্বোধন সভার পর এই প্রথম দেখা। ১৯৪৮ সাল আর ১৯৫৪ সাল—পূর্ণ ন' বছর। এই ন' বছরের মধ্যে কতবার নিমন্ত্রণ করেছে শিবকিংকর—অতসীর নিমন্ত্রণ জানিয়েছে কিন্তু অংশুমান নেয় নি সে নিমন্ত্রণ।

ন' বছর পর অতসীকে দেখে তার ভারী ভাল লেগেছিল। বড় পরিচ্ছন্ন সাদাসাপটা পোশাকে সে এসেছিল সেদিন। সব থেকে বিস্ময় লেগেছিল এই দেখে যে, এই ন' বছরে অতসীর বয়স যেন সাড়ে চার বছরও বাড়ে নি। মনে হয়েছিল তার রূপকে পরিপূর্ণ ফোটা ফোটাতে যতটুকু বয়স বাড়ার প্রয়োজন ততটুকুর বেশী বোধ করি একটা দিনও বাড়ে নি।

অতসী তাকে দেখে একটু ভারী মিষ্টি হাসি হেসেছিল। তাদের সে সম্পর্কের কথা শিবকিংকর ছাড়া কেউ জানত না তবু আসরে উপস্থিত সকলেই পুলক চাঞ্চল্য অনুভব

করেছিল।

শচীনদার প্রকৃতিই ছিল গম্ভীর—রসিকতার মধ্যেও সে-গাম্ভীর্য প্রকাশ পেত—তিনি সেই ভঙ্গিতেই বলেছিলেন—অতসী, এই হাসির টুকরোটুকুকে কিন্তু আমরা অভিনয়ের মধ্যে দেখতে চাই। বুঝলে। অংশু, তুমি স্টীফ হলে কেন? এ্যাঁ। ইয়ং ম্যান তুমি। এখন হাসিতে কোথায় উল্লসিত হয়ে উঠবে, না স্টীফ হয়ে যাচ্ছ। অভিনয়ে তো তোমাকে বেশী বিগলিত হতে হবে হে!

হাসির রোল পড়ে গিছল।

শচীনদার কথাগুলি আজও কানে বাজছে। তিনি বলেছিলেন—জান, সেদিন একজন বলছিল, ছোকরার চেহারা দেখে ওথেলোর কথা মনে পড়ে। ওথেলো দি মুর। আমি বললাম—রাম কহো। তোমরা বাবা একেবারে জর্ডনতটের বাসিন্দে। কেন—যমুনাতটের কালো দুর্দান্ত ছোকরাকে মনে কর না কেন? বৃন্দে থেকে রাধা পর্যন্ত তার প্রেমমুগ্ধ।

এরই মধ্যে সে কখন সহজ হয়ে উঠেছিল এবং হৃদয়ের মধ্যে জেগে উঠেছিল সেই আবেগ, যে আবেগে মেঘ-ঝরা-জল নদীর বুকে স্রোতের বেগে এবং কলকল্লোলের ধ্বনিতে জেগে ওঠে।

রিহারস্যাল শেষ হলে শিবকিংকর বলেছিল—এস অংশু—গাড়ি রয়েছে—তোমাকে হোটেলে নামিয়ে দিয়ে যাই।

আপত্তির যা কিছু তা রিহারস্যালের মধ্যে দিয়েই বোধ হয় কেটে গিয়েছিল। তবু একটু ইতস্ততঃ করেছিল।

অতসীই ডেকেছিল এবার—আসুন।

গাড়ির মধ্যে উঠে পিছনের সিটে পাশাপাশি বসে অতসী তার হাতখানা চেপে ধরে বলেছিল—এইবার!

তখনও কথা বলে নি অংশুমান।

অতসী বলেছিল—বাবাঃ, এত রাগ!

এরই মধ্যে গাড়ি তার হোটেলে না গিয়ে এসে উঠেছিল অতসী-শিবকিংকরের বাসায়।

সে অবাক হয়ে গিয়েছিল।

দোতলা বাড়ি। অতসী থাকে দোতলায়, শিবকিংকর একতলায়। এবং একতলায় শিবকিংকরের এক পরিপূর্ণ সংসার, তার স্ত্রী তার পুত্র কন্যা; রান্নাবান্না পর্যন্ত আলাদা।

শিবকিংকরের দুই সংসার। অতসীই তার এ বিয়ে দিয়ে তাকে সংসারী করে দিয়েছে। সেও শিবকিংকরের স্ত্রী। তার থেকে মুক্তি সে নেয় নি। তবু—। সে নিজেই হেসে বলেছিল—দেখ আমি তোমার জন্যে পাগল হয়েছিলাম বলেই তোমাকে বাঁধতে চাই নি। আমার বাঁধন পড়লে তুমি এই যে বাড়টা বেড়েছ এ তুমি বাড়তে না। তাই সেদিন ওকে ধরেছিলাম। ও আমাকে ঠিক আমার তোমাকে ভালবাসার মত ভালবেসেছিল তাই বলেছিল—। থাক বলব না সে কথা।...তোমাকে ভালবাসবার অধিকার দিয়েছিল। ওর সঙ্গে ঘর বেঁধেছিলাম নির্ভয়ে—ও বাঁধবে না আমাকে। তাই চলেছিল বছর দুয়েক। তারপর

বুঝলাম ওর বুকের দুঃখ। বুঝলে—বেটাছেলে পুরুষ যে তার স্ত্রীর উপর একাধিপত্য না হলে চলে না। মন ভরে না। বুক ভরে না। যাদের ভরে তারা পুরুষই নয়। তাই নিজে দেখে শুনে বিয়ে দিয়ে দিলাম; পর কেউ নয়—আমারই বোন। অগ্নিসাক্ষী করে বিয়ে দিয়েছি। আমাদের বিয়ে হয়েছিল কালীঘাটে। তোমার শিবশিংকর দাদার মাথায় থাকি আমি—পাশে থাকে 'সতী'। আমি শিবের মাথার গঙ্গার মত বিশ্বভুবন চরে বেড়াই। মন মাতলে দুষ্মন্ত রাজার দরজায় হানা দি। বুঝেছ।

সেদিন রাত্রে অতসীর বাড়িতে খেয়ে সে বাড়ি ফিরেছিল।

বিদায় দেবার সময় অতসী বলেছিল—আমার প্ল্যান মত বাড়িখানা কিন্তু কমপ্লিট কর। আমি খুব শখ করে করিয়েছিলাম। নিচতলায় মাঝখানে হল, সিঁড়ির তিন দিকে তিনখানা ঘর। দোতলায় দুখানা ঘর 'হল', খানিকটা খোলা ছাদ, তিনতলায় হল আর একখানা ঘর—বাকীটা সব খোলা ছাদ। সেই ছাদে টবের বাগান।

অংশুমান বেশী কথা বলে নি।

মনের আকাশটা আসন্ন ঝড়ের আকাশ হয়ে উঠেছিল। একটা গুমোট যেন মাটি ফেটে উপরের দিকে উঠছিল।

সেদিন রাত্রে ফিরে এসে চুপচাপ বসেছিল রাত্রি দুটো পর্যন্ত। মনের মধ্যে ঝড় বইছিল তখন।

দেহ আর মনে সে সংগ্রাম প্রচণ্ড।

মাটি ফেটে আগুন উঠে আকাশকে কালো করে দেওয়ার কথা সে পড়েছিল। সেদিন সে তা অনুভব করেছিল।

আকাশ সে নিতান্তই অলীক, একটি নয়নাভিরাম ছলনা—প্রসন্ন কোমল নীল নির্মল পবিত্র। আসলে সে মিথ্যা।

মানুষের নির্বোধ সংস্কারাচ্ছন্ন মন তবু বলে আমি বড়, আমি সত্য।

প্রায় রাত্রি একটার সময় হঠাৎ খাতা কলম নিয়ে বসেছিল। নাটক লিখবে। প্রথমেই লিখেছিল নাটকের নাম—"যোজনগন্ধা"।

প্রথম দৃশ্য ঢুকেছিল—গঙ্গার ঘাট। নৌকা নিয়ে ঘাটে অপেক্ষা করছে ধীবররাজকন্যা সত্যবতী।

অপরূপ রূপসী মেয়ে।

এসে প্রবেশ করলেন ব্রহ্মর্ষি পরাশর। এবং স্থির একাগ্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন ওই পরিপূর্ণযৌবনা রূপসী ধীবরকন্যার দিকে। সে দৃষ্টি শুধু একাগ্রই নয় তারও থেকে কিছু বেশী।

তার পায়ে তাঁর সকল তপস্যাফল নামিয়ে দিয়ে বলেছিলেন পরাশর—তোমার রূপের মধ্যে কি অরূপ ব্রহ্ম রূপায়িত হয়েছেন? তোমার সর্বাঙ্গে পেলবতার মধ্যে উত্তাপের মধ্যে মনে হচ্ছে ব্রহ্মই যেন তাঁর স্পর্শকে সঞ্চারিত করেছেন তোমার দেহগন্ধের মধ্যে—

মৎস্যগন্ধা বলে উঠেছিল—ছি ছি ঋষি এ কথা বলো না—আমার সর্বাঙ্গে তীব্র কুৎসিত মৎস্যগন্ধ জন্ম থেকে উৎসারিত—আমার দেহগন্ধের জন্য এক মক্ষিকা ছাড়া অন্য কোন কীটপতঙ্গও কাছে আসে না।

পরাশর বলেছিলেন—কে বললে? তোমার দেহ থেকে পারিজাতগন্ধ নির্গত হচ্ছে—আমি তার নিশ্বাস নিচ্ছি—

মুহূর্তে তাই ঘটেছিল এবং কন্যা অভিভূত হয়ে বলেছিল—এ কি করলে তুমি ঋষি? তুমি আমার এ কি করলে? আমার আশ্চর্য এক ঘুমন্ত মন জাগ্রত হয়ে ফুলের মত ফুটে উঠছে। বুকের মধ্যে কামনা যেন আকাশের বুকে মেঘের মত আলোড়িত হচ্ছে। আমি দেখছি—।

মৎস্যগন্ধা দেখেছিল এক শিশুকে। কৃষ্ণবর্ণ এক সন্তান। কিন্তু আশ্চর্য তার দীপ্তি। সে তাকে ডেকেছিল মা বলে।

ঋষি পরাশর তার মধ্যে দেখেছিলেন নিষ্প্রাণ বস্তুপুঞ্জের মধ্যে প্রাণকে—জড়ের মধ্যে জীবনকে—অপরূপের মধ্যে অরূপকে। দেহের মধ্যে জীবনের দাবিকে মেনে গিয়েছিলেন অবনত মস্তকে। স্বীকার করে নিয়েছিলেন সম্ভোগকে। বলেছিলেন—আমরা যা জানলাম না—আমরা যাকে প্রকাশ করতে পারলাম না তাকে জানবে এবং প্রকাশ করবে আমাদের উত্তরপুরুষ।

সে নাটক আজও শেষ হয় নি।

সেই ততটুকু লেখা হয়েই পড়ে আছে। মধ্যে মধ্যে মনে হয় লিখবে কিন্তু লেখা হয় না। পরের দিনই সে সেই একটা দৃশ্য নিয়ে অতসীকে শোনাতে গিছল।

শুনতে শুনতে অতসীর মুখে বিচিত্র হাসি ফুটে উঠেছিল। সে হাসি দেখে সে যেন একটা আশ্চর্য অস্বস্তি অনুভব করেছিল। মনে হয়েছিল ওই হাসি হেসে তাকে ব্যঙ্গ করছে অতসী। সে থেমে গিয়েছিল। এবং প্রশ্ন করেছিল—হাসছ কেন বল তো?

—হাসছি নাকি? প্রশ্ন করেছিল অতসী।

—হাসছ না? হাসছ। এর মধ্যে হাসির কি পেলে?

এবার অনেকখানি হেসে ফেলেছিল অতসী। হাসি থামিয়ে একসময় গম্ভীর হয়ে বলেছিল—তরুণ কবি—কলম ধরলে আর আকাশে মন ছোটালে আর তোমাদের মাটির কথা মনে থাকে না।

—কেন?

—ওই যে সত্যবতী ছেলের কথা মা-হবার স্বপ্ন দেখছে—।

—এ মিথ্যে কি হল?

—সব মিথ্যে। ওখানে নারীর কাছে থাকে পুরুষ, পুরুষের কাছে থাকে নারী। ভগবানও বিলুপ্ত—আর তরুণ পরাশর! তার তো কথাই নাই। আমার কথা, সন্তান আমি চাইই না। শুধু আমি কেন, এ যুগের কোন মেয়ে চায় না।

তবুও সে প্রতিবাদ করেছিল—বলেছিল—চাও। তুমি নিজেকে জান না।

আবার একবার খুব হেসে নিয়ে অতসী বলেছিল—আমার সন্তান কখনও হবে না

অংশুমান। আমার কাছে একালের সত্যবতীদের কথা জেনে যাও।

সে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল।

অতসী বলেছিল; তার আগে কিছুক্ষণ সেও স্তব্ধ হয়ে বসেছিল তার মুখের দিকে তাকিয়ে। একসময় দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলেছিল—যুদ্ধের সময় বাবার চাকরি গেল। মায়ের তখন তিনটে মেয়ে তিনটে ছেলে—ছটা, তার উপর পেটে একটা। পেটেরটা পেটেই মরল। মরা ছেলে হল। কোলেরটা না খেয়ে মরল। বাপ ভিক্ষে করতে লাগল। লোকে ভিক্ষে দেয় না। বাজারে আগুন লাগল। শেষে বাবা আমার হাত ধরে সন্ধ্যেবেলা নিয়ে যেত একটা বাড়িতে। তখন থেকেই সন্তান চাওয়া ছেড়েছি অংশুমান। তা ছাড়া—তা ছাড়া কোন দিন তুমি সকালে এস—তোমাকে দেখাব একটা ভিখিরী মেয়ে আসে ভিক্ষে করতে। আমি রুটি দিই। পাঁচটা ছেলে তার। ছেলেগুলোকে দেখলে ভয় করে। আরও দুটো না তিনটে তার হয়ে মরেছে। এ যুগে কেউ সন্তান চায় না সখা। আমার কথা ছেড়েই দাও—আমি মাতৃত্বকে ধারালো ছুরিতে কেটে ফেলে দিয়েছি।

বিচিত্র হাসি হেসে বলেছিল—আক্ষরিক সত্য অর্থে ঋষি পরাশর। এ তোমার কল্পনা নয়।

আরও একটুক্ষণ চুপ করে থেকে অতসী বলেছিল—ও নাটক লিখো না। তার থেকে অন্য কিছু লেখ। কিংবা ওই কথাগুলো বাদ দাও। অন্ততঃ আমাকে সত্যবতী করতে দিলে ওগুলো বাদ দিতে বলব।

* * *

শচীনবাবু বলেছিলেন—দ্যাট্‌স দি রিয়ালিটি অংশুমান। পৌরাণিক নাটক লিখবে বলে এ যুগের রিয়ালিটিকে অস্বীকার করলে চলবে না। পুরাণের খাতিরে অলৌকিক দু'চারটে চালাও চালাও—মোটামুটি মানুষ নেবে; কিন্তু বধূ বাসরে যায় কম্প্রবক্ষে নম্র নেত্রপাতে—তার মধ্যে জোয়ারীর ঝংকারের মত সন্তানকামনা ধ্বনিত হয় এ সত্য আজ আর চলবে না।

শচীনবাবুর সঙ্গে সে আলোচনা করেছিল এ নিয়ে। মানুষটির প্রতি অসাধারণ শ্রদ্ধা ছিল তার। এবং অসাধারণ শ্রদ্ধারই মানুষ ছিলেন তিনি। বলেছিলেন—ধরেছ তুমি ঠিক। এইজন্যেই তোমাকে বলি তোমার ক্ষেত্রে নাটকের ক্ষেত্র। এখানে এসে চেপে বস। ভাব। আজ সারা দেশটা কেন এমন হয়ে গেল, ভেবে দেখ। পিছনের কালের মানুষ আমরা—আমরা অনেক আদর্শে বিশ্বাস করেছি—সে আদর্শগুলো চোখের সামনে ভেসে যাচ্ছে দেখতে পাচ্ছি, এ কালকে তার জন্যে অভিশাপ দিচ্ছি, অভিশাপ ফলছে না। কেন ফলছে না? আমরা যত জোর গলা করে বলছি সে কথা একালে কেউ শুনছে না। কেন? চন্দ্র সূর্য গ্রহ নক্ষত্র সব মুছে গেল—সব মুছে গেল হে! অবাক হয়ে দেখছি। কিন্তু এ নিয়ে লিখবার ক্ষমতা নেই। এ লিখতে পার তোমরা। মানে আজও যে এ-যুগের নায়ক সেই লিখতে পারে। তুমি লেখ। তোমাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তোমার মনে এসেছে তুমি ধরেছ।

শচীনবাবুকে সে বলে নি যে কথাটা তার নয়, কথাটা অতসীর। শচীনবাবুর প্রশংসা এবং

সাধুবাদ সত্ত্বেও কিন্তু সে অতসীর এ-সত্যকে প্রসন্ন মনে গ্রহণ করতে পারে নি। শুধু তাই বা কেন? কথাগুলি ভাবত আর সে শিউরে উঠত।

অতসী মিথ্যা বলে নি। কিন্তু তবু সে তার কথা স্বীকার করে নিতে পারলে না। ষোড়শী সংঘের অভিনয় প্রস্তাব বন্ধ হয়ে গেল। সে বললে—না। অভিনয় সে করবে না।

অতসী তাকে প্রশ্ন করলে—কেন? কি হল?

সে শুধু বলেছিল—না।

—সেই তো জিজ্ঞাসা করছি—কেন না?

—ভাল লাগছে না।

—একটা কথা বলব?

—বল।

—আমাকে ভাল লাগছে না বলে বলছ।

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে সে বলেছিল—মিথ্যে ঠিক বল নি। তুমি সেদিন যা বলেছ সত্যবতী নাটকের প্রথম দৃশ্য শুনে—তারপর তুমি যদি কালরাত্রির নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় কর তবে নাটকটাই মিথ্যে হয়ে যাবে—নাটকই থেকে যাবে, সত্য হবে না।

—মানে?

—ভেবে দেখ, বুঝে দেখ।

অনেকক্ষণ পর বুঝতে পেরে অতসী হেসে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেছিল। বলেছিল—আর একটা কথা বলব?

—বল।

—রাগ করো না যেন।

—না।

—অবিশ্যি তুমি খাও বলেই বলছি। ও আমাকে বলেছে তুমি খাও। অন্ততঃ না-খাওয়াটাই ধর্ম এবং পুণ্য এই সংস্কারটা ভাঙবার জন্যই খাও। তা আজ আনন্দের জন্যে খাও। এস দুজনে খাই। খেলে হয়তো মনের ওই ভাবটা কেটে যাবে।

দুটো গ্লাসে খাঁটি বিলিতী মদ ঢেলেছিল অতসী। অতসীর আলমারিতে সে দেখেছিল এই বোতল কিন্তু সে মদ খায় এ কথা ভাবে নি। সেদিন গ্লাস হাতে নিয়ে বলেছিল—তুমি খাও? না?

ভারী মিষ্টি হেসে অতসী বলেছিল—খাব বলে আনিয়েছিলাম। কিন্তু খাওয়া হয় নি। ওর সঙ্গে খেতে ভাল লাগে নি। এস আজ তোমার সঙ্গে খাই। দেখ, নতুন বোতল।

বোতলটা নতুনই ছিল।

সেদিন সে উপেক্ষা করে নি। দুজনে একসঙ্গে বেশ খানিকটা পান করেছিল। কিন্তু শান্ত হয় নি, আরও অশান্ত হয়ে উঠেছিল। তাকে সেদিন ঘুম পাড়াতে অতসীকে বেগ পেতে হয়েছিল। সারা রাত্রি প্রায় তার শিয়রে বসেছিল। শেষরাত্রে অংশুমান ঘুমিয়ে পড়লে তার মুখের পাশে মুখ রেখে বসে বসেই ঢুলে পড়েছিল।

* * *

পরদিন সকালে উঠে সে উদ্‌ভ্রান্তভাবেই বেরিয়ে এসেছিল অতসী এবং শিবকিংকরের বাড়ি থেকে। অতসী তখনও ওঠে নি। শেষরাত্রে ঘুমিয়ে সে তখনও গাঢ় ঘুমে আচ্ছন্ন। শিবকিংকরকে নীচের তলায় ডেকে বলেছিল—আমি চললাম। ওকে বলো। না—থাক। আমি চললাম।

শিবকিংকর বলেছিল—দাঁড়াও গাড়ি ডেকে দি।

—না। পথে নিয়ে নেব ট্যাক্সি।

অধীর অশান্ত উত্তপ্ত জীবন নিয়ে যেন তার স্থির হয়ে দাঁড়াবার শক্তি পর্যন্ত ছিল না।

বিচিত্র। হয় ভাগ্য, নয় ভগবান, নয়—। নয় কি? তা সে জানে না। বলতে হয় আকস্মিক ঘটনা। না। তাই বা কেন; পৃথিবীতে, দেশে যে ঘটনাস্রোত ইতিহাসের পথ কেটে চলেছে তারই একটা স্রোতের আকর্ষণ। তেমনি একটা আকর্ষণে পড়ে সে সেই দিন সন্ধ্যাতেই অ্যারেস্টেড হয়ে গেল।

বিকেলবেলা গিয়েছিল ইউনিভারসিটি।

সেখানে দুই ছাত্রদলে বচসা থেকে হাতাহাতি হচ্ছিল তখন। এবং কিছুক্ষণের মধ্যে হাতাহাতি থেকে ক্র্যাকার এবং ইটপাটকেল ছোঁড়াছুড়ি শুরু হল। এবং বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা থেকে হাঙ্গামা ছড়াল কলেজ স্ট্রীট পর্যন্ত। এর পর এল পুলিস। এবং পুলিস লাঠি নিয়ে তাড়া করতেই সমস্ত হাঙ্গামা এবং দাঙ্গাটার মোড় বদল হয়ে গিয়ে দাঁড়াল পুলিস এবং ছাত্রের হাঙ্গামা। এরপর আর নিরপেক্ষ থাকা তার পক্ষে সম্ভবপর হয় নি। সেও নেমে পড়েছিল ছাত্রদের পক্ষে। তারপর সে নিজে আহত হয়েছিল পুলিসের লাঠিতে এবং সে ঘুঁষি মেরেছিল একজন অফিসারের নাকে। মেরেছিল সেই আগে। তা না হলে লাঠি খাবার পর তার পক্ষে আর ঘুঁষি মারা সম্ভবপর হত না। সেইটেই দাঁড়াল তার বিপক্ষে বড় অভিযোগ। আদালতে সে তা অস্বীকারও করলে না। বললে—হ্যাঁ আমি মেরেছি ঘুঁষি। উনি কি করেছিলেন তা ঠিক দেখি নি। তবে পুলিসের সঙ্গে student-দের লাগল, উনি সামনে পড়লেন আমি মারলাম। তবে ছাত্রদের বড় কটু কথা বলেছিলেন আমি তা শুনেছি।

ছ মাস জেল হয়ে গেল।

অংশু জেলে চলে গেল। শিবকিংকর ওর দিকের তদ্বির করছিল। বামপন্থী দলের উকীলেরা ওকে সমর্থনও করেছিল; অংশুমান না চাইলেও করেছিল। তারা সকলেই বললে, আপীল কর। কিন্তু তা সে করলে না। রঞ্জন, শিবকিংকর, অতসী এরাই গোড়া থেকে তার কেসের তদ্বির করছিল। তারাও তাকে আপীলে রাজী করাতে পারলে না। সই করলে না ওকালতনামায়।

লোকে তাকে খেয়ালী বলে চিরকাল! তার পরিচয় নাকি আছে তার কাজে এবং কর্মে। কিন্তু নিজের কাছে সে তা নয়। সে কোন কাজ কেন করে তা হয়তো ঠিক সে বলতে পারবে না, তবে এইটে সে বলতে পারে যে কাজটা না করলে সে নিজের কাছেই চোর হয়ে দাঁড়াত। ছাত্রদের দাঙ্গার মধ্যে তার এইভাবে নেমে পড়াটা তার খেয়াল নয়; তখনও

ইউনিভারসিটিতে নাম ছিল, সম্পর্ক ক্ষীণ হলেও বিলুপ্ত হয় নি। এবং সেদিন রাস্তা পর্যন্ত হাঙ্গামা ছড়াবার পর পুলিস যখন এল তখন ছুটে পালানো ছেলেদের মধ্য থেকে কিছু ছেলের ঘুরে দাঁড়ানো উচিত ছিল। সেই জন্যে সে ঘুরে দাঁড়িয়েছিল—মেরেছিল। এবং এইভাবে জেলেও যাচ্ছে সে এই জন্যে। হোক অচল গান্ধীবাদ। তার মধ্যে কিছু বস্তু আছে যাকে ফেলে দেওয়া চলে না। যারা কৌশলকে মাথায় রেখে আন্দোলন করে এবং আইনের ফাঁক দিয়ে দণ্ড এড়ায় তাদের 'ইনকিলাবি' বোরকাপরা ইনকিলাবি।

লোকে কিন্তু বলেছিল অংশু লীডারশিপের প্রিপারেশনের জন্যে জেলে গেল।

শচীনদা তাকে বলেছিলেন—করলে কি অংশু! জেলে গেলে গেলে, এমনি একটা বাজে ইস্যু নিয়ে গেলে! দূর দূর। দুনিয়াজোড়া ইণ্টারন্যাশানাল ইস্যু গণ্ডায় গণ্ডায় বর্ষার মেঘের মত একটার পর একটা এসে জল ঢেলে যাচ্ছে, বন্যা হচ্ছে—দেশে এস-আর-সি, বেঙ্গল-বেহার মার্জার, ফুড নিয়ে তো তেলচিটচিটে ছেঁড়া কাঁথার আগুন জ্বলছেই—এ সব ছেড়ে এই একটা বাজে ইস্যুতে জেল খাটতে চললে? তা ভাল। দিনকতক ঘুরে এস। এক্সপিরিয়েন্স থাকা ভাল।

সে উত্তর দেয় নি। জেলে চলে গিয়েছিল। উত্তর তার ছিল না। কেন সে আপীলের ওকালতনামায় সই করলে না তা স্পষ্ট ছিল না তার কাছে। তবে তার ইচ্ছে হয় নি। পৃথিবী যেন তার সহ্য হচ্ছিল না। একমাত্র বাড়িটা নিয়েই তার চিন্তা ছিল। শেষ পর্যন্ত তার ভার দিয়ে গিয়েছিল এক উকীলকে। তখন হরি চাকর তার কাছে এসেছে। হরির মাইনে এবং খাইখরচ এবং অন্য খরচ বাবদ ছ মাসের জন্যে দুশো টাকা উকীলের হাতে দিয়ে চলে গিয়েছিল। রঞ্জন বলেছিল—আরও যদি কোন কারণে দরকার হয় সে আমি দেব। আপনি ভাববেন না।

প্রথম কিছুদিন খারাপ লেগেছিল। তারপর খারাপ লাগাটা যেন মুছে গিছল বা উপে গিছল।

* * *

ছ মাসের মধ্যে দেশ থেকে এসে জেলে ইণ্টারভ্যু চেয়ে তার সঙ্গে দেখা করেছিল রমলা আর নবীনবাবু।

রমলা বলেছিল—আমি একটা খবর পেলাম না? যখন জেল হয়ে গেল, কাগজে বের হল তখন জানলাম। একটা সই করে দাও ওকালতনামায়—আপীল করব। ও খুব মামলা বোঝে। ঠিক জিতবে আপীলে।

আর এসেছিল অতসী এবং শিবকিংকর।

জিজ্ঞাসা করেছিল অতসী—হঠাৎ এ মতি হল কেন?

সে বলেছিল—জানি না।

—আপীল করবে না কেন?

—নাঃ দিনকতক বেশ থাকব।

বেশই সে ছিল। জেলে সে পড়াশুনো করেছিল আর ভেবেছিল। আর লিখেছিল।

লিখেছিল নাটক উপন্যাস ছোট গল্প গান।

লিখে মন তার ভরে নি। তবে বুকের মনের উত্তপ্ত দীর্ঘনিশ্বাস এবং ব্যাকুলতাকে সে ব্যক্ত করতে পেরেছিল। অন্ধকার পৃথিবীর ব্যর্থতার বেদনা ও আলোর জন্ম ব্যাকুলতাকে সে ব্যক্ত করতে চেয়েছিল। তা হয়তো সে পেরেছিল।

পচাধরা সমাজ; গলিত তার আদর্শ; ঈশ্বর নিছক কল্পনা, সব থেকে বড় মিথ্যা; মানুষ স্বার্থান্ধ; ঈর্ষায় হিংসায় জর্জর মানুষ লোভী; মানুষ ক্রোধে উন্মাদ। সত্য একটা অর্থহীন শব্দ। সততা একটা মধ্যযুগের বোকামি; সতীত্বও তাই, তার থেকেও বেশী, কারণ সেটা শক্ততর সংস্কারে পরিণত হয়েছে। সমস্ত কিছুকে অস্বীকার করে সে নাটক উপন্যাস লিখেছিল।

নাটকের নাম দিয়েছিল 'ব্যর্থ নমস্কারে'।

কাল্পনিক নাটক। প্রাচীনকালের পটভূমি। এক সাধকের জীবন। দুর্গম পাহাড়ের চূড়ায় ভগবানের মন্দির। সেখানে কেউ পৌছুতে পারে না। পুরোহিত পাহাড়ের মাঝখানে উঠে পূজা করে ফিরে যান। যাত্রীরাও তাই। কিন্তু প্রবাদ আছে মন্দিরে পৌছুতে পারলে দরজা খুলে যাবে এবং ভগবানের দর্শন মিলবে। সাক্ষাৎ ভগবান নিজে মন্দিরদ্বার খুলে তাকে সম্ভাষণ জানাবেন। এক সাধক প্রতিজ্ঞা করে পূজার থালা হাতে যাত্রা করেছিল। পিছনে পড়ে রইল মানুষের বসতি, তার ঘর; ঘরের দুয়ারে দাঁড়িয়ে রইল মা। প্রণয়িনী অনুনয় জানাল। বন্ধুরা অনুরোধ করলো। প্রবীণেরা ভয় দেখালে। কিন্তু সে মানলে না, চলল। মধ্যে মধ্যে বাতাসে ভেসে আসতে লাগল মায়ের অন্তিম আক্ষেপ। প্রণয়িনীর বিবাহবাসরের মন্ত্রপাঠ শব্দের সঙ্গে তার দীর্ঘনিশ্বাস। বন্ধুজনের বেদনাকাতর আক্ষেপ। তার কোনটিই তাকে বিচলিত করতে পারলে না। সে উঠেই চলেছিল। হঠাৎ একটা স্থানে এসে উপস্থিত হল যেখান থেকে শুরু হল যেন অন্য জগৎ। সব পেয়েছির দেশ। পরমানন্দের ভূমি। সম্মুখে মন্দির। দিব্য সংগীত ধ্বনিত হচ্ছে বাতাসে। দিব্য গন্ধ উঠছে চারিদিকে। আকাশ জ্যোতির্ময়তায় উদ্ভাসিত। পৃথিবীর কোন শব্দ নেই, সংবাদ নেই।

স্তব্ধ হয়ে সে দাঁড়াল।

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে সে অনুভব করলে বুঝতে পারলে সব ভ্রান্তি, সব ভ্রান্তি, সব মিথ্যা। গন্ধ নেই, জ্যোতি নেই, কোন সংগীত নেই। শুধু এতখানি উঁচু পাহাড়ের মাথায় বাতাস এত ক্ষীণ, স্বল্প, এত হালকা যে তার নিঃশ্বাস নেবার মত বাতাসেরও সংস্থান নেই।

সে থরথর করে কাঁপতে লাগল। সে পড়ল। পড়বার সময় সে বললে, প্রলাপ বকে বললে—আমার সকল প্রণাম তুমি ফিরিয়ে দাও। ফিরিয়ে দাও।

উপন্যাসেও ছিল তার এই সুর। তবে পটভূমি ছিল বাস্তব। তার মায়ের জীবন। সে কল্পনা করেছিল যে সারাজীবন মা এই আদর্শের পিছনে পিছনে ছুটে একদা ক্লান্ত হয়ে শেষ নিশ্বাস ফেলছেন এবং বলছেন—সব মিথ্যে, সব মিথ্যে। সব মিথ্যে।

* * *

বাইরে যখন এল তখন জীবনক্ষেত্র যেন তার প্রতীক্ষা করে ছিল। তাকে অভ্যর্থনা দিয়ে সমাদর করে গ্রহণ করলে।

ছ মাসে পরিবর্তন হয়েছে অনেক। পৃথিবী দ্রুত পালটাচ্ছে। তিব্বত হাঙ্গেরী সুয়েজ ভিয়েৎনাম কোরিয়া ইন্দোনেশিয়া। পাকিস্তান ভারত সমস্যা জটিলতর হয়েছে। দাঙ্গা হয়ে গেছে। ফুল মুভমেণ্টে গুলি চলেছে; ট্রাম বাস পুড়েছে।

অতসী জীবন-রঙ্গমঞ্চ থেকে অন্তর্হিতা হয়েছে। বম্বের এক ক্রিকেট খেলোয়াড়কে বিবাহ করে চলে গেছে বম্বে। সে আর ছবি করবে না।

শিবকিংকরের দ্বিতীয়া বা তৃতীয়া স্ত্রী অতসীর বোন, সে মরে গেছে। সে এবার একটি বিধবাকে গন্ধর্বমতে বা এমনই একটা কোন মতে স্ত্রীর মর্যাদা দিয়ে ঘরে এনেছে। সে এখন রঞ্জনের সঙ্গে পাট এবং কয়লার ব্যবসা করছে। তাছাড়া ছবির ব্যবসা। ছবির কারবারে প্রচণ্ড একটা আঘাত দিয়েই অতসী চলে গেছে।

রঞ্জন বলেছিল—দেখুন অংশুবাবু, আমার ফিল্ম কোম্পানি মার খেয়েছে—তবে আমি তিনপুরুষে ব্যবসাদারের ছেলে—আমি সে মার সামলেছি, সামলাব। আমি যখনই বুঝতে পেরেছিলাম যে অতসীর মন নজর আপনার দিকে তখন থেকেই আমি গুটিয়ে ছিলাম। কিছু টাকা ওকে দিয়েছি; আর আপনার কালরাত্রির রাইট কিনেছি। সে আমার আছে। তারপর আর আমি পা বাড়াই নি। অতসী গেছে গেছে, এবার ছবি করব। প্রডিউসার না, ডিস্ট্রিবিউটার হিসেবে। শিবকিংকরবাবুকে নিয়েছি সঙ্গে। আপনাকে আমরা চাই। আপনি আমাদের সঙ্গে আসুন। আপনার সব বই আমরা ছবি করব। সব নাটক ষোড়শী সংঘে প্লে করব।

'ব্যর্থ নমস্কারে' নাটিকা নিয়েই সে প্রথম ষোড়শী সংঘের আসরে নেমেছিল। এর আগে পর্যন্ত কালরাত্রিতে নামবার কথাই হয়েছিল, নামা হয় নি। জেলে যাবার ঘটনাটায় জড়িয়ে পড়েছিল

ষোড়শী সংঘ অভিজাত প্রতিষ্ঠান।

আটটি দম্পতি অর্থাৎ ষোলজন সভ্য-সভ্যা নিয়ে রসরসিকের একটি সংস্থা। এঁরাই প্রধান এবং প্রথম সভ্য। তার বাইরে আছেন আরও ষোলজন যাঁরা দম্পতি হিসেবে আসেন নি। দম্পতিদের অনুমোদনক্রমে এসেছেন।

'ব্যর্থ নমস্কারে' নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করেছিল সে নিজে। নাটিকার শেষ দৃশ্যে পূজার থালা ফেলে দিয়ে সে আছড়ে পড়ে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে আসতে আসতে মর্মান্তিক আর্তনাদ করে বলত—"ফিরিয়ে দাও—আমার প্রণাম ফিরিয়ে দাও। আমার জীবনের সকল প্রণাম ফিরিয়ে দাও।" তার প্রতিধ্বনি সারা প্রেক্ষাগৃহের প্রতিটি কোণে যেন মাথা কুটত।

"ফিরিয়ে দাও। আমার সকল প্রণাম তুমি ফিরিয়ে দাও।"

ক্রমান্বয়ে কুড়ি রাত্রি অভিনয় হল 'ব্যর্থ নমস্কারে'। কলকাতার রসিকমহলে, খবরের

কাগজের নাট্য সমালোচনার পাতায় 'ব্যর্থ নমস্কারে' নাটক এবং নাট্যকার অংশুমান চৌধুরীকে নিয়ে আলোড়নের সৃষ্টি হল।

অনেক স্বপ্ন দেখেছিল সেদিন অংশুমান। একটা আবছা কল্পনা ক্রমশঃ যেন স্পষ্ট হচ্ছিল —একটা চেহারা নিচ্ছিল।

একটা ঝড় আসছে। ঝড়ো আধকালো বিষণ্ণ ভয়াতুর ম্লানমুখ বিশ্বপ্রকৃতি। ক্রমশঃ ঘনায়মান হচ্ছে। সূর্যের উপরের জ্যোতির্দীপ্ত মেঘটুকুকেও আর খুঁজে পাওয়া যায় না। বাতাসে উড়ছে শুকনো পাতা, জঞ্জাল, ধুলো। ঝরঝর শব্দে উড়ে মিলিয়ে যাচ্ছে কোন্ নিরুদ্দেশে। এর পর হবে বর্ষণ। হয়তো এর মধ্যে হবে বজ্রাঘাত। হয়তো সমূলে গাছ উপড়ে পড়বে। হয়তো বসতি জনপদ উড়ে যাবে, ভেঙে যাবে। বন্যা আসবে, প্লাবন আসবে। আর্ত কোলাহল ক্লান্ত হয়ে থেমে যাবে। তারপর—।

এরই মধ্যে এল—।

* * *

দুই হাতে মুখ ঢেকে যেন ভেঙে পড়ে যেতে চাইলে অংশুমান। তার জীবনের স্নায়ু শিরা তার অন্তরের সমস্ত সহ্যশক্তি, সকল কাঠিন্য যুক্তি তর্ক সিদ্ধান্ত উপলব্ধি বিক্ষোভ সব কিছু যেন কঠিন টানে বাঁধা একটি বীণার সব তারগুলির একসঙ্গে ছিঁড়ে যাওয়ার মত ছিঁড়ে গেল।

সীতা। সীতা সেন।

রঞ্জন এবং শিবকিংকর তাকে নিয়ে এল। কালরাত্রি ছবিতে নামাবে। তার আগে একবার অভিনয় করে দেখে নেবে। একাঙ্কিকা হিসেবে কালরাত্রি নাটিকাটি অভিনয় করিয়ে দেখে নেবে। সীতাকেও দেখা হবে; নাটকটা থেকে ছবির সম্ভাবনাও বুঝতে পারা যাবে।

রঞ্জন বললে—অংশুদা, হিরো তোমাকে করতে হবে। আর সম্ভবপর হলে ছবিতেও নামতে হবে।

রঞ্জন তার থেকে বয়সে বড় কিন্তু এই আড়াই বছরে অংশুর ভক্ত হয়ে তাকে দাদা বলতে শুরু করেছে।

শিবকিংকর বলেছিল—আমারও তাই বলতে ইচ্ছে করে ভাই অংশু কিন্তু সেটা ভাই তোকে বড্ড ঠাট্টা করা হবে আর তোর অকল্যেণ করাও হবে। মানুষ হিসেবে আমি ইতর তা জানি। There is beast in me. I know my meanness—narrowness of mind—সব থেকে বেশী করে মনে করিয়ে দিস ভাই তুই। তোকে দাদা বললে মনে হবে এ দোষগুলোর ভাগ চাপাচ্ছি তোর ঘাড়ে। আমার দোষ তোর ঘাড়ে চাপাতে চেষ্টা তো কম করি নি। তোর পা পিছলেছে—তুই আছাড়ও খেয়েছিস। কিন্তু উঠে দাঁড়িয়েছিস সোজা হয়ে। অতসী আমাকে বলেছিল—ওকে ধরবার ক্ষমতা আমার নেই।

অংশু বাধা দিয়ে বলেছিল—আবোলতাবোল বকো না শিবকিংকরদা। তোমাদের দোষ

তো আমাদের উপর দোষ-চাপানোর জন্যে নয় শিবকিংকরদা। দোষ সব কালেই মানুষের মধ্যে আছে। মানুষ খায়, গোগ্রাসে খায়, মদ্যপান করে, নারী নিয়ে উল্লাস করে। হয়তো তা ব্যভিচার। হয়তো তা অপরাধ। এ অপরাধ এ দোষের দণ্ড যা আছে তা মানুষ ভোগ করে। আমিও ভোগ করেছি। আমার জীবন তার সাক্ষী। সে মিথ্যে সাক্ষ্য দিচ্ছে না বা দেয় না তার সাক্ষ্য তুমি দেবে শিবকিংকরদা। তার জন্যে দোষ তোমার নাই এবং তা দেব না। দোষ দেব কিসের জন্যে জান? দোষ দেব শিবকিংকরদা এই জন্যে যে, এতটুকু গুণও কেন দিতে পারলে না তোমরা বল তো? তোমাদের কালের সব গুণ এমনভাবে একালে বাতিল হয়ে গেল কেন?

ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়েছিল শিবকিংকর তার মুখের দিকে। ঠিক অর্থ সে ধরতে পারে নি। বলেছিল—কি বললি বল তো! বুঝিয়ে বল তো! বল তো!

অংশুমান বলেছিল—কি হবে তা বুঝে?

শিবকিংকরদার উত্তরটা মনে পড়ছে। চমকে দিয়েছিল শিবকিংকরদা। কথাটা সে বুঝেছিল তবে একটু দেরি লেগেছিল। এবার বিচিত্র হেসে সে বলেছিল—কিছু হবে না তা হয়তো বটে। বুঝেও তো এর প্রতিকার নেই। কিন্তু বল তো—ওকালের বড় বড় মানুষগুলো যাদের ভাঙিয়ে তোদের আজও বলতে গেলে দিন চলছে—রবীন্দ্রনাথই ধর—তাঁর গুণ—কিংবা তাঁকে এই কথাটা বলতে পারিস?

চুপ করে গিয়েছিল সে। বলতে হয়তো পারতো সে যে, মেনে কি চলছি এ যুগে আমরা? প্রশ্নটা তো আমার তাই। কেন চলছি না? কিন্তু তা বলে নি।

রঞ্জন কথাটা চাপা দিয়ে বলেছিল—দেখ কোন্ কথায় এসে পড়লে দেখ। অংশুদা, তুমি ভাই ছেলেবেলার পড়া-ধরা প্যাঁচটি ছাড়। তাহলে আর ষোড়শী সংঘের ড্রপ উঠবে না। যে কৃষ্ণপক্ষ লেগে আছে তার আর শেষ হবে না। অমাবস্যা আর পোয়াবে না।

অংশুমান হেসে ফেলেছিল।

অমাবস্যা পোয়ানো কথাটা সেই প্রচলন করেছিল। ষোড়শী সংঘের আসল নাম Full Moon Club; সেকালে যাঁরা এটা চালু করেছিলেন তাঁরা ছিলেন খাঁটি বাঙালী সাহেব। সবাই ছিলেন ব্যবসাদার। ডালহৌসী অঞ্চলে ক্লাইভ স্ট্রীট থেকে সোয়ালো লেন লালবাজার পর্যন্ত এক একটা আপিসের মালিক। টাইসমেত চোস্ত নিখুঁত সায়েবী পোশাক পরে আপিসে আসতেন। বড় বড় সায়েব কোম্পানি—বার্ড হিলজার্স জার্ডিনস্কিন কোম্পানির সায়েবদের আপিসে আড্ডা জমাতেন, দালালি করতেন, মাল কিনতেন বেচতেন; তাঁরা একসঙ্গে ব্রোকারস, এজেন্টস, মারচেন্টস অনেক কিছু ছিলেন। খুব ভাল ইংরিজী বলতেন; সংস্কৃতির চর্চা করতেন; থিয়েটারে যেতেন; গানবাজনা শুনতেন; সভাসমিতির সভাপতি হতেন; চাঁদা দিতেন। এরই মধ্যে একটি তরুণের দল গড়ে উঠেছিল; যাঁরা সন্ধ্যেবেলা স্নান করে পাউডার মেখে কোঁচানো ধুতি পাঞ্জাবি পরে উত্তর কলকাতার বিশেষ পল্লীতে আপন আপন অর্থমূল্যে ক্রয়-করা বান্ধবীর বাড়ি এসে গান শুনতেন; পান করতেন, পান খেতেন। এবং মধ্যে মধ্যে একত্রিত ভাবে বাগানবাড়ি করতেন। গল্পে রাজপুত্র মন্ত্রীপুত্র কোটালপুত্র বণিকপুত্র

চার পুত্রের কথা আছে। এঁরা দৈবক্রমে আট পুত্র হয়েছিলেন। এই আটজনে আকস্মিকভাবে এক পূর্ণিমায় বাগানবাড়িতে সমবেত হয়ে চাঁদের আলোয় বিমোহিত হয়ে স্থির করেছিলেন তাঁরা মাসে মাসে প্রতি পূর্ণিমায় মিলিত হবেন। একক নয়—আপনাপন বান্ধবী নিয়ে। আট দুগুণে ষোলজন। বিচিত্রভাবে ষোলকলায় পূর্ণ চন্দ্রকে আকাশে রেখে এঁরা ষোলজনে মর্ত্যভূমের ষোলকলার মত সমবেত হতেন।

কালান্তরের সঙ্গে রূপান্তর অবশ্যম্ভাবী। সভ্যদের বয়স হল; ১৯৩০ সাল পার হল। কয়েকজন সভ্যের লোকান্তরও ঘটল। নূতন সভ্যরা এলেন। নূতন নিয়ম হল। নিয়ম হল সভ্যেরা বান্ধবী নিয়ে আসবেন না—তাঁরা দম্পতি হয়ে জোড়ে জোড়ে আসবেন। মেয়েরা রান্নাবান্না করবেন খাওয়াবেন—তাঁদের চিত্তবিনোদন করবার জন্য আসবেন নামকরা আর্টিস্ট যাঁরা তাঁরা।

ওস্তাদ আসবেন—রবীন্দ্রসংগীত গায়ক-গায়িকা আসবেন—কীর্তন-গায়িকাও আসবেন। আসরে প্রত্যেক দম্পতি একটি বন্ধুদম্পতি আনতে পারবেন। পানীয় আগে ছিল প্রচুর। এখন পানীয়ের ক্ষেত্রে বন্যা নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি চালু হল।

এই ধারাতেই ষোড়শী সংঘ এখন একটি ক্লাবে পরিণত হয়েছে এবং শুধু ব্যবসায়ীদের মধ্যেই আবদ্ধ নয়। সভ্য সেই আটটি দম্পতি এবং তার সঙ্গে এখন ষোলজন বন্ধু অ্যাসোসিয়েটেড মেম্বার আছেন। তাঁরা দম্পতি নন। এবং এখন ষোড়শী সংঘের কার্যক্রম অভিনয়ের ইঞ্জিনেই টেনে নিয়ে চলে। অভিনয়ের আগে বই ধরার পরও ঠিক নয়, রিহারস্যালের দিন থেকেই জমতে শুরু করে। এবং অভিনয়ের দিন পর্যন্ত সে যেন শুক্লপক্ষের চাঁদের মত কলায় কলায় বাড়তে থাকে। অভিনয়ের দিন হয় পূর্ণিমার উদয়। তারপরই কৃষ্ণপক্ষ। সভ্যদের আসা বন্ধ হতে থাকে। ক্রমে এমন হয় যে কেউ আসে না।

বেয়ারা বাতি জ্বেলে নিভিয়ে দেয়।

রঞ্জন সম্পাদক—সে কোন দিন এসে খবর নেয়, কোন দিন টেলিফোনে বলে—বেয়ারাকেই বলে—কেউ এলে বলিস আজ আমি কাজে ব্যস্ত আছি।

এককালে সংঘটির সঙ্গে পূর্ণিমার সম্পর্ক ছিল এবং আজও আছে বলে স্বাভাবিকভাবেই ওরা নিজেরাই এ সময়টিকে বলত কৃষ্ণপক্ষ। এবং একেবারে বন্ধ হয়ে থাকত যে সময় সে সময়টাকে বলত অমাবস্যা। এই উপমাটি কে চালু করেছিল কেউ জানে না।

অংশুমানের 'ব্যর্থ নমস্কারে' অভিনয়ের সময় শচীনদা হঠাৎ বলেছিলেন—কৃষ্ণপক্ষের অমাবস্যা পার হল তাহলে। কি বল অংশুমান, তাহলে আজকের তিথিটিকে শুক্লা প্রতিপদ বলা যায়?

অংশুমান তাঁর কথাটির সূত্র ধরে রিহারস্যালের নোটিশের জন্য একটি আধা কবিতা রচনা করে একটা কাগজে লিখে রঞ্জনের হাতে দিয়ে বলেছিল, চমৎকার হবে। এই নোটিশ ইস্যু করুন।

"অমাবস্যা অবসানে, ষোড়শী সংঘের শুক্ল শুক্লা প্রতিপদ আগামী···তারিখে। চাঁদের কলারা সব যেখানে যে কাজে আছ অবশ্য অবশ্য এস—এই বার্তা ছুটে যাও দিকে

দিগ্বিদিকে।"

এটা সংবাদপত্রে ছাপানো হবে এই নিয়ম হয়েছে।

এবারকার অমাবস্যাটা, অর্থাৎ 'ব্যর্থ নমস্কারে' অভিনীত হবার পর থেকে অমাবস্যাটা যেন, বেশী দীর্ঘ অমাবস্যা গেছে। কারণ বোধ হয় অতসী। এ-কালে অতসীই ষোড়শী সংঘের সেই চন্দ্রকলাটি হয়ে উঠেছিল যেটি শুক্লা প্রতিপদের দিন থেকে উঠে পূর্ণিমা পার করে কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশীর শেষরাত্রে ভোরের মধ্যে মিলিয়ে যায়। সম্পাদক রঞ্জনও যেন উৎসাহ পাচ্ছিল না তার অভাবে।

সেদিন উৎসাহিত হয়ে রঞ্জন অংশুমানকে 'কালরাত্রি' অভিনয়ের কথা তুলে বলেছিল—ছোট ছেলেকে পড়া ধরে মুখ বন্ধ করার প্যাঁচটি ছাড় ভাই অংশুমা। তাহলে ষোড়শী সংঘের এ অমাবস্যা আর পোয়াবে না।

রঞ্জন সোজা সহজ মানুষ। রঞ্জন সম্পর্কে একটা কথা সবাই বলে; বলে—He is a sport. খাঁটি খেলোয়াড়। সে কাজ চায়। তার জন্যে সে সব করতে প্রস্তুত। এবং তার ইদানীং সংকল্প হয়েছিল ষোড়শী সংঘ এবং অংশুমানকে জড়িয়ে বড় করে তুলবে।

লোকে বলে এই সংকল্পের আড়ালে আর একটি সংকল্প আছে। সেটি তার ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউশন এবং প্রডাকশন কোম্পানি। যাঁরা আরও গভীর তত্ত্বগ্রাহী তাঁরা বলেন আরও গভীর—আছে আরও জটিল সত্য। সেখানে রঞ্জন নাকি নারীবিলাসী।

রঞ্জনকে প্রশ্ন করলে বলে—তা যে একেবারে নই তা বলতে পারব না। সুন্দরী তরুণীর প্রতি প্রলোভন আমার আছে। তবে কাউকে পথভ্রষ্ট আমি করি না।

এদিক দিয়ে শিবকিংকরের সঙ্গে রঞ্জনের মিল আছে। তবে ষোড়শী ক্লাবে সে তার ধর্ম-পত্নীকে নিয়েই আসে।

সেদিন অমাবস্যা পোয়ানোর কথায় অংশু প্রশ্ন করেছিল—কিন্তু ষোলকলার প্রথম কলা ছিল অতসী। তার স্থানে কে উদয় হবেন। শিবকিংকরদার তৃতীয়া তো একেবারে গৃহিণী। রন্ধনশালায় তরিতরকারিতে চলবেন—মানে তিনি তো কাঁচা কদলী; পুজোর জন্যে ষোলকলার এককলা যে পাকা কলা।

শিবকিংকর বলে উঠেছিল—আমার বউ কাঁচা কদলী কিন্তু রঞ্জন কাঁচা ছেলে নয়। তাকে আমি দেখিয়েছি সীতা সেনকে। জিজ্ঞাসা কর ওকে।

রঞ্জন বলেছিল—ভাল মেয়ে ভাই। এ যদি ধোপে টেঁকে তবে ছবির জগতে নতুন তারা উঠে যাবে। অতসীর মত ব্রাইট নয়, কিন্তু সীতা সেন ভারী মিষ্টি মেয়ে।

শিবকিংকর বলেছিল—তাছাড়া খুব মডার্ন মেয়ে। লেখাপড়াজানা মেয়ে, চমৎকার ইংরিজী বলে। and—খুব সম্ভব পার্টও করবে খুব ভাল। তবে বলা ভাল তার ষোড়শী সংঘে আসার প্রধান আকর্ষণ তুমি।

—আমি?

—হ্যাঁ। তোমার নাম শুনে তবে রাজী হয়েছে।

একটু হেসেছিল অংশুমান। স্পষ্ট মনে পড়ছে তার পুরুষ লেখক চিত্তের অহংকৃত এবং পুলকিত হয়ে ওঠার কথা। একে একে মনে পড়ে গেল অতসীকে রমলাকে এবং নমিতাকে। অতসীকে সে করুণা করে। অংশু তাকে ভালবাসতে চেয়েছিল কিন্তু ভালবাসতে দেয় নি তাকে অতসীই। দোষ অতসীকে দেবে না অংশুমান। অতসী মনের অস্পৃশ্যতা কাটিয়ে কোন মতে উপরে উঠে আসতে পারলে না। আর তার নিজের কাছেও সে-দিন ভালবাসা বলে কিছু ছিল না। তার চর্চা করেছিল সে। প্রেম ভালবাসা যদি বা সেকালে ছিল—কোন প্রকারে অতীত কালের বিলুপ্ত প্রাণীদের মত সেকালের সমাজে জন্মাতো—তাহলে একালে কাল পালটানোর সঙ্গে ভালবাসা প্রেম বিলুপ্ত নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। জীববিজ্ঞান দেহবিজ্ঞান তন্নতন্ন করে খোঁজো তার কোন সন্ধান পাবে না। সে নিজে ভালবাসা দিতে গিয়ে দেখেছে সে যা দিতে চেয়েছিল তা নিছক করুণা। এবং তার সঙ্গে অতসীর পেলব কোমল দেহখানির উপর লোভ।

রমলা নিজেকে তার পায়ে ঢেলে দিতে এসেছিল। সেও তার প্রতি প্রলুব্ধ হয়েছিল। কিন্তু অংশুমান তাকে নেয় নি, প্রত্যাখ্যান করেছিল। রমলা বিয়ে করলে এক বুড়োকে। সে তাকে ভালবাসে না। কিন্তু অন্নবস্ত্র আশ্রয়ের জন্য করতে বাধ্য হয়েছিল। এরপর আসে নমিতা। ঠোঁটের ডগায় তার বাঁকা হাসি ফুটে উঠেছিল। ওকে বাদ দাও। নমিতাকে বাদ দাও।

একখানা শক্তিশালী নাটকের কিছু সংলাপ অংশুর বড় ভাল লাগে। নায়ক নায়িকাকে এক জায়গায় বলেছে—"বিমলা সংসারে লক্ষ্মীদেবীকে সকলেই পূজা করে কিন্তু লক্ষ্মীর বাহন পেঁচা চিরকালই ঘৃণ্য জীব।" নমিতাটা একটা পেঁচকী। তবু আশ্চর্যের কথা এই যে—রমলারা থাকবে না। থাকবে অতসীরা এবং নমিতারা। এ পিঠ আর ও পিঠ।

—তোমাকে সে চেনে।

বিস্মিত হয় নি অংশুমান। তাকে চেনা আর বিচিত্র কি? নূতন কালের মানুষের মনের কথা বলতে যে চায়, যে বলে, তাকে একালের ছেলেমেয়ে চিনবে বইকি!

—তোমার বাড়িতে ইলেকট্রিক্যাল রান্নার ইউটেনসীল বেচে গেছে। ইলেকট্রিক কেতলি, ইলেকট্রিক্যাল কুকার। বললে ওকে চা বানিয়ে খাইয়ে এসেছি। হরির নাম করলে।

চকিত হয়ে উঠেছিল অংশুমান।

মুহূর্তে মনে পড়ে গিয়েছিল।

ঠিক পুজোর আগে—এই মাস তিনেক হল। অক্টোবর নভেম্বর ডিসেম্বর। আড়াই মাস হবে—অক্টোবরের বারো চোদ্দটা দিন এবং ডিসেম্বরের এখনও বাকী বারো দিন বাদ দিয়ে। সেদিন সে বাইরের বারান্দায় বসে ছিল।

চেয়ারে বসে সে বিষণ্ণ মনেই আকাশের দিকে তাকিয়েছিল। পুজো আসছে। আকাশে শরতের মেঘ ভেসে যাচ্ছিল। গাঢ় নীল আকাশ—ভেসে যাচ্ছিল পুঞ্জ পুঞ্জ পেঁজা তুলোর মত

সাদা মেঘ। সূর্য দিগন্তে নেমেছিল। লাল ছটার আভা প্রতিফলিত হচ্ছিল মেঘের গায়ে।

সেদিন, দুপুরবেলা হঠাৎ পূর্ব পাকিস্তানের ধাক্কায় কলকাতায় হিন্দু মুসলমানের আক্রোশ আবার জলবার মত উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। তার বাড়িতে দুটি মুসলমান ছুতোর মিস্ত্রী দেওয়াল আলমারির কাজ করছিল। তারা সকালে যখন এসেছিল তখন কোন উত্তাপ ছিল না। অকস্মাৎ দুপুরে ঘটেছে কয়েকটা ঘটনা। যার জন্য সে ট্যাক্সি ডেকে তাদের সঙ্গে নিয়ে পৌঁছে দিয়ে এসেছে ওয়েলেসলী স্কোয়ারের কাছে। সেই পৌঁছে দিয়ে এসে চেয়ারে বসে বিষণ্ণ মনেই আকাশের দিকে তাকিয়ে ভাবছিল এই ধর্ম নিয়ে বিরোধের কথা।

ভাবতে ভাবতে ইচ্ছে হয়েছিল লিখে রাখি কথাগুলি। তার নোটবই আছে—'অথারস্ নোটবুক'; টুকরো টুকরো চিন্তাগুলিকে সে লিখে রাখে। তাতে সে যা লিখেছিল সে লেখা সে পরে বড় করে লিখে বাঁধিয়ে রেখেছে। ওই ঝুলছে। "ঈশ্বর মৃত, ধর্ম মিথ্যে। তবু এদেশে হিন্দু এবং মুসলমানের দাবিতে দেশ ভাগ হয়ে গেল এবং তাই নিয়ে রক্তপাতের শেষ আজও হল না। ওপাশে হিন্দু মরছে, এপাশে মুসলমান মরছে। মৃত ঈশ্বরের প্রেতাত্মারা মানুষের ঘাড়ে ভর করে অট্টহাসি হাসছে এবং এ ওকে ধ্বংস করতে চাচ্ছে। আমি ঈশ্বরকে মানি না, কিন্তু তার প্রেতের ভয় থেকে তো নিষ্কৃতি পাই না।"

মনে আছে, এইটুকু লেখে সে আকাশের দিকে তাকিয়েছিল। মনে পড়েছিল সে দিন একটা রাশিয়ান উপগ্রহ কক্ষপথে কলকাতার মাথার উপর দিয়ে বেরিয়ে যাবে। যন্ত্রযোগে চেষ্টা করলে তার 'পিপ পিপ' শব্দ শোনা যাবে। মনে পড়ছে, মনে হয়েছিল নিশ্চিন্ত, শান্ত জীবন চিরকালের মত শেষ হয়ে গেছে। মনে পড়েছিল দেবগ্রামের জীবন। ভোরে উঠে নিশ্চিন্ত বায়ুসেবন, ব্যায়াম, দুধ-মুড়ি-গুড় খাওয়া, কিংবা চারখানা লুচি খাওয়া। বাবা সকাল থেকে খানিকটা কাজকর্ম দেখতেন, খানিকটা মাঠে বেড়াতেন, খানিকটা কংগ্রেস করতেন। তারপর স্নান, খাওয়া, ঘুম, বিকেলে আড্ডা। এ সব আর নেই, এ সব বিগত। পাখীর ডাক, ফুলের গন্ধ, আকাশের মেঘ—সব আছে কিন্তু মানুষের কাছে তা থেকেও নেই। এ সব তার চোখে পড়েই নি।

এরই মধ্যে রাস্তা থেকে ভেঙে তার বাড়ির সামনে এসে দাঁড়িয়ে বলেছিল—নমস্কার।

তার দিকে চোখ ফিরিয়ে মনে হয়েছিল হঠাৎ সন্ধ্যাটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। দীর্ঘাঙ্গী উজ্জ্বল কাঞ্চনবর্ণা একটি মেয়ে, পরনে আগুনের শিখার রঙের নাইলনের শাড়ি, লাল সাটিনের ব্লাউস, পায়ে গাঢ় লাল রঙের স্যাণ্ডেল, এরই মধ্যে ভারী একটি মিষ্টি মুখ, উজ্জ্বল দুটি চোখ, তেল-চিকণ চুলে দুই বেণী করে বাঁধা খোঁপা। বাড়ির বারান্দার নীচে দাঁড়িয়ে সিঁড়িতে পা দিয়ে হাত দুটি তুলে নমস্কার করে মুখে বলেছিল—নমস্কার।

মনে পড়ছে ডান হাতে ছিল একগাছি সোনার রুলি, বাঁ হাতে কালো ফিতের ব্যাণ্ডে বাঁধা রিস্টওয়াচ। গলায় ছিল লাল পলা আর সোনার মটর মিলিয়ে গাঁথা একগাছি হার। কানে? কানে কি ছিল? ছিল রিঙ-মাকড়ি।

অংশুমান কয়েকটা পলক ফেলেছিল। এই দুঃস্বপ্নের মত জটিল চিন্তার মধ্যে এমন একটি

শ্রীময়ী রূপ দেখবার এবং সংগীতময়ী কণ্ঠ শুনবার জন্ত প্রস্তুত ছিল না। মুহূর্ত দুই পরে সে প্রতিনমস্কার করে বলেছিল—কিছু বলছেন?

সে বলেছিল—আমি একটু বাড়ির ভেতরে মেয়েদের সঙ্গে দেখা করব।

অংশুমান বলেছিল—কি চান বলুন? ইলেকশন? না কনফারেন্স?

মেয়েটি সপ্রতিভ, বলেছিল—না। ইলেকশন নয়, পার্টি নয়। খুব ঝরঝরে ক্যানভাসিং।

অংশু বলেছিল—যা বলবার আমাকেই বলুন। বাড়িতে মেয়ে বলতে কেউ নেই।

মেয়েটি বলেছিল—তা হ'লে অন্ত দিন আসব। বলেই সে চলে যেতে উদ্যত হয়েছিল।

অংশুমান ডেকে বলেছিল—সে দিনও মেয়েদের কাউকে পাবেন না। আমি ব্যাচিলর। মেয়েটি চকিতে ঘাড় ফিরিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়েছিল।

সব মনে পড়ে গেল অংশুমানের।

রঞ্জন এবং শিবকিংকর মেয়েটি প্রসঙ্গে সেই কথাগুলি মনে করিয়ে দিতেই, তাকে আশ্চর্য স্পষ্টভাবে মনে পড়ে গেল। সীতা সেন! চমৎকার মিষ্টি মেয়ে।

শিবকিংকর বললে—খুব মডার্ন মেয়ে।

রঞ্জন বললে—যদি উতরে যায় তা হ'লে দাদা নিউ স্টারের উদয় হবে।

সেই কথা ধরেই অংশুমান জিজ্ঞাসা করেছিল—হ্যাঁ চেহারা ভাল। কিন্তু অভিনয় করেছে কখনও?

রঞ্জন বলেছিল—না তা করে নি। তবে পারবে বলেই আমার বিশ্বাস। সহজে রাজীই হয় না। হঠাৎ তোমার নাম করলাম—মানে আমার আর শিবকিংকরবাবুর মধ্যে কথা হচ্ছিল। শুনে বললে—লেখক অংশুমান চৌধুরী? বললাম—হ্যাঁ। বই ওঁর। হিরো উনি। আমাদের ক্লাবের মেম্বার উনি। তা ছাড়া শচীন সেনগুপ্ত আমাদের পেট্রন। তখন বললে—ওঁরা যখন আছেন তখন নামতে পারি।

শিবকিংকর বললে—নামবে এবং ও মেয়ে বেরিয়ে যাবে। দেখে নিয়ো। আমি বিশদ বিবরণ দিচ্ছি। শোন। গিছলাম চিড়িয়াখানা। বাণিজ্য করতে গিছলাম। কিছু মাল সাপ্লাইয়ের ব্যাপার ছিল। হঠাৎ কলরব করে যেন একদল সাইবেরিয়ান হংস এসে ঝপঝপ করে নেমে পড়ে কলরব তুলে দিলে। দেখলাম একদল তরুণ তরুণী যুবক যুবতী, প্রৌঢ় প্রৌঢ়া, বাঙালী দেশী ক্রীশ্চান, একজন অ্যাংলো মেয়ে, সবসুদ্ধ জন দশেক এসে ঢুকল—হাতে তাদের খাবার প্যাকেট। দেখেই বুঝলাম সারাদিনের প্রোগ্রাম, পিকনিক করতে এসেছে। দেখেই মনে হল এ মেয়ে ছবিতে নামতে পারে। এবং নামলে বাজার মাৎ করতে পারে। গোল হয়ে বসে ওরা সকলেই সিগারেট খাচ্ছিল। দেখে আরও বিস্ময় লাগল। গায়ে পড়ে আলাপ করলাম। দেশলাই এক্ষেত্রে আলাপের মোক্ষম অস্ত্র। ওরা দেশলাই দিলে, আমি সিগারেটের টিনটা সকলের দিকে বাড়িয়ে ধরলাম। পরিচয় করলাম, চা পান করালে ওরা। বিবরণ শুনলাম—ওরা হল জেনিথ অ্যাণ্ড কোম্পানির ক্যানভাসার এজেন্টের একটি দল—তাদের ক্লাবের অ্যানিভার্সারি সেলিব্রেট করতে এসেছে। Eat, Drink and Be Merry Club, সংক্ষেপে Edabem। যদে ক্লাবের একজন এসেছেন চীফ গেস্ট হয়ে। এ মেয়েটি

খুব কাশছিল সিগারেট টেনে। বুঝলাম নতুন খাচ্ছে, অভ্যেস নেই। বললেও তাই। আজকে সকলকে খেতে হবে। আমি বললাম—ছবিতে নামবে? চুপি চুপি বললাম অবিশ্যি। বললে—সত্যি বলছেন? বললাম—ঠিকানা নাও, যাচাই করে দেখ। তারপর বললে—পারব আমি? আমি বললাম—পারবে মানে—? হিট্ করে বসবে। আমি গ্যারান্টি দিচ্ছি। দিন দশেক আগে হঠাৎ একদিন সকালে এসে হাজির। শুনলাম যাচাই করেছে। তখন রঞ্জনকে ডেকে আলাপ করালাম। রঞ্জন খুশী হল। কিন্তু মেয়েটা বেঁকে বসল। অতঃপর সঙ্কটভঞ্জন নাম, শ্রীমান অংশুমান, এনে দিল পরিত্রাণ, বল হরি হরি। সে বিবরণ রঞ্জন বলেছে। শুনেছ।

একটু হেসে বললে—সুতরাং অতঃপর শুক্লা প্রতিপদের নোটিশ ইস্যু করতে আপত্তি হওয়া উচিত নয়। শচীনদার কাছে আগেই গিছলাম। তিনি শুয়েছেন বিছানায়, তাও উঠে বসলেন। বললেন—"উৎসাহে বসিল রোগী শয্যার উপর।" প্রমাণ দেখে নাও। আরম্ভ করে দাও। তবে কন্যাটিকে একবার আমার কাছে এনো। তাকে দুটো সদ্‌কথা বলব। শুনবে না, তবু বলব। হয়তো আমাদের কথা সদ্‌কথা হলে সেকালের সেই রামায়ণের রামের পিতৃসত্য পালনার্থ বনে যাবার কথার মত absurd হতে পারে। তা হলেও বলব। রাম was a very good boy of his time but is a বোকা অ্যাণ্ড হাঁদারাম in our time. আমাকে এক ব্যারিস্টার বলেছিল—রামের ব্রিফ যদি আমি পেতাম তাহলে কৈকেয়ী অ্যাণ্ড মন্থরার ষড়যন্ত্রের হাঁড়ি হাটের মাঝখানে ভেঙে দিতাম।

সীতাকে নিয়ে রঞ্জন গিছল তাঁর কাছে। সেও সঙ্গে ছিল। কিন্তু সে রিহারস্যালের পরে।

* * *

প্রথম রিহারস্যালের দিন অংশুমান আগ্রহসত্ত্বেও যেতে একটু দেরি করেছিল। কারণ সে জানত—প্রথম দিন ওই যে আটটি দম্পতি তাঁরা মিলিত হয়ে বেশ একটু আড়ম্বর সৃষ্টি করতে চাইবেন। অবস্থাপন্ন অর্থাৎ অর্থানুকূল্যের যে একটি বিশেষ পরিচয় আছে—যা দিয়ে সাধারণ মানুষের সমাজে ঈর্ষা বিদ্বেষ এবং যাকে বলে চোখটাটানি তাই সৃষ্টি করতে চায় তারই একটা বাহুল্য ঘটবে। এবং পরস্পরকে সম্ভাষণের মধ্যে ব্যবসাবাণিজ্যের কথা হবে, হয়তো বা কিছু পলিটিক্স আলোচনা হবে। কেউ বাংলার grand old young man ডাক্তার রায়ের কথা বলবেন, কেউ বলবেন প্রফুল্লদা মানে সেনের কথা। অতুল্যদা বাদ যাবেন না। ওদিকে প্রাইম মিনিস্টার থেকে অশোক সেন, কবীর সাহেব, সিদ্ধার্থ রায়, জ্যোতি বোস পর্যন্ত জিন্দাবাদ হবেন, মুর্দাবাদ হবেন। দেশের ফুড, এগ্রিকালচার, ইউনিভারসিটি, হোম, পুলিস সম্বন্ধে কঠোর সমালোচনা হবে। এ ছাড়া হাঙ্গেরী আছে, সুয়েজ ক্যানেল আছে, সদ্যজাগ্রত আফ্রিকা আছে। ইন্দোনেশিয়ায় বড় বড় দুটো দাঁতওয়ালা সুকার্ণো আছে। চীনে মাও সে তুঙ আছে। কোরিয়ায় সিঙ ম্যান রী আছে। হো চি মিন আছে। সব থেকে বেশী করে আছে রাশিয়ার সদ্যোত্থিত রসিক, শক্ত মনুষ্য নিকিতা ক্রুশ্চেভ।

এদের সম্বন্ধে আলোচনায় প্রথম আসরটা একেবারে মেছোহাটা হয়ে উঠবে। এতে

অন্ততঃ তিন কোয়ার্টার যাবার কথা। তার আগে প্রথম পনের মিনিট হ্যালো হ্যালো ব্যাপার। কেমন আছেন? You look very smart, ah—very very smart; আপনার খোকন কেমন আছে? ক্রমে আসবে বিজনেসে। তারপর আসবে কোল্ড ড্রিঙ্ক।

ক্লাব ঘরখানা সত্যিই সুন্দর।

বেশ একটা বড় হল মাঝখানে। দুপাশে দুখানা ঘর। একটা বিলিয়ার্ড টেবিল আছে। অবশ্য বনাতে বড্ড বেশী ধুলো পড়েছে। একটা ঘরে পার্টিশন দিয়ে দুভাগ করে একদিকে সেক্রেটারীর ঘর অন্যদিকে ছোটখাটো ক্যান্টিন। চা কফি হয়। কোকাকোলা সোডা আইসক্রীম মেলে—কড়া পানীয় মেলে না, তবে অকেশন হলে আমদানী করা হয়।

বড় হলটায় তিন দিকে দেওয়াল ঘেঁষে তাকিয়া। একদিকে চেয়ার সোফাসেট। মাঝখানটায় রিহারস্যাল হয়, গানবাজনা হয়।

আটটি দম্পতির প্রথম জন রঞ্জন—তার স্ত্রী আধুনিকা—ভাল গান গায়—মিষ্টি মেয়ে, সিনেমা দেখে, থিয়েটারেও ঝোঁক—তবে সে কমিক রোল করতে চায়। শিবকিংকর আগে দম্পতি ছিল এখন একা; সে ম্যানেজমেন্ট করে। নরেন বোস লেখাপড়াজানা লোক—একটুআধটু লেখে, দালালি করে, তার স্ত্রী অমিয়া ক্রিটিক; বিমল রায় নামকরা ব্যারিস্টারের ছেলে—নিজেও বিলেতফেরত কিন্তু পাস কিছু করে নি, এখানে এসে টুরিস্টদের এদেশ দেখায়, এদেশের কিউরিও বিক্রি করে, বিমল রায়ের স্ত্রী সত্যিকারের সুন্দরী মেয়ে তবে বড় বেশী সোফিস্টিকেটেড। স্বামীর খাতিরে এদের সঙ্গে মেশেন তবে সে ওই দু'চার দিন।

এ ছাড়া জে. চ্যাটার্জী, পি. মুখার্জী আর. বোস আছেন। এঁরা সব কোল প্রিন্স। একজন ডাক্তারও আছেন। ইণ্ডিয়ান পলিটিক্সের ইঞ্জিনরুমে এঁদের অবাধ যাতায়াত। ইচ্ছামত এ ইক্রুপ ও নাট কখনও টাইট করেন কখনও আলগা করে দেন। কংগ্রেস থেকে কম্যুনিস্ট পার্টির কাণ্ড থেকে ডালপালা ফ্যাকড়া নিয়ে যে নানান পার্টি আছে তাদের প্রত্যেকের সঙ্গেই এঁদের অত্যন্ত প্রীতির সম্পর্ক। এঁদের প্রথম মেলামেশা এবং আলাপ বৈচিত্র্যের উপমা একমাত্র বোধ করি ময়ূরের মেলে-ধরা পেখমের মত। মনোরম তাতে সন্দেহ নেই। মৃদু মধ্য এবং মধ্যে মধ্যে উচ্চ হাসিতে তালে তালে মুখরতা, সে বেশ লাগে কিন্তু তা অংশু পছন্দ করে না।

হ্যাঁ ওঁদের সঙ্গে আরও ক'জনের নাম আছে। একজন মিনু মাসীমা। অন্যজন বড়দি।

এককালে মিনু মাসীমা মধু বোসের সি-পি-এ দলের একজন বড় উৎসাহদাত্রী ছিলেন। তাদের সাজানোগোজানোর ক্ষেত্রে মাসীমার অনুমোদন ছাড়া কোন মেক-আপই গ্রাহ্য হত না। আলিবাবা নাটকে তিনি আলিবাবার বেগম ফতিমা বিবির ডুপ্লিকেট ছিলেন। বড়দি তার থেকেও বেশী—তিনি বিলেতফেরত মেয়ে—অধ্যাপনায় নেমেছিলেন কিন্তু তাঁকে বিয়ে করেছিলেন একজন ধনীর ছেলে—তিনিও অবশ্য বিলেতফেরত ছিলেন। উনি তাঁরই বিধবা। এমনই জনের সংখ্যা কম নয়—ষোল জন। অবশ্য শচীন সেনগুপ্ত, অংশুমান এরাও তাঁদের মধ্যে।

এঁদের আলোচনায় এবং প্রারম্ভিক গৌরচন্দ্রিকা বা প্রলোপের স্বরূপের সঙ্গে অংশুমানের

পরিচয় আছে বলেই সে বিলম্ব করে পৌঁছেছিল সেদিন।

এই দিনের সেই স্মৃতি সেই ছবি তাকে বিচলিত করে তুললে আজ। সে কোন ১৯৫৫ সালের এক ডিসেম্বর মাস। আর আজ ১৯৫৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাস। এতকাল পর আজ মনে পড়ছে, যেন মাত্র ক'দিন আগে দেখা ছবি।

সে যখন গিয়ে পৌঁছুল তখন সকলেই এসে গেছেন—মিনু মাসীমা, বড়দি পর্যন্ত। শচীনদা অসুস্থ। সকলে প্রত্যাশা করে আছেন তাঁর এবং আজ যে নূতন আসবে তার। সীতার অপেক্ষায় আছেন।

সম্ভবতঃ সীতা সম্পর্কে বক্র এবং তীক্ষ্ণ অথচ মধুসিক্ত আলোচনাই চলছিল। সব থেকে মুখর ছিলেন রঞ্জনের স্ত্রী এবং নরেন বোসের এম-এ পাস ক্রিটিক স্ত্রী।

কথাটা তিনিই বলছিলেন—ব্যাটাছেলেদের ওই, ওই ওদের মাপকাঠি—যা নতুন তাই স্বর্গীয় অথবা অপরূপ। অবশ্য এক হিসেবে ভুল নেই কারণ যে রূপটি দেখি নাই যা নাকি নবরূপ তাই হল অপরূপ।

অংশুমান এসে বসতেই আলোচনায় ছেদ পড়েছিল। কিন্তু মিনু মাসী ছাড়েন নি—বলেছিলেন—আমাদের ড্রামাটিস্ট-হিরো কি বলেন?

অংশু হেসে বলেছিল—আমি মাসীমা কিছুই বলিনে।

রঞ্জন বলেছিল—জুতোর শব্দ উঠছে। বোধ হয় শিবদা মিস সেনকে নিয়ে এসে গেছেন। পরক্ষণেই বললে—এই যে এসে গেছেন।

খোলা দরজার দিকে তাকিয়ে বসে ছিল রঞ্জন।

সকলেই ফিরে তাকালেন দরজার দিকে।

ঢুকল একটি মেয়ে। সত্যি চমৎকার দেখতে। রঙে উজ্জ্বল গৌরী তপ্ত কাঞ্চনবর্ণা এবং সুলোচনা, তার উপর ত্বকে একটি কোমল লাবণ্যের মসৃণতা আছে। পার্টে যেমন দরকার তেমনিই একটু দীর্ঘাঙ্গী; ছোট কপাল, চোখ দুটি বেশ টানা-ডাগর, ঠোঁট আর চিবুক ভারী সুন্দর, সবচেয়ে সুন্দর দাঁতগুলি, হাসলে মেয়েটি মনোহারিণী হয়ে ওঠে; চুলগুলি কাঁধ ছাড়িয়ে পিঠের সিকিখানা পর্যন্ত এসে ছড়িয়ে পড়ে আছে। বাকীটা কেটে ছোট করে নিয়েছে। সামনের দিকে সোজা সিঁথির দু'পাশে একটু ফুলিয়ে সাজানো। খুবই সুন্দর লাগছে, কিন্তু প্রসাধন করেছে বলে অপবাদ কেউ দিতে পারবে না। কানে দুটি গোল রিং। মেয়েটি হেসে নমস্কার করল। বাঁ হাতে ঘড়ি, ডান হাত খালি। আঙুলগুলি লম্বা ধরনের। গলায় পলা বা লাল বিন্দু আর সোনার মটরদানার একগাছি হার বা মালা। এবং আজকের পোশাক তার সাদা।

বিস্মিত হয়ে গেল অংশুমান। এ সীতা সেন যেন সে সীতা সেন নয়। লাল রংয়ের পোশাকের মোড়কে তাকে একটা দীপ্তি দিয়েছিল আজ তাকে সাদা পোশাকে বিষণ্ণ দেখাচ্ছে কিন্তু এতেই যেন মেয়েটিকে ভাল মানিয়েছে।

সীতা সেন তাকে নমস্কার করল—ভালো আছেন? চিনতে পারছেন আমাকে?

অংশু ঠিক ধরতে পারে নি খোঁচা আছে কি না। কিন্তু সংকুচিত বিনয়ের অভাব ছিল না এটা নিশ্চিত। অংশু প্রতিনমস্কার করে বলেছিল—এঁরা বলছিলেন হিরোইন সীতা সেন একটি আশ্চর্য নতুন মেয়ে। এবং তিনি আমাকে চেনেন। আন্দাজ একটা করেছিলাম। তবে আজ দেখছি এ-আপনাতে আর সে-আপনাতে তফাত আছে। কিন্তু আপনাকে দেখেই চিনেছি—সে রক্তরাগ থেকে শুভ্র পদ্মরাগের রূপান্তর সত্ত্বেও। আজ ভারী চমৎকার দেখাচ্ছে আপনাকে।

সীতা সেন ঠকে নি। সে বলেছিল—আজ তো হিটারের বিজ্ঞাপনবাহিনী নই আমি—আমি আজ মধুকরমোহিনী হিরোইন।

কালরাত্রি নাটিকার নায়কের নাম 'মধুকর'। ছদ্মনাম—কিন্তু তাই শেষ পর্যন্ত দাঁড়িয়েছে আসল নামে। অংশুমান খুশী হয়েছিল। কারণ মেয়েটির মধ্যে সিরিয়াসনেস আছে। এর মধ্যেই বইটা পড়ে ফেলেছে।

অংশুমান বেশ সকৌতুক বিশ্লেষণী দৃষ্টিতে তাকে তখনও দেখছিল। ভাল লাগছিল।

আজ এখন মেয়েটির পরনে সব সাদা। আর একটু প্রভেদ আছে। সেদিন বাঁ হাতে রিস্টওয়াচ ছিল—ডান হাতে সোনার রুলি ছিল, আজ রিস্টওয়াচ আছে—রুলি নেই। আর একটা প্রভেদ, আজ খাটো চুলগুলি শ্যাম্পু করা, এলানো। সে দু'দিনই চুলে ঈষৎ তেলের স্পর্শের চিক্কণতা ছিল আর দুই বেণী করে ঘাড়ের উপর সুন্দর একটি খোঁপা ছিল।

আজ মেয়েটিকে সেদিন থেকে অনেক বেশী মনোহারিণী বোধ হচ্ছে। এলানো শ্যাম্পু করা চুলের মধ্যে একটা এলোমেলো নেশা রয়েছে। যেটা চোখে লাগছে। নাকের নিশ্বাসের সঙ্গে লাগছে। মেয়েটি বসেছে সামনেই। তার বিপরীত দিকে। বেশ মৃদু একটি গন্ধ আসছে।

* * *

না—। সেদিনও তার প্রতি ঠিক আকৃষ্ট হয় নি। অংশু মানে যে, পুরুষ এবং নারীর মধ্যে যে আকর্ষণ সেটা একটা সুতোর আকর্ষণ নয়—দুটো সুতোকে একসঙ্গে পাকিয়ে নিয়ে আকর্ষণটা সম্পূর্ণ হয়। একটা আকর্ষণ দেহের অন্যটা মনের। দুটো একসঙ্গে জড়িয়ে শক্ত হয়ে যখন টানে তখনই সে টান সত্যিকারের টান। দেহের আকর্ষণ মানুষকে অহরহ টানে। সে তরুণ সে যুবক দেহের রন্ধ্রে রন্ধ্রে নারীদেহ কামনা কাঁদে—প্রতি অঙ্গের জন্যে প্রতি অঙ্গ কাঁদে। মধ্যে মধ্যে সে-কান্না দুর্বার হয়ে ওঠে। দেহব্যবসায়ের বাজার আছে; অস্বীকারও সে করবে না—কখনও কখনও সে দুর্বার বাসনাকে চরিতার্থ সে করেছে। তার জন্য অপরাধবোধ তার নেই। কিন্তু দেহ এবং মন এই দুই দিয়ে একটি মেয়ের দেহ এবং মন কামনা করা স্বতন্ত্র ব্যাপার। তেমন কোন কামনা তাকে চঞ্চল করে নি। সে কারণেই দিব্যি অসংকোচে তাকে দেখে যাচাই করে নিয়েছিল যে হিরোইনের পার্টে তাকে মানাবে কি না।

মেয়েটি একটু অস্বস্তি বোধ করেছিল।

কানে-কানে শিবকিংকর বলেছিল—চুম্বক নেই মেয়েটার মধ্যে?

শিবকিংকরের কথার কোন জবাব না দিয়ে অংশুমান বলেছিল—আপনাকে মানাবে খুব ভাল। এর আগে অতসী বলে একটি মেয়ে পার্টটা করেছিল—তার হাইট কম মনে হয়েছিল।

লজ্জিত হয়েছিল সীতা সেন। অংশুমান বলেছিল—একটু আগে বললেন 'মধুকর মনমোহিনী'। তা হলে বুঝতে পারছি এর মধ্যেই নাটিকাটা পড়ে ফেলেছেন আপনি।

সীতা বলেছিল—রেডিয়োতে আমি শুনেছি।

—বইটা পড়েন নি ?

—না।

—আচ্ছা। কিন্তু এটা বুঝতে পারছেন যে আপনাকে ডাবল্ রোলে প্লে করতে হবে। মানে বউ এবং নার্স দুজনের রোল আপনাকেই করতে হবে।

—আমি পারব ?

—কেন পারবেন না ? যেমন সহজভাবে সেদিন আমাকে যন্ত্রপাতির কথা বুঝিয়ে এলেন ঠিক তেমনি সহজভাবে কথা বলে যাবেন—আর ভাবতে হবে আপনি তখন কে। মানে তাই হতে হবে।

চুপ করে থেকেছিল সীতা। শুধু একটা রজনীগন্ধার ডাঁটি ছেঁড়া একটা সবুজ পাতা নিয়ে কুটিকুটি করে ছিঁড়েছিল।

রঞ্জন বলেছিল—আজ রিডিং দেবেন বইয়ের। নাও বই ধর অংশুদা।

রঞ্জনের বউয়ের হাতে ভার ছিল অতিথি আপ্যায়নের—সে কফি এবং কাজুবাদাম, বিস্কুট সাজাচ্ছিল ওঘরে—তার সঙ্গে ছিলেন বড়দি। নরেন বোসের শিক্ষিতা স্ত্রী বলেছিলেন—দাঁড়ান দাঁড়ান। আপনারা পুরুষেরা ভারী স্বার্থপর। ওরা আসুক তবে আরম্ভ করবেন।

* * *

নাটিকার আরম্ভ একটি নার্সকে নিয়ে।

অংশুমান পড়তে আরম্ভ করেছিল।

—একটি নার্স মেয়ে। সুন্দরী চটুল এবং প্রগল্‌ভা মেয়ে। তরুণ ডাক্তারেরা তার প্রতি মুগ্ধ। তারা তাকে অ্যাডমায়ার করে অ্যাডোর করে। আকারে ইঙ্গিতে তাকে তাদের হৃদয়ের বার্তা জানায়। সে তাদের নিয়ে খেলা করে। হাসে। তাদের নাচায়। কিন্তু আমল দেয় না। একজন তরুণ দুঃসাহসী বিলেতফেরত—এসব বিষয়ে নামকরা কুটিলচরিত্র সুদর্শন ডাক্তারের একখানা ডায়েরী এবং চিঠি হস্তগত করলে যাতে ডাক্তারটির মারাত্মক কুকর্মের স্বীকৃতি আছে। ধরাও সে দিয়েছিল। ডাক্তারটি জানতেন না চুরির কথা। এরপর তিনি তাকে ফেলে যে মুহূর্তে সরে যেতে চাইলেন সেই মুহূর্তে সে হস্তগতকরা ডায়েরী এবং চিঠি প্রকাশ করে দিতে উদ্যত হল। ডাক্তার বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করলেন। কিন্তু অন্য সব ডাক্তারেরা তার উপর বিরূপ এবং প্রায় খড়্গহস্ত হয়ে উঠল। মেয়েটি চাকরি করত একটি নার্সিং হোমে। সেখানকার যিনি প্রধান তিনি প্রৌঢ় খ্যাতনামা চিকিৎসক ; তিনি কিন্তু মেয়েটিকে স্নেহ করতেন কন্যার মত। অন্য ডাক্তারেরা ইঙ্গিত করত যে, মেয়েটির পিতৃত্বের দায়িত্ব তাঁর। অথবা যৌবনে যে নার্সটিকে তিনি ভালবেসেছিলেন—যে নার্সটি এই মেয়েটির চেয়েও স্বৈরিণী

ছিল এ তারই মেয়ে। স্নেহটা সেই হেতু। তবুও তিনি নার্সটিকে ডেকে বললেন তাকে বিচারের সম্মুখীন হতে হবে। অবশ্য বিচার করবেন কয়েকজন ডাক্তার। যদি মেয়েটির অন্যায় প্রমাণিত হয় তবে তার নার্সবৃত্তির ডিপ্লোমা ক্যান্সেল করে দেওয়া হবে। এইখানেই নাটকের আরম্ভ। পিছনের ঘটনাগুলি বাদানুবাদের মধ্যে ব্যক্ত হয়েছে। এই মুহূর্তেই একটি লোক এল প্রবীণ ডাক্তারের কাছে। তাঁরই চিকিৎসাধীন এক রোগীর বাড়ি থেকে। কেসটি বাইরে থেকে সাধারণ কেস। কিন্তু ভিতরে অনেক জটিলতা। একটি অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে। সুদর্শন তরুণ। এক বছর আগেও তার হাসি-উল্লাসের সীমা ছিল না। বাঁশী বাজাত আর ছদ্মনামে গান রচনা করত—সুরও দিত—যা রেকর্ডও হয়েছিল এবং অল্পদিনের মধ্যে তরুণ-সমাজে অত্যন্ত প্রিয় হয়ে উঠেছিল। সে তার ছদ্মনামটি কিন্তু এমন সযত্নে গোপন রেখেছিল যে, বন্ধুবান্ধবেও জানত না। এক বৎসর আগে ঠিক আজকের তারিখে ছিল তার বিয়ের কালরাত্রি। অর্থাৎ বিয়ের ঠিক পরের দিনের রাত্রি। এই রাত্রিতে হিন্দু সমাজের বিধিমতে বর ও বধূর সাক্ষাৎ নিষিদ্ধ। এর পরদিন হয় ফুলশয্যা। কলকাতার দক্ষিণে নদীর ধারে গ্রাম; অবস্থাপন্ন ঘর। ঘরে ওই এক ভাই আর তার বড় বিধবা বোন নিয়ে সংসার। বড় দিদিই তাকে মানুষ করেছেন। আর দু'চারজন পোষ্য আত্মীয় আছে। রূপসী মেয়ে দেখে বিয়ে দিয়েছিলেন দিদি। সে নিজেও তাকে দেখে এসেছিল। মুগ্ধ হয়েছিল বিশেষ করে এই কারণে যে, মেয়েটি ভাল গান গায় এবং কনে দেখার আসরে মধুকরের (তার ছদ্মনাম) গানই সে গেয়েছিল। সকৌতুকে সানুরাগে সে তার পরিচয় গোপন রেখে মধুকরের নিন্দা করেছিল, তাতে মেয়েটি ক্ষুব্ধ হয়েছিল। ছেলেটি ঠিক করেছিল, প্রথম মিলন-রাত্রির আগে পর্যন্ত সে এ পরিচয় গোপনই রাখবে। অর্থাৎ ফুলশয্যার রাত্রি পর্যন্ত।

আরও ঠিক করেছিল যে, ওই দিন লোকসমাজেও সে প্রকাশ করবে যে, সেই মধুকর। বিয়ের পরদিন বর-কন্যা এসে নৌকায় করে যখন ঘাটে পৌঁছল তখন ঝড় বৃষ্টি—দুর্যোগ। অবশ্য খুব বিপদের মত নয়। তবে তার ফলে দিদির অনেক সাধ করে ব্যবস্থা করা শোভাযাত্রা পণ্ড হল। আলো-বাজনাসহযোগে দুই পালকিতে বর ও কন্যাকে সারা গ্রাম প্রদক্ষিণ করিয়ে আতসবাজি পুড়িয়ে ঘরে তোলা গেল না। দিদি ব্যবস্থা করলেন, বর-কন্যা সেদিন ওই ঘাটেই দুখানা স্বতন্ত্র নৌকায় রাত্রিবাস করবে। পরের দিন সকালে শোভাযাত্রা সাজিয়ে বর-কনেকে গ্রাম প্রদক্ষিণ করিয়ে তুলবেন—বধূবরণ করবেন; সারা গ্রামের লোক দেখবে।

সেই ব্যবস্থা মত বর-কনে দুই পাশাপাশি নৌকোয় গ্রামের ঘাটে রাত্রিযাপন করছিল; নৌকোর মাঝিরা ঘুমিয়েছে, বরের চাকর কনের ঝি সকলে ঘুমিয়েছে; প্রায় মধ্যরাত্রি; আকাশের মেঘ কেটে গিয়ে আকাশে চাঁদ উঠেছে; বরের ঘুম হয় নি—সে বাঁশী হাতে এসে নৌকোর ছইয়ের বাইরে এসে সুর তুলছিল—মধুকরের গানের সুর। হঠাৎ তার মনে হয়েছিল, বাঁশীর সুরের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে কে গান গাইছে। তারপর বধূ এসেছিল বাইরে। সে বাজিয়েছিল বাঁশী—সে গেয়েছিল গান। মাঝিরা জেগে উঠেও আবার চোখ বন্ধ করেছিল, ক্লান্ত দেহ—নদীর বাতাসে ঘুমিয়েও গিয়েছিল। হঠাৎ বর বলেছিল—রাত্রিটা কি এমনিই যাবে।

মেয়েটি উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিল—আমি যাই—আমাকে ধর—।

সে বারণ করতেও সময় পায় নি—বলতে পায় নি—আমি যাই—; বধূও নৌকো থেকে পাশের নৌকোয় আসবার জন্য পা বাড়িয়েছিল। খুব কাছাকাছি নৌকো, তবু নৌকো দুলে উঠে সরে গিয়েছিল, বধূ পড়ে গিয়েছিল জলে। সঙ্গে সঙ্গে বরও ঝাঁপ দিয়েছিল। মাঝিমাল্লারাও জেগেছিল। তারাও এর পর ঝাঁপ দিয়েছিল। গঙ্গায় তখন জোয়ার। সহজে পায় নি তাদের। বরকে পেয়েছিল অচেতন অবস্থায়। বুকে আঘাত লেগেছে। পরদিন কনেকে পেয়েছিল চড়ার উপর—ফুলশয্যার বদলে বালির শেষ শয্যায় শুয়ে শেষ ঘুমে ঘুমিয়ে আছে।

বরের অসুখ তখন থেকে। তখন কলকাতার হাসপাতালে এনে রাখা হয়েছিল তাকে। বুকের আঘাত সেরেছিল; কোমরেও আঘাত লেগেছিল—তাও সেরে এসেছিল। ডাক্তারদের মতে ছেলেটি নিজে কিন্তু সারে নি। শুধু ক্লান্ত আচ্ছন্নের মত পড়ে থাকে। ভাল সে হয় নি। ভাল হতে সে চায় না। ভাল সে হবে না। তার শেষদিন আসবে আগামী বৎসরের ওই কালরাত্রির তারিখে, তার দৃঢ় ধারণা সেদিন তার মৃতা বধূ আসবে, তার পাশে দাঁড়িয়ে হাত বাড়াবে, সেও হাত বাড়াবে, বধূর মতই সে পড়বে মরণ-সমুদ্রে, বধূও ডুব দিয়ে তার হাত ধরবে গিয়ে এবং চলে যাবে তারা নিরুদ্দেশের দেশে।

এই চিকিৎসার ভার নিয়েছিলেন এই বিখ্যাত প্রবীণ চিকিৎসকটি। হাসপাতাল থেকে ছাড়িয়ে এনে মাস দুয়েক ক্লিনিকে রেখে, তিনি তাকে বাড়িতেই রাখার ব্যবস্থা করেছিলেন। রোগীদের মধ্যে না রেখে তার নিজের ঘরে স্বাভাবিক অবস্থার মত রেখেছিলেন। তার বই গ্রামোফোন রেডিয়োর ব্যবস্থার মধ্যে রেখে চেয়েছিলেন ধীরে ধীরে ছেলেটি জীবনের আকর্ষণ ফিরে পাবে। নার্স ছিল। নার্সদের ছেলেটি পছন্দ করে না। রাখতে চায় নি। কিন্তু এই প্রবীণ ডাক্তারটি তাকে মিষ্টি কথায় রাজী করিয়েছিলেন। বলেছিলেন—তোমার কথা অন্যে যে অবিশ্বাস করে করুক, আমি করি না। আমি বিশ্বাস করি। বিশ্বাস করি ওই দিন নিশ্চয় সে আসবে। কিন্তু সে দিনটি পর্যন্ত তো তোমার সেবার জন্য লোক চাই। তার জন্য নার্সরাই সব থেকে পারদর্শ—তারাই এ কাজের জন্য বিশেষ শিক্ষা নিয়েছে। সুতরাং নার্সে আপত্তি করলে চলবে কেন? এর উত্তরে কোন যুক্তি ছেলেটি পায় নি, সে রাজী হয়েছিল কিন্তু তরুণী নার্স পাঠাতে নিষেধ করেছিল। প্রৌঢ়া নার্স রাখা হয়েছিল একজন।

তাতে কিন্তু সমস্যা মেটে নি। কোন নার্সকেই সে এক সপ্তাহ দু' সপ্তাহের বেশী সহ্য করে নি। উত্তেজিত হয়েছে সামান্য ত্রুটিতে। কটু কথা বলেছে। তাকে সরিয়ে আবার অন্য নার্স এসেছে।

আজ সেই দিন। সকাল থেকেই রোগী উত্তেজনায় অধীর। সে আসবে। তার জন্য বিছানায় শুয়ে শুয়েই নির্দেশ দিচ্ছে। ঘর সাজাচ্ছে চাকরে। কাপড় কোঁচাতে বলেছে—সে পরবে। মালা গাঁথা হচ্ছে। বাঁশী নিয়ে বসে আছে। আজ সে বাজাবেই। এসব দেখে প্রৌঢ়া নার্সটি একটু বিরক্তি প্রকাশ করেছিল, সেই কারণে সে তৎক্ষণাৎ তাকে তাড়িয়ে

দিয়েছে। রোগীর দিদি কাঁদছেন। তিনি বৃদ্ধ কর্মচারীকে পাঠিয়েছেন ডাক্তারের কাছে—আজ তাঁকে যেতেই হবে। রোগীকে যদি কোনমতে শান্ত করতে পারেন।

ডাক্তার শুনে অনেকক্ষণ চিন্তা করলেন। তারপর সহকারীকে ডেকে পরামর্শ করলেন। স্থির করলেন বিচিত্র পন্থা। তারপর দুজনে গেলেন রোগীকে দেখতে। দেখলেন—বৃদ্ধের কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। রোগী বরের সাজে সেজে হাতে বাঁশী নিয়ে বসে আছে। বাঁশীর সুর না উঠলে অশরীরিণী বধূ তো কায়াময়ী হয়ে আসতে পারবে না। তার বাঁশীর সুরই হবে অসীম শূন্যলোকে তার পথের সূত্র। বাঁশী তাকে বাজাতেই হবে।

ডাক্তার তাকে পরীক্ষা করে দেখলেন। কথা কইলেন। বুঝলেন ভাবপ্রবণ যুবকটি উন্মাদ হয়ে গেছে। এ ধারণা থেকে তার বিশ্বাস কোনক্রমেই নড়বে না। তার এ বিশ্বাস এমনি দৃঢ় যে প্রতিনিবৃত্ত করতে গেলে হিতে বিপরীত হবে।

তিনি ভেবে নিয়ে বললেন—বেশ তাই হবে।

নির্দেশ দিলেন—কেউ যেন তার কথার প্রতিবাদ না করে। অমান্যও না করে। তবে রোগীর কাছে প্রতিশ্রুতি নিলেন যে, অশরীরিণী বধূ কায়াময়ী হয়ে না আসা পর্যন্ত সে রোগী।

রোগী বললে, সেই নির্দিষ্ট সময়ে বারোটার সময় বাঁশী বাজাবে সে।

—নিশ্চয়, কিন্তু বারোটার আগে নয়।

তাই স্থির করে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে রোগীর দিদিকে বললেন—প্রতিবাদে কোন লাভ নেই। যা বলছে তাই করে যান। দেখুন না কি হয়! হয়তো বউয়ের আত্মা আসবে।

বলে তাঁকে চুপিচুপি বললেন—একটি ব্যবস্থা আমি করব। একমাত্র পথ। দেখুন তাতে কি হয়। একটি কথা, আপনাদের বউটির ছবি দেখে মনে হয় একটু দীর্ঘাঙ্গী ছিল এবং হালকা শরীর ছিল!

—হ্যাঁ।

—তাহলে সে আসবে। একটি শর্ত। বউটির গায়ে যে গহনাগুলি ছিল সেগুলি সব বের করে রাখবেন, কি রংয়ের কাপড় ছিল? বিয়েতে সাধারণতঃ লাল রঙই তো থাকে।

—ফিকে গোলাপী বেনারসী।

—তেমনি কাপড় কিনে আনতে হবে! কেমন? বুঝছেন তো, তার আত্মা যখন কায়া ধরবে, তখন এগুলি সে পাবে কোথা। সে সবই তো চিতায় উঠবার সময় ফেলে গেছে সে? তার বউ যদি এসে ওকে না নিয়ে গিয়ে নতুন করে বাঁচিয়ে দিয়ে যায় তবে সে গহনা কাপড় নিয়ে যাবে। যদি নিয়ে যায় তবে নিশ্চয় সে ফেলে দিয়ে যাবে। বুঝলেন।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে দিদি বলেছিলেন—তাই হবে।

ডাক্তার বলেছিলেন—বউ আসবে আপনাদের। কিন্তু কোন্ পথে কিভাবে শুধু আপনি জানতে পারবেন, কিন্তু অন্য কেউ যেন না জানে।

তাই হল। মধ্যরাত্রে বাঁশীর সুর তুললে সে, অর্ধোন্মাদ তরুণ।

ঘরে নীলাভ আলো জ্বলছিল।

ঠিক জানালার ধারে এসে দাঁড়াল ফিকে গোলাপী রঙের বেনারসী পরা দীর্ঘাঙ্গী তরুণী। সেই গহনা। সে বললে—আমি এসেছি।

রোগী উঠে বসল। বধূ বললে—তুমি তো জান মর্ত্যের আগুনের আলো আমার এ মায়াময় কায়াতে সহ্য হয় না। ওই আলোটা নিভিয়ে দাও। ওগো, নইলে যে আমি তোমার কাছে যেতে পারছি না!

রোগী বললে—তোমার মুখ কেমন করে দেখব?

—চাঁদের আলোয়। আজ যে আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ। তিথি ভুলে গেছ। সেই আলো জানালা দিয়ে এসে পড়বে মেঝেতে, আমি বসব সেই আলো সারা অঙ্গে মেখে—আমাকে তুমি দেখবে।

অপরূপ কথায় আত্মহারা বর বেড-সুইচ টিপে আলো নিভিয়ে দিল; কনে এসে জ্যোৎস্না ছড়িয়ে-পড়া মেঝের উপর বসল। টেবিলের উপর থালায় মালা ছিল—সেই মালা নিয়ে বরের গলায় পরিয়ে দিয়ে বললে—এবার তুমি পরিয়ে দাও।

মেয়েটি আর কেউ নয়, বধূর আত্মা নয়, সেই নার্সটি, যে তরুণ ডাক্তারদের নিয়ে খেলা করে কিন্তু ধরা দেয় না। ধরতে গেলে কালনাগিনীর মত দংশন করে। প্রবীণ ডাক্তারটি শেষে এই উপায় স্থির করেছেন। রোগীর বিশ্বাসমত ওর বিশ্বাস পূরণ করিয়েই মেয়েটি আসবে বধূ সেজে; সেই সজ্জা, সেই আভরণ; সেই দীর্ঘাঙ্গী তরুণী, আলোহীন ঘরে জ্যোৎস্নার মায়ালোকে অন্ধবিশ্বাসের ঠুলীপরা বর তাকে বধূ বলেই বিশ্বাস করবে। এবং প্রথম কিছুক্ষণ উত্তীর্ণ হলে আর ধরবার কোন শক্তিই তার থাকবে না; মেয়েটি তাকে তার করস্পর্শে ছলনাভরা কথায় ভুল থেকে গভীর ভুলে নিয়ে যাবে; শান্ত করবে কাছে বসে, কপালে হাত বুলোবে। তারপর ধীরে ধীরে তার বাঁচবার ইচ্ছা ফিরিয়ে আনবে। বলবে—তুমি বাঁচ—তোমাকে যে বাঁচতে হবে। তুমি মধুকর নামে বিখ্যাত হও। আমি শূন্যলোকে ঘুরব আর শুনব মধুকরের গান আকাশে উঠে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাতেই হবে আমার অনন্ত তৃপ্তি। তুমি বাঁচ, তুমি বাঁচ। ওগো তুমি বাঁচ। তারপর তাকে বিশ্বাস করিয়ে বলবে—তুমি বিয়ে কর। তুমি বিশ্বাস কর, আমি তার আত্মার সঙ্গে এক হয়ে যাব। বিয়ে না করলে আমাকে শুধু শূন্যলোকে ফিরতে হবে। দেখ তুমি ভাল হয়ে গেছ। ওঠ তুমি, দাঁড়াও, এস, তুমি আমার কাছে এস। সে নিশ্চয় হাঁটবে। শুধু সাবধান—যেন মানবী দেহের উত্তপ্ত অঙ্গস্পর্শে তার মোহ না ভাঙে! এইভাবে ধীরে ধীরে তার বিশ্বাস ফিরিয়ে এনে তাকে ঘুম পাড়িয়ে চলে আসবে সে। ঘুমের ওষুধ সঙ্গে থাকবে তার। তাই সে সময়মত তাকে খাইয়ে তার মাথায় হাত দিয়ে বসবে।

এর জন্য সে ওই বধূর অলঙ্কারগুলি সব পাবে; যার দাম অন্তত সাত-আট হাজার টাকা। ছেলেটিকে যদি বাঁচাতে নাও পারে—যদি সব ব্যর্থ হয়, তবুও এই এক রাত্রির অভিনয়ের জন্য এক হাজার টাকা দেওয়া হবে তাকে।

মেয়েটি এল—সকৌতুকেই এল। এক বিচিত্র অভিনয়! এবং আশ্চর্য নৈপুণ্যের সঙ্গে অভিনয় করে গেল। রোগীকে শেষরাত্রে ঘুম পাড়িয়ে বেরিয়ে এসে যখন সে ক্লান্ত হয়ে অন্য

ঘরে প্রতীক্ষমাণ ডাক্তারের সামনে চেয়ারে বসে টেবিলে মাথা রাখল তখন পৃথিবীর রঙ যেন পালটে যাচ্ছে।

ডাক্তার হেসে বললেন—ওয়েল ডান! খুব ভাল করেছ। অদ্ভুত! কিন্তু তুমি একটু বিশ্রাম কর। একটু পরেই রওনা করে দেব তোমাকে আমার গাড়িতে। এখানে কাউকে দেখতে দেব না। কোনক্রমে এ কথা ওর কানে উঠলে হয়তো ও পাগল হয়ে যাবে।

ডাক্তার বেরিয়ে গেলেন—মেয়েটি সেই বধূবেশেই সেখানে একটা বিছানা পাতা ছিল তাতে যেন ভেঙে পড়ে শুয়ে পড়ল।

কিছুক্ষণ পরে ডাক্তার ঘরে এসে ওকে ডাকলেন। কিন্তু সাড়া পেলেন না। নাড়া দিয়ে দেখলেন, মেয়েটি বেঁচে নেই। তার হাতের মুঠোয় চিঠি। লিখেছে—জীবনে শেষ অভিনয় করে গেলাম। এরপর আর বাঁচতে পারব না। মনে হচ্ছে সব পেয়েছি। সকাল হলে সব হারাব। তাই সকাল হবার আগেই বিষ খাচ্ছি, পটাসিয়াম সায়নায়েড। ওটা আমার ভ্যানিটি ব্যাগে থাকত অনেক দিন থেকে। আজ কাজে লাগল। জীবন এত মধুর জানতাম না। সে স্বাদ মিলিয়ে যাবার আগেই চলে যাচ্ছি আমি।

* * *

দাদার শালী নমিতার বন্ধু স্মৃতি। স্মৃতির কাকা কোরিয়া-ফেরত ডাঃ ক্যাপ্টেন সেন। তাঁর কাছে ডাঃ গিরীন্দ্রশেখর বসুর বিচিত্র পথে মানসিক ব্যাধি ভালো করার গল্প। একটি অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে জীবনে বিমর্ষ এবং ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে গিয়েছিল। গিয়েছিল অবশ্য একটি মেয়েকে ভালবেসে। ডাঃ বসু একটি নার্স তরুণীকে নিয়োগ করেছিলেন ছেলেটিকে আকর্ষণ করে উল্লসিত করে তুলে বাইরে বের করবার জন্য। ছেলেটি বের হল ভাল হল, কিন্তু মেয়েটি ছেলেটিকে ভালবেসে চিরবিষণ্ণ হয়ে গেল। আর একটি গল্প ওই নমিতাদেরই এক আত্মীয় তরুণের রোমান্টিক গল্প। ছেলেটি বিয়ে করে বাড়ি এল বউ নিয়ে। কালরাত্রি সেদিন। বর-বউয়ে দেখা হতে নেই। সকল জনকে লুকিয়ে সেই দেখা করতে গিয়ে অ্যাকসিডেন্ট হয়েছিল—তাতে বউ জলে ভেসে গেল, বর বাঁচল। কিন্তু তার ধারণা হল ঠিক এক বছর পর ওই দিনটিতে তার বউয়ের আত্মা এসে তাকে নিয়ে যাবে। এবং তাই ঠিক ঘটল। ছেলেটি ঠিক ওই দিনই মারা গেল। এই দুটি গল্পকে মিশিয়ে লেখা নাটক।

অংশুমান নাটকখানি আগাগোড়া নিজের মত করে রিডিং দিয়েছিল। সে নিজে লেখক এবং অ্যাকটিংও ভাল করে—তবে তার অ্যাকটিংয়ে একটু ইমোশন আছে। একালের মত বাস্তবতার জন্যে শুকনো নয়। কিন্তু ইমোশনের আমেজের ফলও আছে। সে যখন পড়া শেষ করল তখন সকলে অভিভূতই হয় নি চোখও সকলের সজল হয়ে গেছে। বই রেখে সে চুপ করল। গোটা ঘরটা স্তব্ধ হয়ে রইল। মেয়েরা চোখ মুছছিল। সীতা যেন দুই হাঁটুর উপর চিবুকটা রেখে স্তব্ধ হয়েই বসেছিল—চোখের জল সে মোছে নি। জলের রেখা দুটি চিকচিক করছিল গালের উপর।

অংশুমান একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল—বই ভাল—তবে শক্ত!

রঞ্জন বলল—শক্ত না হলে ভাল হয় কি করে?

বিমল গুপ্ত বলল—দাটস্ ইট!

মাসীমা বললেন—আমার খু—ব ভাল লেগেছে। খু—ব ভাল।

বড়দি তখনও চোখ মুছছিলেন। বললেন—বড় লেখকের লেখা! তাছাড়া জানো—লেখাটা ট্রানস্লেট হয়েছে ইউরোপে! ওই যে গুরুসদয় দত্ত রোডে মিসেস সিনহা থাকেন—নরওয়ের মেয়ে—উনি ওঁদের ভাষায় ট্রানস্লেট করেছেন। উনিই তো আমাকে বললেন। রেডিয়োতে শোনা শেষ করেছেন—আমি গেলাম—আমাকে বললেন—কি সুন্দর একটা ওয়ান-অ্যাক্ট প্লে হল রেডিয়োতে বড়দি, কি বলব! আমি ট্রানস্লেট করব আমাদের ভাষায়। আমি বললাম—তার আর কি—অংশু আমাকে মাসীমা বলে। সে তোমাকে গ্ল্যাডলি পারমিশন দেবে।

অংশুমান বলল—আমি উঠব রঞ্জন। না হলে আর মাসীমার উচ্ছ্বাস সামলানো যাবে না।

—দাঁড়ান, ট্যাক্সি আনাই।

সীতা সেন বলেছিল—আমিও যাব রঞ্জনবাবু। শিবকিংকরদা!

শিবকিংকর বলেছিল—নিশ্চয়।

রঞ্জন বলেছিল—আপনার বাড়ি যাবার পথেই মাঝখানে ওঁর বাড়ি। শচীনদার বাড়ির একটু আগে। বাগবাজার স্ট্রীট ছাড়িয়েই গলির মধ্যে।

পথে সেই দিনই শচীনদার ওখানে সীতাকে নিয়ে গিয়েছিল। শিবকিংকরই জোর করে নিয়ে গিয়েছিল। মতলব ছিল তার, সীতা বোঝে নি কিন্তু রঞ্জন বুঝেছিল—হয়তো বা সেও জানত এ মতলব তবে সে এটা অনুমান করতে পেরেছিল। শচীনদা ওকে সদ্‌বাক্য বলে উপদেশ দিয়ে আশীর্বাদ করবেন—উৎসাহবাক্যও বলবেন—তাতে সীতা যে পাখানি এ পথে বাড়িয়েছে সেখানি আর গুটিয়ে নেবে না।

শচীনদার বাড়ির কাছে এসেই ট্যাক্সি থামিয়ে শিবকিংকর এক মিনিটের জন্য শচীনদার কাছে গিয়ে ফিরে এসে বলেছিল—শচীনদা ডাকছেন। মিস সেন, আপনাকেই ডাকছেন বেশী করে।

নামতে হয়েছিল।

শচীনদা অসুস্থ শরীরে বিছানার উপর আধবসা হয়ে বসেছিলেন। বলেছিলেন—এস এস। এই শীতের রাত্রে তোমাদের ভালবাসার উত্তাপে একটু গরম করে দিয়ে যাও। চা হবে নাকি একটু?

সকলেই না বলেছিল। সকলে প্রণাম করে সরে দাঁড়ালে সীতা এগিয়ে গিয়ে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে একপাশে আনতমুখে দাঁড়িয়েছিল। শচীনদা বলেছিলেন—এদেশের সকলের অতিপরিচিতা—হৃদয়ের স্নেহসুধাধারাসিঞ্চিতা তুমি সীতা! এঁ্যা। তুমি তো সুন্দর এবং মডার্ন। দুইই। তুমি নামবে স্টেজে? নাম নাম। স্টেজকে আরও উজ্জ্বল করে তোল বুঝেছ—brighter কর—more dignified—এবং পবিত্র কর আরও। একালে কে

কার, বা কে কোন্ বংশোদ্ভূত, তা নিয়ে কোন প্রশ্নই তোলে না। তার সত্য মূল্যও নিশ্চয় নেই; দিল্লীর চাঁদনী চৌকের ধারে তার প্রমাণ ছড়ানো আছে। কিন্তু এটা নির্ভুল যে, বংশের না হোক প্রতিটি মানুষের একটা বার্থরাইট আছে এবং রেসপনসিবিলিটি আছে। শুচিবাঈ একটা ব্যাধি কিন্তু শুচিতা মানুষের জীবনে মনুষ্যত্বের অন্যতম পরিচয়। জন্তু ময়লা মেখে থাকে, তাতে তার ক্ষতি হয় না। মানুষের কিন্তু চর্মরোগ জন্মায়। যে মানুষ আনক্লীন সে নিঃসন্দেহে মানুষদের মধ্যে নীচ। জীবের মধ্যে মানুষই মাথা উঁচু করে খাড়া সোজা হয়ে দাঁড়ায়। মাথা নীচু হলে তার অমর্যাদা হয়।

সীতা একটি কথাও বলে নি।

আসবার সময় আবার শচীনদা বলেছিলেন—অংশুমানের উল্টো দিকে দাঁড়াতে হবে। তা পারবে তুমি। এবং মানাবে ভাল। আমি অভিনয় দেখতে নিশ্চয় যাব। ততদিনে ভাল হয়ে যাব। আর একটা কথা—তোমরা কোথাকার সেন?

সীতা এবার কথা বলতে বাধ্য হয়েছিল—বলেছিল—ঠাকুরদা বেহারে ছিলেন, গয়াতে ওকালতি করতেন। বাবা বাংলাদেশে গভর্নমেণ্ট সার্ভিস নিয়েছিলেন। চাকরিতে ঘুরে ঘুরেই বেড়িয়েছেন। এখন ওই খালের পোলের কাছে—

—আরে তোমাদের আদি বাড়ি কোথায়?

সীতা বলেছিল—তা জানি না।

—এই দেখ। অংশুমান, নতুন কালটা এমনি ভাবেই নোঙর ছিঁড়ে বেমালুম ঝরাপাতার মত ছড়িয়ে ছড়িয়ে হারিয়ে গেল হে! দুঃখ করিনে। তবে দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে। সীতাকে একটু দেখো তুমি। বুঝলে?

* * *

শচীনদাই বোধ করি সীতাকে হাত ধরে তার একটু বেশী কাছে এনে দিয়েছিলেন। পথে সীতা তাঁকে উদ্দেশ করে বারকয়েক নমস্কার জানিয়ে বলেছিল—ভারী ভাল লাগল। দেবতার মত মানুষ। শুনতাম উনি নাকি রাগী লোক।

শিবকিংকর বলেছিল—রাগলে একেবারে ক্ষেপে যান। কোন অন্যায় সহ্য করেন না।

সীতা বলেছিল—ভারী লজ্জা লাগল আমার, আমাদের বাড়িটাড়ির কথা কিছুই বলতে পারলাম না!

অংশুমান বলেছিল—জেনেও বিশেষ কিছু হয় না মিস সেন। কাল আমাদের এমনভাবে টেনে নিয়ে চলেছে—কারুর কোন পরিচয়ই সে আর রাখবে না। সব মাটি-চাপা পড়বে।

পথে তার বাড়ি এসে পড়েছিল।

নেমে যাবার সময় সে বলেছিল—আমার ভয় করছে অংশুমানবাবু। এ বোধ হয় আমি পারব না।

১৯৬৭ সালে আজও তার কানে বাজছে সীতার সেদিনের কথা। রঞ্জন, শিবকিংকর দুজনেই কথাটা শুনে হা হা করে উঠেছিল। কিন্তু তার মনকে যেন বিচিত্র স্পর্শে স্পর্শ

করেছিল তার কথা। সেই কারণেই সে ওদের দুজনকে থামিয়ে দিয়ে বলেছিল—কি ভয় করছে বলুন তো?

সীতা বলেছিল—তা বলতে পারি না। তবে ভয় করছে। এবং চুপ করে গিয়েছিল সে।

অংশুমান বলেছিল—আমি এইটুকু বলছি যে অভিনয় চেষ্টা করলে আপনি পারবেন। দিন কয়েক দেখুন—যদি আপনাকে দিয়ে না হয় তবে আমিই বলে দেব। আর হলে বড় সাকসেস পেতে পারবেন আপনি। আর সংসারে ভয় আছে—তবে সে কোথায় নেই বলুন?

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সে গলির ভিতর দিকে চলে গিছল। বাড়িটা তাদের খানকতক বাড়ি পরে।

* * *

পরের দিন রিহারস্যালে সীতা এল। যেন বিষণ্ণ হয়ে এসেছিল। না। বিষণ্ণ নয়—মগ্ন হয়ে ছিল নিজের মধ্যে। হাতে বইখানা ছিল। রিহারস্যাল আরম্ভের পূর্বেই সে তার কাছে এসে বসেছিল এবং বলেছিল—অংশুবাবু। এ আমি পারব না।

চমকে উঠেছিল সে।—পারবেন না?

—না। এ আমি পারব না।

একসঙ্গে ষোড়শী সংঘের ষোলজনের স্থলে আঠারো কুড়িজন হাঁ-হাঁ করে উঠেছিল। সীতা অসহায়ের মত দাঁড়িয়েছিল। তাদের হাঁ-হাঁ শেষ হলে অংশুমান বলেছিল—দেখুন মিস সেন, তেনজিং নোরকে মাউন্টেনীয়ারিং শিখে এভারেস্ট জয় করে এল। আপনি রিহারস্যাল দিয়েই দেখুন—তারপর যদি না পারেন পারবেন না। বলুন। আচ্ছা—কাল আমি রিডিং দিয়েছি আজ আপনি একটা রিডিং দিন তো। অন্ততঃ প্রথম সিনটা। বসে বসে পড়তে পারবেন তো!

না বললেই ভাল হতো!

আজ ধাক্কা-খাওয়া গাড়িখানার মধ্যে অচেতন সীতা—

ওঃ!

কচি শিশুটা! হাতখানা তার—। বুকের মধ্যে নিষ্ঠুরতম একটা যন্ত্রণায় বুকখানা ফেটে যেতে চাচ্ছে।

* * *

নিয়তি? না; নিয়তি ভাগ্য ঈশ্বর পাপ পুণ্য এসব সে মানে না। বিংশ শতাব্দীর পঞ্চাশ বছরের পরের পঞ্চাশ বছর নতুন কাল নতুন পৃথিবী নিয়ে এসেছে। এ যুগে কোন কিছুই অ-দৃষ্ট নয়। এ যুগে আকাশে দেবতা নাই স্বর্গ নাই। একালে সুখ আছে ভোগে—দুঃখ আছে অভাবে; সমস্ত সমস্যার সিদ্ধান্ত আছে বুদ্ধিতে। নিয়তি নাই।

বুদ্ধির ভুলে ঘটে গেছে এমনটা।

সীতাকে পড়তে না বললেই হতো। সম্ভবতঃ ওইটেই প্রথম ভুল।

সীতা পড়ে গিয়েছিল। লেখাপড়া জানা ক্যানভাসিং বিদ্যায় রপ্ত মেয়ে সে, ভাল পড়া তার পক্ষে কঠিন ছিল না তবুও সে যত ভাল পড়েছিল তত ভাল পড়া ষোড়শী সংঘের জন দুইকে বাদ দিয়ে চৌদ্দজনের পক্ষেই সম্ভবপর ছিল না।

প্রথম দৃশ্যটাই ছিল কলকাতার একটি বড় নার্সিং হোম। সেই নার্সিং হোমের একটি উইংয়ের এক পাশে ডাক্তারদের কনসাল্টিং রুম। সেই রুমের মধ্যে নার্সিং হোমের যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ও ডাক্তার—প্রৌঢ় মানুষ বিমর্ষভাবে বসে আছেন, এবং আরও ক'জন তরুণ ডাক্তার চারপাশে দাঁড়িয়ে আছেন।

ডাঃ সেন বলছেন—হতভাগ্য ছেলে—নিতান্ত হতভাগ্য এবং আই মাস্ট সে—সে অত্যন্ত দুর্বলচিত্ত। সমরেশের মত ছেলে বিষ খেতে পারে এ আমি বিশ্বাস করতেই পারি না।

অন্য ডাক্তার—But he tried to do—তা ছাড়া তার পথও ছিল না। মুখ দেখাতো কি করে? Blackmailingএর লজ্জায়—

অন্য ডাক্তার—আপনি এর বিচার করুন। এর জন্যে যে দায়ী তাকে পানিশমেণ্ট নিতে হবে। সে দায়িত্ব আপনার।

ডাঃ সেন—you mean নার্স সুপ্রিয়া। কিন্তু তাকে দোষী করছ কি করে? সমরেশ তাকে ভালবাসত। সে বাসত না। কোন মেয়েকে জোর করে তুমি ভালবাসাতে পার না। She was not his married wife—

—But why did she play with him in that way? What right she had to play false with him like that? এই চিঠি দেখুন। সমরেশের বাক্স থেকে সুপ্রিয়ার লেখা এই সব love letter আমরা পেয়েছি। Here she is, ওই তো আসছে। জিজ্ঞাসা করুন ওকে।

সুন্দর পড়ছিল—প্রথম একটু আড়ষ্টতা ছিল, মিনিটখানেক পরেই সে স্বচ্ছন্দ হয়ে পড়ে যেতে লাগল। অনুকরণ সে করে নি। তবে বোধ করি গতকাল অংশুমানের দেওয়া রিডিং সে খুব ভাল করে শুনেছিল। তা ছাড়া পড়ার মধ্যে প্রাণ দেবার ক্ষমতা ছিল মেয়েটির।

বিস্মিত সকলেই হয়েছিল। চুপ করে বসেছিল শুধু অংশুমান।

সীতা পড়ছিল—এবার প্রবেশ করলে নার্স সুপ্রিয়া। বাইরে থেকেই ক্যাচ ধরে ঢুকল—শান্ত ধীর কণ্ঠে বললে—কৈফিয়ৎ দেবার জন্যে আমি তৈরী হয়েই এসেছি স্যার।

ডাঃ সেন বললেন—এ সব হাতের লেখা তোমার?

—আমার। স্বীকার করছি।

—You loved him?

—No Sir!

—Then you just played with him?

—তিনি আমাকে নিয়ে খেলতে চেয়েছিলেন—আমি জানতে পেরে তাঁকে নিয়ে খেলেছি

স্যার। বেড়াল এবং ইন্দুরের মধ্যে সব সময়েই বেড়াল জেতে না।

অন্য একজন ডাক্তার গর্জে উঠলেন—মিথ্যে কথা। সমরেশ কখনও খেলা করতে চায় নি। You were the attracting magnet—তুমি তাকে টেনেছিলে—

—এই চিঠিখানা পড়ে দেখুন স্যার। চিঠি নয়। চিঠির ফটোস্টাট কপি। মূল চিঠি আমার ডকুমেণ্ট। দেখুন কি লিখেছে। সমরেশবাবু ডাঃ হালদারকে লিখেছিলেন। ডাঃ হালদার একসময় আমাকে নিয়ে খেলতে শুরু করেছিলেন। আমি বুঝতে পেরে তাঁকেও ঠকিয়ে সরে এসেছিলাম। তাই যখন গুজব রটল ডাঃ সমরেশ ঘোষ আমার প্রেমে পড়েছেন—সম্ভবতঃ বিয়ে করছেন তখন তিনি তাঁর কলীগকে চিঠি লিখে বলেছিলেন—সুপ্রিয়া স্বৈরিণী—সে অশুচি—সে ব্যাভিচারিণী—বেশ্যা শব্দটাও ব্যবহার করেছিলেন। উত্তরে সমরেশ ডাক্তার তাঁকে বড়াই করে চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন বিলেতে তিনি কত নারীর দম্ভ চূর্ণ করেছেন এবং সুপ্রিয়ার সঙ্গেও যে প্রেম তিনি করছেন তাও ছলনা। সুপ্রিয়াকে তিনি শিক্ষা দিতে চান। Expose করতে চান—জানিয়ে দিতে চান She is a harlot; দুর্ভাগ্য তাঁর চিঠিখানা আমার হাতে এসে পড়ল। সম্ভবতঃ দুখানা চিঠি একসঙ্গে লিখেছিলেন—একখানা আমাকে একখানা ডাঃ হালদারকে। তাঁর দুর্ভাগ্যক্রমে খাম বদল হয়ে গেল। আমার চিঠিখানা ডাঃ হালদার পেয়েছেন—তাঁর চিঠিখানা পেয়েছি আমি। আরও কাগজ আমার কাছে আছে। ডাঃ ঘোষ কত নারীর সঙ্গে এই প্রেম করেছেন তার একটা list আমার কাছে আছে। I can produce.—

'চমৎকার পড়ে গেল সীতা। কঠিন কণ্ঠে বাঁকা বলার ভঙ্গিতে সে এমনভাবে পড়ে গেল যে সকলেই একসঙ্গে বাঃ বাঃ বলে তারিফ করে উঠল।

অংশুমান বলেছিল—আর পড়তে হবে না। Rehearsal আরম্ভ হোক। আপনি পারবেন।

সীতা কিছু বলতে চেয়েছিল। কিন্তু কেউ তা শোনে নি। শুনতে চায় নি।

মিনু মাসীমা বলেছিলেন—তোমার কোন কথাই শোনা হবে না। And that is passed unanimously; শচীন সেন প্রেসিডেণ্ট, তিনি নেই—as vice-president I give this verdict. One two three—passed. Now go on.

* * *

সত্যই, প্রথম দিকেই সে এত চমৎকার বলেছিল যে অংশুমানও বিস্মিত হয়েছিল।

রিহারস্যাল দিতে দিতে মেয়েটা আশ্চর্য স্বচ্ছন্দ হয়ে উঠেছিল। মনে পড়ছে—।

নাটিকার ডাঃ বোস তরুণ একজন ডাক্তার কঠিন কণ্ঠে বললেন—ষোড়শী সংঘের বিমল গুপ্ত বললেন—সমরেশ ডাক্তারের অপরাধের কথা বলেছ তুমি। কিন্তু তোমার নিজের কথা? অস্বীকার করতে পার তুমি যে প্রেমের অভিনয় করা তোমার একটা স্বভাব? এবং তোমার heartlessness সব থেকে বড় পরিচয়, তোমার স্বৈরিণীত্বের সব থেকে বড় প্রমাণ!

শান্ত স্বরে এবার সুপ্রিয়া নার্সের বলার কথা—হৃদয় কি এ যুগে কারও আছে ডাঃ বোস? আপনার আছে? তা ছাড়া আপনারা পুরুষেরা এ যুগে কোন পবিত্রতাকে স্বীকার

করেন ?

প্রবীণ ডাঃ সেন বললেন—সুপ্রিয়া, তুমি নিজের কথা বল। এ ধরনের তর্কের মধ্য দিয়ে কোন মীমাংসায় পৌঁছুনো যাবে না।

সুপ্রিয়া বললে—ডাঃ বোসের এ অভিযোগও আমি স্বীকার করছি। কিন্তু—ঠিক ওইভাবে নয়।

ডাঃ সেন—মানে ? কি বলতে চাও তুমি ?

—Sir, I have got some charm. সে আমার রূপ অথবা অন্য কিছু তা জানি না। তবে আমার একটা আকর্ষণী শক্তি আছে। পুরুষেরা ছুটে আসে। মেয়েদের এ প্রলোভন সংবরণ করা খুব শক্ত। খেলতে তার ইচ্ছে হয় স্বাভাবিক ভাবে। আমার বেলা তার সঙ্গে মিশেছে আর একটা শক্তি। Sir, আপনি আমার পিতৃতুল্য, কন্যার মত স্নেহ করেন। আমাকে বিশ্বাস করুন আমি সত্য বলছি। একটা প্রতিহিংসা এসে মিশেছে আমার এই খেলা করার প্রকৃতির সঙ্গে। সে আমার দিদির জন্যে। তিনি আমার মতই আকর্ষণময়ী ছিলেন। কিন্তু তিনি ছিলেন শান্ত সৎ ধীর। ডাঃ সেন, তাঁর মত পবিত্র সুন্দর একটি মেয়ে জীবনে আমি দেখি নি। তিনি আত্মহত্যা করেছিলেন। কেন জানেন ? দিদি একজন অধ্যাপককে ভালবাসতেন। বিয়ের সব ঠিকও হয়েছিল। কিন্তু হঠাৎ অধ্যাপক দিকিকে ছেড়ে আমাকে ভালবাসলেন। কারণ দিদির আকর্ষণী শক্তি ছিল কিন্তু খেলবার শক্তি ছিল না। আমি খেলতে পারতাম। তাঁর সঙ্গেও আমি আমার অজ্ঞাতসারেই খেলা করেছিলাম। যার জন্যে দিদির ভাবী স্বামী দিদিকে ফেলে আমাকে নিয়ে উন্মত্ত হলেন। দিদি আত্মহত্যা করলেন। কিন্তু বিশ্বাস করুন আমি তাঁকে ভালবাসি নি। দিদির ভাবী স্বামী বলে শ্রদ্ধা করতাম, ঠাট্টা করতাম। ডাঃ সেন, সংসারে মানুষ পুরুষ অল্প কয়েকজন আছেন। কালকালান্তরের tradition এর creation; যজ্ঞের চরু। বাকী সব animal, beasts.

রিহারস্যালে—আশ্চর্যভাবে সীতা কথাগুলিকে প্রাণবন্ত করে বললে। অতসী পার্টটা ভাল করত। কিন্তু তার বলার মধ্যে একটা acting এর কৃত্রিমতা ছিল। এ যুগের naturalism-এর নামে যে তড়বড় করে সমান একটা সরল রেখার পথে কথা বলে যাওয়ার একঘেয়ে সুর তার মধ্যে নতুন ঢঙের কৃত্রিমতা আছে—সেটা যেন সার্কাসের আসরের চাবুক মারার সশব্দ অভিনয়ের মত মনে হত। সীতা আপন ভঙ্গিতে তার থেকে অনেক ভালই বললে। তবে উচ্চারণে সোফিস্টিকেশন কিছু বেশী।

সকলে তারিফ করে উঠল।

অংশুমান সব থেকে বেশী তারিফ করে বলে উঠল—চ—মৎ—কার। সুন্দর হয়েছে। এই স্পিরিট বজায় রেখে চললে মারভেলাস সাকসেস হবে।

সীতা সিনটা সেরে অংশুর সামনে এসে বসে বললে—এক গ্লাস জল খাব। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে আমার।

অংশুমান বলেছিল—কিন্তু you have won the battle.

সীতা বলেছিল—হ্যাঁ। দেখলাম এমন কিছু নয়। ফাঁসির আসামীর পাটাতনের উপর দাঁড়ানো নয়।

অল্পক্ষণ পরেই এল সেই সিন। অংশুমান নায়ক হিসেবে প্রথম বের হবে স্টেজে। রোগশয্যায় শুয়ে অভিনয়। অংশুমান তার পার্ট বলতে বলতে সীতার দিকে তাকিয়ে দেখেছিল; সীতা একেবারে মুগ্ধ অভিভূতের মত তার অভিনয়ের মহলা দেখছিল। অংশুমান সাধারণ মহলার আসরের চেয়ে একটু বেশী প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছিল।

ভরাট গলা অংশুমানের। চোখ তার স্বপ্নাচ্ছন্ন হয়ে উঠেছিল—আপনাআপনি হয়ে উঠেছিল। রুগ্নদেহ নববধূর অশরীরী আত্মার জন্য প্রতীক্ষমাণ নায়কটি জেগে বসে ছিল। রাত্রে যখন সবাই ঘুমোয় তখন সে নিত্যই জেগে থাকে। সে যেন, দূর দূর অতিদূর কোন লোক থেকে ডাক শুনতে পায়, অশরীরিণী বধূ বলে—"ওগো—ওগো—আমায় ধর—আমায় টেনে নাও!" পাতার খসখসানি ভেসে আসে, সে-খসখসানি শুনে সে বুঝতে পারে অসহায়ভাবে বায়ুস্তরে বধূর অশরীরী কায়াখানি ভেসে বেড়াচ্ছে। সে দু'হাত বাড়িয়ে সেদিন সেই জলের জলায় যেমন তার জন্যে হাত বাড়িয়েছিল তেমনিভাবেই এই শূন্যতার সমুদ্রের মধ্যে তার জন্যে হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে। ঝিল্লী ডেকে যায়—তার মধ্যে নায়ক শোনে তার জীবনজোড়া কান্না! কিন্তু আজ তাদের সব প্রতীক্ষার শেষ। সে আসবে। আজ বৎসর পূর্ণ হল। আজ শ্রাবণের পূর্ণিমা তিথি। সে আসবে। নিঃশব্দ পদপাতে এসে দাঁড়াবে এবং রাত্রি দুপুরের ঠিক সেই লগ্নে আমি বাঁশী বাজাব—তার সুরের সূত্র ধরে সে এসে দাঁড়াবে ওই জানালার ধারে—

—উঠুন। সীতা দেবী—উঠুন। বলেছিল রঞ্জন।

—আমি? সীতা চমকে উঠেছিল।

—হ্যাঁ। জানালার ধারে এসে দাঁড়িয়েছেন আপনি। ডাকছেন—মধুকর! ক্যাচ ধরে ডাকতে হবে। মানে ওর অসমাপ্ত কথা আপনার কথায় সমাপ্ত হবে।

সীতা সেন উঠে দাঁড়াল। রঞ্জন পরিচালক—সে বলল, অংশুদা আর একবার শেষটা বলুন। অংশু চোখ দুটি উপরের দিকে তুলে বিষণ্ণ-উদাস অথচ প্রত্যাশাভরা কণ্ঠে বলল—রাত্রে ঝিল্লী ডেকে যায়, আমি শুনতে পাই তার জীবনজোড়া কান্না বেজে চলেছে। একটু থেমে সে আবার শুরু করল, কণ্ঠস্বর পালটাল—একটু দীপ্ত হয়ে উঠল। অংশুমান বলল—কিন্তু আজ সে আসবে। নিঃশব্দ পদক্ষেপে আসবে। আমি বাঁশী বাজাব—বাঁশীর সুরের সুতোটি ধরে সে এসে দাঁড়াবে হয়তো ওই জানালার ধারে—আমাকে ডাকবে—

এই ক্যাচ ধরেই সেই নার্সটি বধূর ছদ্মবেশ পরে জানালার ধারে এসে দাঁড়াবে—বলবে—মধুকর! আমার মধুকর—!

রঞ্জন তাকে ইশারা করেছিল—বলুন বলুন। মিস সেন!

বলতে চেষ্টাও করল সীতা সেন কিন্তু বলতে পারল না। কেমন যেন নার্ভাস হয়ে গেছে,

মুখ দেখেই বোঝা যায়। সময় পার হয়ে গেল কিন্তু কোনমতেই কথা বলতে পারল না।

অংশু বলল—আচ্ছা আমি আবার বলছি। সে শুরু করল। কিন্তু তবুও বলতে পারল না সীতা সেন—মুহূর্তে মুহূর্তে তার মুখখানা ফ্যাকাসে ক্লিষ্ট হয়ে যাচ্ছে। চোখের দৃষ্টি কেমন অসহায় ভয়ার্ত হয়ে উঠছে। চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে সে।

অবশেষে সে বলল—এ আমি পারব না। বলে অত্যন্ত ধীর পদক্ষেপে এসে বসে পড়ল। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মাথা নীচু করে বসে রইল। গোটা ঘরখানাই নিস্তব্ধ। সকলে চুপ হয়ে গেছে। তারা চোখে দেখতে পাচ্ছে মেয়েটির অবস্থা। এ অবস্থায় কি বলবে—কি বলতে পারে?

নীরবতা ভঙ্গ করে অংশু বলল—কি হল? আসছে না?

মুখ মাথা নেড়ে সে বলল—না!

—এক কাজ করুন। বইখানার ওই সিনটা রিডিং পড়ুন। বেশ উঁচু গলায়। অবশ্য অ্যাকটিংয়ের মত করে। পড়ুন!

সীতাকে বইখানা এগিয়ে দিল রঞ্জন। সীতা কিন্তু স্পর্শ করল না। অংশু বলল—পড়ুন। সীতা এবার ঘাড় তুলে নাথা নেড়ে বলল—আমি পারব না।

—কেন পারবেন না?

—না। আমি কেমন হয়ে যাচ্ছি। তাছাড়া আপনি এত ভাল পার্ট করছেন—আপনার পরে আমার কথা আসছে না। আমার গলা শুকিয়ে গেছে। হাত পা কাঁপছে। আপনারা অন্য কাউকে দিন।

—বেশ তো একবার পড়ুন না।

—কি হবে পড়ে? পারব না যা—।

—লজ্জা লাগছে?

—লজ্জা? লজ্জা কেন হবে? প্রথম সিনে যে কথাগুলো বললাম—লজ্জা পেলে ওই কথাগুলোই আটকাতো!

—বেশ, আবার আপনি বই দেখে পড়ে যান। আমি পার্ট বলব বই দেখে—আপনি পড়ুন। না হয় সবটাই আপনিই পড়ুন। রিডিং পড়ুন।

বইখানা টেনে নিয়ে পড়ে গেল সীতা। সবটাই পড়ল। অর্থাৎ রিডিং পড়ে সে বর-বধূ যুগলের কথাই বলে গেল। পড়ার মধ্যে অভিনয়-ভঙ্গির রেশ ছিল না কিন্তু পড়ে গেল। অংশু বলল—ঠিক আছে। আমি এবার রিহারস্যালের মত করে আমার পার্ট বলে যাই, আপনার পার্টটুকু আপনি বই দেখে পড়ে যান।

সেটা সে পারল। এরপর অংশু বলেছিল—আজ এইখানেই থাক।

অংশু সেদিন ট্যাক্সিতে শুধু সীতাকে নিয়ে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে নিজে বাসায় ফিরল। ট্যাক্সিতে চড়বার সময় সীতাকে ডাকল—আসুন। পৌঁছে দিয়ে যাব। রঞ্জন তুমি চলে যেয়ো।

ট্যাক্সিতে চড়ে সীতাকে বলল—শাই কেন আপনি?

—শাই? শাই কেন হব? আপনিই বলুন না, আমি শাই? আমি ক্যানভাসারের

কাজ করি, আমি শাই? হাসল সীতা।

অংশু বিস্মিত হয়ে গেল। সীতা পাল্টে গেছে। এ সেই মেয়ে। ক্যানভাসার। রঞ্জন বলেছিল—তাকে সে কফি হাউসে দেখেছে, মেট্রোর বারে দেখেছে, চিড়িয়াখানায় দলের মধ্যে হৈ হৈ করতে দেখেছে—অংশু তাকে নিজের চোখে না দেখলেও তার আভাস পাচ্ছে।

অংশুমান বললে—তা হলে? অভিনয়ে লাভ দিন। এতে নার্ভাস হচ্ছেন কেন?

একটু ভাবল সীতা। বলল—দেখুন, কারণ ঠিক একটা নয়। আমি বসে বসে ভাবছিলাম।

—কারণগুলো কি, বলুন দেখি?

কপালের চুল সরিয়ে সীতা বলল—প্রথম কারণ আপনার সামনে। আপনি খুব ভাল অভিনয় করেন শুনেছিলাম—রিহারস্যালে দেখলাম যা ভাবতাম তার থেকে অনেক ভাল। মনে হল এরপর আমি যে কথাগুলো বলব তা শুনে লোকে বোধ হয় হাসবে।

—না, হাসবে না। একটু প্রাণ দিয়ে অভিনয় করতে হবে। নিজেকে একটু ভুলতে হবে। দেখবেন আমার চেয়ে—

সীতা সেন বলল—সেই হয়েছে বিপদ। কিছুতেই ভুলতে পারছি না নিজেকে। তাছাড়া—। কিছু মনে করবেন না তো?

—কেন, মনে করব কেন?

—ব্যাপারটা রোমান্টিক ননসেন্স মনে হচ্ছে আমার। আমি মডার্ন-টডার্ন বুঝিনে। হাল-ফ্যাশান জানি। সাজতে-গুজতে পারি। কথাও বলতে পারতাম, এখন ক্যানভাসারি করে প্রায় টেপ রেকর্ডারের মত বেজে চলি। বাবা ছিলেন রিটায়ার্ড গভর্নমেন্ট সারভেন্ট—বাড়িতে এককালে সায়েবীয়ানা ছিল, রিটায়ারমেন্টের পর অনেক কমিয়েছিলেন, কিন্তু উঠিয়ে দেন নি। ছেলেবেলায় মিশনারী ইস্কুলে পড়েছি। বড় হয়ে কিছুদিন লরেটো, তারপর অর্থাভাবে দেশী ইস্কুলে।

* * *

সেইদিন ওই ট্যাক্সিতেই পূর্ণ পরিচয় পেয়েছিল সীতা সেনের। অত্যন্ত সহজভাবে কথায় কথায় সীতাই বলে গিয়েছিল। সোফিস্টিকেটেড ঘরের মেয়ে। যত নাক উঁচু, ভাঙা অবস্থার জন্য জটিল ধুলোমাটির রিয়েলিটির উপর তত বেশী অনুরাগ। ওইটেকেই চরম সত্য মনে করে সেন্টেড হেয়ার অয়েল কিংবা দামী শ্যাম্পুর অভাবে চুল রুখু করে রাখে। ধুলোবালি মাথার মতো দেখায়। কিন্তু নারকেল তেল মাখতে পারে না।

বাপ ছিলেন ইংরেজ আমলের ছোটখাটো গেজেটেড অফিসার। ছিলেন সাব-ডেপুটি, স্বভাবে ঝগড়াটে লোক। উপরওয়ালাদের সঙ্গে ঝগড়া করতেন। বলতেন—বিদ্যে তো সেই এক। তুমিও এম-এ, আমিও এম-এ। তবু সুবিধেবাদের কেরামতিতে কিংবা মুরুব্বীর জোরে তুমি দু'ধাপ ওপরে আমি দু'ধাপ নীচে। আবার সে আমলের ন্যাশনাল লীডারদের বলতেন—লোফার। দু' বছর জেল খাটলেই হিরো! বিদ্যে ম্যাট্রিক ফেল—নয় পাস। এমনি

ধরনের মানুষ ছিলেন বাবা। স্বাধীনতার পর তারাই যখন দেশের কর্ণধার হল তখন নিজের বিষেই নিজে জর্জর হয়ে গেলেন। লম্বা ছুটি পাওনা ছিল তাই নিয়ে বসলেন। ফলে ইংরেজ আমল থেকে দেশী আমল পর্যন্ত থেকে গেলেন সেই সাব-ডেপুটি গ্রেডে। মেজাজটা বরাবরই ছিল সায়েবী। বাড়িতে স্টাইলটা যথাসম্ভব অভিজাত করে রেখেছিলেন। দুই ছেলে তিন মেয়ে; সীতা ছোট মেয়ে। ছেলেদের পড়াতেন সেন্ট জেভিয়ার্সে সিনিয়র কেম্ব্রিজ কোর্সে। মেয়েদের পড়াতেন লরেটোতে। ছেলে দুটি ইংরেজীতে পাকা কিন্তু বাকী সব কিছুতেই গোবরের মত কাঁচা। দুই মেয়েই সব থেকে বড়। তাদের বিয়ে দিয়েছিলেন ইংরেজ আমলে চাকরি থাকতে থাকতে। ছেলেরা বিয়ে করেছিল ভাল ঘরে; মানে মফস্বলের অবস্থাপন্ন জমিদার-কাম ব্যবসায়ীর ঘরে। সার্কেল অফিসারি সূত্রে পরিচয় হয়েছিল। তারা প্রত্যাশা করেছিল—হাকিমের ছেলে—দস্তুরমত স্টাইলদার এবং চমৎকার ইংরিজী বলে—এ ছেলেরা বড় চাকরে হবেই। ছেলেদের তখন পঠদ্দশা। পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট ক্লাসে পড়ে। বছরের পর বছর পরীক্ষা দেয় না ফার্স্ট ক্লাসের জন্যে। স্টুডেন্ট মুভমেণ্ট করে। মেয়ে সীতা তখন লরেটোতে ফ্রক পরে স্কুলে যায়।

রিটায়ারমেণ্টের পর বাপ প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের যে টাকা পেলেন তাই নিয়ে নতুন করে নামলেন বিস্তৃততর জীবনক্ষেত্রে। শেয়ার মার্কেটে। ছেলেদের আশা তখন গেছে। ছেলেরা এম-এতে থার্ড ক্লাস নিয়ে কোন রকমে বেরিয়ে ধরাপড়া করে ঢুকেছে গভর্নমেণ্ট সার্ভিসে। একজন ফুড ডিপার্টমেণ্টে ইন্‌স্‌পেক্টার, অন্যজন সেক্রেটেরিয়েটে ক্লার্ক।

বাবা একখানা সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড গাড়ি কিনলেন—নইলে শেয়ার মার্কেটে খাতির থাকে না। এবং পরিচিতদের কাছে বেশ মাথা উঁচু করে বলা চলে না—বিজিনেস করছি। এবং তখন অবস্থাটা ভিতরে ভিতরে যাই হোক বাইরে থেকে নিজেও কিছু বুঝতে পারেন নি। পৈতৃক বাড়ি আছে, পেন্সন আছে। ছেলেরা মাইনে আনে। বউদের ছেলেপুলে হয় নি। চলছিল ভালই। হঠাৎ শেয়ার মার্কেটে ডুবলেন মিঃ সেন।

ব্যাঙ্ক করেছিলেন আর এক সেন সাহেবের সঙ্গে জুটে। সেই ব্যাঙ্ক ডুবল। আসল সেন সাহেব ব্যাঙ্কের টাকা সরিয়ে ধরা দিয়ে জেল খাটলেন। আর সীতার বাবা সেন—তিনিও ছিলেন ডিরেক্টার—তিনি শেয়ারগুলো লোকসান করে বেচে সব শেষ করে পুরনো মোটরে চেপে বাড়ি ফিরলেন। দু'দিন পর সেটাও বেচে ঘরে ঢুকে বসে ব্রহ্মাণ্ডকে গাল দিতে দিতে একদা হার্টফেল করলেন।

সীতা তখন আই-এ পড়ছে। সেও পড়ার ক্ষেত্রে ভাইদের যোগ্য বোন; একবার ফেল করেছে। বিয়ে হয় নি। কলেজে যায়—মেয়েদের ছেলেদের সঙ্গে আড্ডা মারে। তারপর বছরখানেকের মধ্যে ভাইরা পৃথক হল। শুধু ভাইয়ে ভাইয়ে নয়, মায়ের সঙ্গেও পৃথক হয়ে গেল। সীতার দায়িত্বও কেউ নিলে না। সীতা বললে—ঠিক আছে—আমার দায়িত্ব আমিই নেব, শুধু আমারই নয় মায়ের দায়িত্বও রইল আমার।

লরেটোয় পড়া মেয়ে, মোটমাট শ্রীমতী। স্টাইল জানে, ইংরেজিতে ভালো কথা বলে। এই ভারতবিখ্যাত ইলেকট্রিক্যাল কোম্পানীর ক্যানভাসারের চাকরি যোগাড় করে নিলে।

বাপের পরিচয় কিছু সাহায্য করেছিল, কিন্তু তার থেকেও বেশী সাহায্য করেছিল তার এই মডার্ন জীবন—এই স্বরূপ, এই প্রগল্‌ভতা। এই চমৎকার ইংরিজী বলতে পারা। কোম্পানীর মক্কেল বাঙালী বেশী নয়। বাঙালীরা ঘুঁটের ধোঁয়া আর কয়লার ধোঁয়া ছাড়া রান্না করতে পারে না আর বোধ হয় অল্প আঁচে রান্না করলে ধোঁয়ার একটু গন্ধও থাকে না বলে ব্যঞ্জনে মিষ্টি লাগে না। ভিন্ন প্রদেশবাসীরা বেশী খদ্দের বড় খদ্দের—বিশেষ বর্তমান কালের রাষ্ট্রনায়কদের জাতেদের, যাদের বাড়িতে লণ্ডন নিউইয়র্কের সুখ-সুবিধে আমদানী হয়েছে, যাদের মেয়েরা গঙ্গাস্নান করে এবং বাচ্চাদের 'বেবী' বলে ডাকে। ঝিদের আয়া বলে—চাকরদের বয় বলে। পুরুষেরা কোট-প্যাণ্ট পরে। বছরে দু'একবার ইয়োরোপ অ্যামেরিকা যায়। ফরেন ব্যাঙ্কে যাদের মোটা ব্যাঙ্ক-ব্যালেন্স। খদ্দের তারাই। তাদের সঙ্গে চাকুরে মাদ্রাজীরা আছে—ফরেনার তো আছেই। এদের কাছে তার মত মডার্ন ক্যানভাসারের অনেক মূল্য বলেই কোম্পানীর কাছেও তার আদর হয়েছিল অনেক।

* * *

কথাগুলি হতে অনেকক্ষণ সময় লেগেছিল। ট্যাক্সিওলা অংশুমানের চেনা। সে তাকে একেবারে তার বাড়িতে এনে হাজির করেছিল। গাড়িটা থামলে দুজনের খেয়াল হয়েছিল। এবং দুজনেই হেসে উঠেছিল। সীতা বলেছিল—এ মা! দেখুন তো কাণ্ড! ট্যাক্সি ফেরাতে বলুন। আমায় পৌঁছে দিয়ে আসুন।

অংশু বলেছিল—কথাগুলো শেষ করুন। আপনার দেওয়া কেটলিতে তৈরী কফি খেয়ে নিন।' ট্যাক্সি রইল। বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসব।

কথা শেষ করে সীতা বলেছিল—ও অত্যন্ত আনরিয়াল। অ্যাবসার্ড। ও পার্ট আমি পারব না। আমার ক্যানভাসারিই ভাল। ওই ব্যাপারটার কিছুতেই সত্যি বলে মানতে আমি পারছি না।

অংশুমান বলেছিল—সত্যি তো নয়। বলেই তো দেওয়া আছে মিথ্যে।

সীতা তার দিকে সবিস্ময়ে তাকিয়েছিল। অংশুমান বলেছিল—এমন করে তাকাচ্ছেন যে! বলুন তো ওটা কি সত্যকারের লাভ সিন? না—একটি মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত তরুণকে প্রেমাভিনয় করে তাকে বাঁশী বাজানো থেকে নিরস্ত করা হচ্ছে এবং তার বাঁচবার ইচ্ছা—will to live জাগ্রত করা হচ্ছে? নাটকে কি স্পষ্টভাবে বলে দেওয়া নেই?

বেশ কিছুক্ষণ ভেবে নিয়ে সীতা যেন সমস্তটা বুঝে নিয়েছিল এবং ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়ে বলেছিল—হ্যাঁ। একমুহূর্ত পরেই কিন্তু বলেছিল—কিন্তু মেয়েটা অভিনয় করতে গিয়ে তো প্রেমে পড়েছে। বিষ খেয়ে মরেছে।

—তা মরেছে। সেখানটায় তো আপনি শুধু শুয়ে থাকবেন চোখ বুজে। মরতে তো হচ্ছে না আপনাকে। আপনার নিশ্বাস পড়বে—তা পড়বে; সেটা নাট্যশাস্ত্র অনুসারে আপত্তিজনক হবে না!

হেসে উঠেছিল সীতা।

* * *

বিপদ বেধেছিল স্টেজ রিহারস্যালের দিন।

সেদিন অংশুমানের মন অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ছিল। প্রায় তিনটে মাস চলে গেছে। দেরি হয়েছে তারই জন্যে। কয়েকটা বড় কনফারেন্স গেল। লিটারারি কনফারেন্স দুটো, দুটো ড্রামা ফেস্টিভ্যাল। তাকে যেতে হয়েছিল। দিল্লীতে সংগীত নাটক একাডেমিরও একটা নেমন্তন্ন সে পেয়েছিল। কিন্তু সেদিনের ক্ষোভ সেজন্যে নয়। সেদিন খবর এসেছে সন্ধ্যের সময়—নেহেরু পার্লামেন্টে বলেছেন—তিন দিন আগে ৩১শে মার্চ তিব্বতের জীবিতবুদ্ধ বুদ্ধের অবতার দালাই লামা, তাঁর মা তাঁর ভাই বোন, তিনজন মন্ত্রী এবং দুজন শিক্ষক সঙ্গে নিয়ে ভারতবর্ষের মাটিতে এসে পৌঁছেছেন।

হায় বুদ্ধের অবতার, হায় ধর্ম, হায় ঈশ্বর! চীনের মাও সে-তুঙ অবতার নন। তিনি জনগণের ডিকটেটর। ক্ষমাহীন পরিচালক। সর্বময় অধিকর্তা। তাঁর ভয়ে জীবিতবুদ্ধ শরণ নিয়েছেন এই দুর্বল ভারতের! একটা ক্ষুব্ধ চিত্ত নিয়েই সে এসেছিল। রাজনীতির কোনটিকেই সে মানে না, চায় না, তবুও সে যখন আপন দাপটে এসে ব্যক্তিজীবনকে পর্যন্ত নাড়া দেয় তখন ক্ষুব্ধ না হয়ে উপায় কোথায়?

সেদিন স্টেজ রিহারস্যালের সময় প্রথম সিনগুলিতে সুন্দর অভিনয় করে ওই সিনে অংশুমানের কথা ধরে নববধূর ছদ্মবেশ পরে সীতা ঢুকল ঠিক কিন্তু কথা বলতে পারলে না। প্রমটার বার বার কথা ধরিয়ে দিলে—সে বলবার চেষ্টা করলে কিন্তু বলতে পারলে না।

ভিতর থেকে রঞ্জন জিজ্ঞাসা করলে—কি হল?

সে কিছু বলতে পারে নি শুধু থরথর করে কেঁপেছিল।

সকলে বলল—কি হল?

সীতা অসহায় ভয়ার্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল, ঘামছিল; দরদরধারে ঘামছিল। একটু একটু হাঁপাচ্ছিল। রঞ্জন এসে বলেছিল—মিস সেন, কি হল?

সে বলেছিল—পারছি না। এ আমি পারব না রঞ্জনবাবু।

—সে কি?

—না! আমি পারব না! আমার সর্বাঙ্গ কাঁপছে! দেখুন!

ষোড়শী সংঘের সকলে রাগে অধীর হয়ে উঠেছিল। বিমল গুপ্ত বলেছিল—রাবিশ! গ্রে বন্ধ করে দিন! রঞ্জনবাবু আর অংশুবাবু এর জন্যে দায়ী।

মাসীমা বলেছিলেন—এ যে দারুণ ন্যাকামি। আমরা পারিনে!

অংশু উঠে এসেছিল এবার, সে স্টেজে তার জায়গায় বসেই ছিল। উঠে এসে বলেছিল—সরুন তো সব। সকলেই সরে গিয়েছিল। অংশু এসে সামনে দাঁড়িয়েছিল সীতার। বলেছিল—কি হয়েছে তোমার? একমুহূর্তে সেদিন তাকে 'তুমি' বলেছিল সে। কণ্ঠস্বর তার রূঢ় কঠিন।

সে কণ্ঠস্বর শুনে সীতা সকরুণভাবে তার মুখের দিকে তাকিয়েছিল।

অংশু প্রশ্ন করেছিল—কি হয়েছে বল?

করুণ কণ্ঠেই সীতা বলেছিল—আমি পারছি না। আমি কাঁপছি! ঘামছি!

—না কাঁপছ না! ঘামছ ঘাম। পার্ট করতেই হবে!

সীতা বলেছিল—না, আমি পারব না!

খপ করে তার হাত ধরে অংশু তাকে টেনে গ্রীনরুমের একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল। সীতা বিহ্বল হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল—কোন প্রশ্ন করতে পারে নি।

—পারবে না কেন?

সীতা এবার একলা অংশুমানকে পেয়ে দীপ্ত হয়ে উঠেছিল এবং বলেছিল—না। পারব না। আমি পারছি না! করব না আমি অভিনয়!

—কি—ভেবেছিলে কি?

—কি?

—সাহিত্যিক অংশুমান তোমার প্রেমে পড়েছে? এবং ভয় হচ্ছে, অভিনয় করতে গিয়ে তুমি তার প্রেমে পড়ে যাবে?

নির্বাক স্তব্ধ হয়ে গেল সীতা। তার সুন্দর মুখ পেণ্টের রঙে আরও সুন্দর হয়ে উঠেছিল—সে মুখ যেন কালো হয়ে গেল। দুটি অশ্রুর ধারা তার চোখের কোল বেয়ে নেমে এল।

—কাঁদছ কেন? কেঁদে কি ফল? এদের কথা ভাবছ না তুমি?

চোখ মুছে উঠে দাঁড়িয়েছিল সীতা। বলেছিল—চলুন।

কোন উৎসাহবাক্য বলে নি অংশু—কোন সান্ত্বনা দেয় নি—দরজা খুলে বলেছিল—এস!

স্টেজে এসে বলেছিল—আরম্ভ কর। গোড়া থেকে। এই সিনের গোড়া থেকে। বিকেল থেকে সিন আরম্ভ। বিকেলের আলো—। বিকেলের আলো দাও! প্রমটার—

আরম্ভ হয়ে গেল। একপাশে উইংসের ধারে মাটির মূর্তির মত দাঁড়িয়ে ছিল সীতা। মাটির দিকে চেয়ে ছিল। হঠাৎ তার কানে এসেছিল অংশুমানের কথা—কিন্তু আজ সে আসবে। নিঃশব্দ পদক্ষেপে আসবে! আমি আমার বাঁশীর সুর ছড়িয়ে দিয়েছি। তারই সুতো ধরে এসে সে হয়তো ওই জানালার ধারে দাঁড়িয়ে ডাকবে—মধুকর—!

সীতা এসে ঠিক দাঁড়িয়েছিল জানালার ধারে। কণ্ঠস্বর একটু মৃদু হয়েছিল।

কে একজন বলেছিল—লাউডার।

অংশু বিরক্তিভরে বলেছিল—না! ঠিক ডাক হয়েছে। লাউডার হবে না। প্রেমের অভিনয় চীৎকার করে ঢাক বাজিয়ে হয় না। ডিস্টার্ব করবেন না। প্লিজ! তবে একটু ড্রাই হয়েছে।

আবার এই জায়গাটা থেকে আরম্ভ করতে হয়েছিল। সীতা আবার ঠিক এসে ডেকেছিল—মধুকর! তারপর চলেছিল অভিনয়ের মহড়া। আগামীকালের জন্য প্রস্তুতি। ঠিক চলছিল! শুধু সীতা প্রাণহীন! শুধু বলেই গিয়েছিল। বলেই যাচ্ছিল প্রমটার যেমন বলাচ্ছিল। কিন্তু কেঁপেছিল সে সারাক্ষণ। মুখখানা বিবর্ণ। তবু সে পার্টটা চালিয়ে গিয়েছিল। সিন শেষ করে বাইরে এসে সে বসে পড়েছিল। অনেকক্ষণ হাঁপিয়েছিল। একান্ত অসহায়ের মত

তার সে মুখ মনে রয়েছে অংশুমানের। সেই মুখের ছায়া যেন কালকের অচেতন সীতার মুখে ভেসে উঠেছিল।

রঞ্জন এসে পাখাটা খুলে দিল। দুই হাতে মুখ ঢেকে বসে আছে সীতা। সম্ভবতঃ কাঁদছে। অংশুমান দৃশ্য বদল হতে এসে দাঁড়াল সেখানে। বলল—মরে শুয়ে থাকার সিনে আজকে ওকে শুতে হবে না। এমনি করতে বল।

তবে স্টেজ রিহারস্যাল দেখে ষোড়শী সংঘের সভ্যদের অসন্তোষের শেষ ছিল না। অংশুমান বলেছিল—কি করব? উপায় কি? তবে—। থাক। যা হয় হবে। তার একটা প্রত্যাশা ছিল।

* * *

পরদিন পরিপূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে এযুগের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার শচীন সেনগুপ্তের সামনে অংশুমানের প্রত্যাশা আশ্চর্যভাবে সত্য হয়ে উঠল। সীতা এল যথাসময়ে। নীরব স্তব্ধ। এবং চোখ দুটি অত্যন্ত ধারালো মনে হল। কিছু পান করেছে কিনা সে নিয়ে মহিলারা একটু কানাকানি করলেন। কিন্তু কোন ব্যতিক্রম বৈলক্ষণ্য কেউ দেখতে পেল না। ওদিকে সীতা প্রথম দৃশ্যে ধারালো ছুরির দীপ্তি নিয়ে প্রবেশ করল। সে যখন বক্র তিক্ত হেসে বলল —যা আমার মন করায় আমি তাই করি ডাক্তারবাবু। আমার তো তা অন্যায় মনে হয় না। মনে হলে করব কেন? আর অন্যে তাকে অন্যায় বললে মানব কেন?

—মানবে না?

—না। আর পথ? কোন্ পথে মানুষ কোথায় কবে কোন্ স্বর্গে পৌঁছেছে বলতে পারেন? সেই মাটির ধুলোতেই তো সে চোখের জল ফেলে, শেষ নিঃশ্বাস ফেলে। তারপর ছাই হয়ে কিংবা পচে মাটির ধুলোতেই মিশে যায়……। পাপ-পুণ্যের বিচার লোকে বলে ভগবানের হাতে। তিনি নেই বলেই আমার ধারণা। আমি মানি না। থাকলে তো এমনিতেই আমার সাজা হবে তাঁকে না-মানার জন্যে। তার উপর এই সব যদি পাপই হয় তবে তার সাজাটা বোঝার উপর শাকের আঁটিই হবে। ফাঁসির হুকুমের পর পাঁচ বছর কারাবাসের ব্যবস্থা হবে।

সে কথা শুনে লোকে শিউরে উঠল। স্তম্ভিত হল। কি প্রখরা কি উদ্ধত উগ্র মেয়ে! তারপর কিন্তু শেষ দৃশ্যে সে যখন বধূবেশে এল, তখন তার কণ্ঠ যেন বিরহবিধুরা চক্রবাকীর মত করুণ। এবং অভিনয়ের মধ্যে মনে হল অংশুমানের কাছে বসে থাকলেও একটা অদৃশ্য নদী তাদের মধ্যে বয়ে যাচ্ছে। যার অপর পারে সে বসে রয়েছে। কিন্তু সে আজও কাঁপছিল। থরথর করে কাঁপছিল। মুখের পেন্টের উপর বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিয়েছে। পার্ট শেষ করে সে টলতে টলতেই বেরিয়ে গেল। প্রেক্ষাগৃহে দর্শকেরা কাঁদছে। মাসীমা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন। বড়দিদি চুপ করে বসে আছেন। দুটি জলের ধারা তাঁর চোখের উপর চিকচিক করছে—তিনি মোছেন নি। মুছতে ভুলে গেছেন।

শেষ দৃশ্যে প্রবীণ ডাক্তার চিঠিখানা পড়েছিলেন। তারপর সুপ্রিয়া নার্সের গায়ে হাত

রেখে নাড়া দিয়ে ডাকার কথা—সুপ্রিয়া সুপ্রিয়া—মা। তাই করতে গিয়ে ডাক্তারবেশী বিমল গুপ্ত চমকে উঠেছিল। সীতা অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল।

মাসীমা স্টেজের ভিতর ছুটে গেলেন। বড়দিদি এবং অন্য সভ্যরা ও কিছু নিমন্ত্রিতেরাও গেলেন স্টেজের মধ্যে। শচীনবাবুও গেলেন। ডাক্তারবেশী বিমল গুপ্ত স্টেজের দরজায় দাঁড়িয়ে ছিল। সে বলেছিল—হিরোইন অজ্ঞান হয়ে গেছে। এখন—একটু—।

অর্থাৎ ভিতরে যাবেন না।

শচীনবাবু বললেন—একদিন আমার ওখানে তোমাদের সব নিমন্ত্রণ, বলো অংশুকে।

জ্ঞান হতে দেরি হয়েছিল সীতার।

স্টেজ থেকে বেরিয়ে সীতা টলতে টলতেই গ্রীনরুমে এসেছিল এবং এসেই নার্সের ভূমিকায় অন্য অন্য সেটে যেতে যেতেই পথেই লুটিয়ে পড়েছে জ্ঞান হারিয়ে। রঞ্জন তাকে তুলে পাখার তলায় শুইয়ে মুখে চোখে জল দিয়েও জ্ঞান ফেরাতে পারে নি। ডাক্তার ডাকতে হয়েছে। এর মধ্যে অংশুমানও এসেছে। সে ওর পাশে ঝুঁকে বসে আছে। ডাক্তার বলেছেন অত্যন্ত স্ট্রেন হয়েছে। খুব ইমোশনের সঙ্গে পার্ট করার জন্যে হয়েছে। এখন বিশ্রাম—ফুল রেস্ট। অন্ততঃ ঘণ্টাখানেক শুইয়ে রাখুন। জ্ঞান অবশ্য একটু পরেই হবে। একটু গরম দুধ—না হলে জল দিন। ওই চোখের পাতা কাঁপছে। চোখ মেলবেন। কিন্তু ভিড় করবেন না। না।

আধঘণ্টা পর রঞ্জন সীতাকে বলল—গাড়ি আনতে বলি?

সীতা বলল—হ্যাঁ।

রঞ্জন বেরিয়ে গেল—অংশুমান সামনে চেয়ারে বসে সিগারেট টানছিল। সে বলল—সীতা!

সীতা তার মুখের দিকে তাকাল।

অংশুমান বলল—তোমাকে আমি ভালবাসি সীতা।

সীতা একটু হাসল কিন্তু কিছু বলল না।

রঞ্জন ফিরে এসে দাঁড়াল।—গাড়ি এসেছে।

সীতা উঠে দাঁড়িয়ে বলল—আমার মনকে আমি বুঝে দেখব অংশুবাবু। পরে—

—পরে?

—আজকেই—এখনি উত্তর চান?

—হ্যাঁ।

একটু চুপ করে থেকে সীতা বলল—না। তারপর বলল—অভিনয়—অভিনয় অংশুবাবু। ভুলে যান। অভিনয় শেষ হয়ে গেছে।

অংশুমান দৃঢ়কণ্ঠে বলল—না। অভিনয়ও সত্য হয়। জ্ঞান বুদ্ধি যুক্তি হারিয়ে মানুষ লুটিয়ে পড়ে ধুলোয়।

সীতা মাটির দিকে তাকিয়ে রইল। অকারণে বা সাধারণের অগোচর কোন কারণে টপটপ করে চোখ থেকে জল ঝরে পড়ল।

* * *

পরদিন থেকে—তাই বা কেন—সেই মুহূর্ত থেকেই সীতা এসেছিল তার জীবনে। এবং সে পৌঁছেছিল সীতার জীবনে। কিন্তু স্বামী স্ত্রীর বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে নয়।

মনে পড়ছে প্রথম কথাগুলো। সে নিজেই গিয়েছিল সীতার বাড়ি। প্রত্যাশা করেছিল দেখা হবে শচীনবাবুর বাড়িতে; তিনি সার্থক অভিনয় দেখে খুশী হয়ে সকলকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন তাঁর বাড়িতে। কিন্তু সীতা সেখানে আসে নি। ট্যাক্সি করে নিজে অংশু গিয়েছিল তাকে আনতে। সীতা বেরিয়ে এসেছিল কিন্তু নিমন্ত্রণে আসতে চায় নি। বলেছিল—না মাফ করবেন—আর অভিনয় নয়। শেষ করেছি অভিনয়ের পালা।

অংশু বলেছিল—কিন্তু 'অভিনয় নয়ের' পালার নিমন্ত্রণ আমি তোমাকে কাল জানিয়েছি সীতা। তুমি কথায় তার জবাব দাও নি। কিন্তু চোখের জলে উত্তর দিয়েছ।

এবারও কথার জবাব না দিয়ে সীতা চুপ করে দাঁড়িয়েছিল।

—সীতা!

—বল।

উল্লসিত হয়ে অংশু তার হাত ধরে বলেছিল—বলুনের বদলে বল বলেছ তুমি।

সীতা বলেছিল—তা বলেছি। কিন্তু অভিনয় করে আর নয়। ও আসরে তুমি আমাকে মাফ কর। আমি শচীনবাবুর বাড়িতে গিছলাম সকালবেলা। তিনি বলেছেন—সীতা, অংশু নাটক লেখে লিখবে। লিখুক। প্রয়োজন আছে। কিন্তু যদি তুমি ওকে ভালবেসে থাক তবে সীতা হয়েই ভালবেসো। হয়তো এ যুগ সীতার যুগ নয়। তবু এ যুগের সীতা হতে চেষ্টা করো।

সেদিন অংশুমান বলেছিল—তাই হবে।

* * *

কিছুদিনের মধ্যেই কানাকানি শুরু হয়েছিল পরিচিত মহলে। যে কানাকানি চিরকাল হয়ে আসছে, সমাজে সংসারে তাই। কলকাতায় সমাজ নেই, সীতা এবং অংশুর পরিচিত মহলে আছে, সেই দুই মহলই প্রখর এবং মুখর হয়ে উঠেছিল। কিন্তু ওদের দুজনের কেউই তা গ্রাহ্য করে নি—না সীতা, না অংশুমান। কিন্তু সীতা মাসখানেক পর এসে বলেছিল—দেখ ওদের চাকরি ছেড়ে দিলাম। ওরা বড্ড ধাড়াবাড়ি করছে আমাদের ব্যাপার নিয়ে।

—বেশ করেছ। ওটা আমারও ভাল লাগছিল না। আমার বন্ধুদেরও ছেড়েছি এই জন্যে। রঞ্জনকে পর্যন্ত।

—একটা শান্ত সুস্থ জীবনের চাকরি খুঁজে দাও। মাসে শ'দুয়েক টাকা হলেই চলে যাবে। বাড়ি আছে। ভাড়া লাগে না। শুধু নিজের আর মায়ের খরচ।

—চাকরি করতেই হবে?

—হবে না? কারুর কাছে নিতে আমি পারব না। সে তোমার কাছেও না। তাহলে খেলাঘর পাকা-সংসারের চেহারা নেবে।

অংশু একটা চাকরিও তাকে যোগাড় করে দিয়েছিল। শচীনবাবুর সাহায্য নিতে হয়েছিল

—একটি শিশু এবং নারী প্রতিষ্ঠানের চাকরি। সেখানে শিক্ষিকার কাজ। তাতে খুশী হয়েছিল সীতা। এমনি কাজই যেন সে চাচ্ছিল। বড় বড় ধনীর বাড়ি সেজেগুজে গিয়ে মনোরঞ্জন করতে হয় না, কোম্পানির সহকর্মীদের সঙ্গেও মধ্যে মধ্যে যাওয়া আসা করতে হয় না। তাদের ইট ড্রিংক এণ্ড বি মেরী ক্লাবে হৈ হৈ করতে হয় না। স্মার্টনেসের খেলা খেলার বালাই নেই। ছেলেমেয়েদের নিয়ে এ বেশ সুস্থ শান্ত জীবন—অথচ হৈ হৈ কর, তাদের নিয়ে খেলা কর, গান গাও, এ যেন একটা বড় সংসারের বড়দির কাজ। বিকেলে ছুটি। ছুটি হলেই অংশুর বাড়িতে এসে রান্না খাওয়া হাসি-ঠাট্টা অথচ একটা অতলস্পর্শী গভীর জলস্রোতকে মাঝখানে রেখে দুজনে দুপাশে বসে নির্নিমেষে পরস্পরের দিকে চেয়ে থাকা। সে স্রোতের খাত ওরা ইচ্ছা করে নিজেরাই খুঁড়ে রেখেছে। দুপাশ থেকে দুজনে হাত বাড়িয়ে পরস্পরকে ছুঁতেও পারে। সে ছোঁয়ার স্পর্শ দুজনের কাছে দুজনকেই আরও রমণীয় করে তোলে। তাই তাদের সারা জীবনের পাথেয়—এইভাবেই চলবে তারা জীবনে। তার বেশী নয়। ওই জলস্রোতে দুজনে পড়ে দুজনকে জড়িয়ে ডুবে ওরা মরবে না—মরতে পারবে না।

ফলে দুর্নামের আর অন্ত রইল না। তাতেও ওরা গ্রাহ্য করলে না। সীতার মা বিরূপ হলেন। ভাইরা প্রায় ক্ষেপে গেল। ওদিকে এই দুর্নামের জন্যে সীতার চাকরিটাও গেল।

অংশু বললে—তুমি ভেবো না এর জন্যে। আমার কাছ থেকে তুমি কিছু টাকা নাও। ধার বলে নাও। নিজে স্বাধীনভাবে কিছু করে আমায় শোধ দিয়ো। টাকাটা দিয়ে—

সীতা নতুন করে পড়তে শুরু করেছিল। এক বছর পর আই-এ পাসও করেছিল।

অংশু বলেছিল—এবার পড়া ছাড়।

সীতা বলেছিল—না। আমাকে তোমার যোগ্য হতে দাও।

ভুল বোধ হয় ওইখানেই হয়েছিল।

চিরাচরিত ধারায় এবং পথে সীতা তার যোগ্য হতে চেয়েছিল।

সে নিজেও কি ঠিক তাই চায় নি? শচীনদা সেদিন ছিলেন না। তিনি চলে গেছেন। তিনি সীতাকে বলেছিলেন—যদি ভালবাসো তা হ'লে সীতার মতই ভালবেসো। সীতা হয়েই ভালবেসো।

সেই সীতার মত—

'কায়েন মনসা বাচা' কায়মনোবাক্যে এক হয়ে ভালবেসো।

কল্পনা করতে তারও তো মন্দ লাগে নি। সে যদি বনবাসে যায় তবে সীতাও যাবে বনবাসে তার সঙ্গে। সোনার হরিণ ধরে দিতেও বলবে।

এ কালের মেয়েদের মত বন্ধু-বান্ধব থাকার কথা তো কল্পনা করে নি। মিছিলধারিণী ধ্বজা পতাকা বাহিনী রাজনৈতিক কর্মে নিয়োজিত-প্রাণা সীতার কথা কল্পনা করে নি।

তারা তাদের সমবয়সী বন্ধুদের বিচিত্র সহজ আধুনিক ছন্দে 'তুই' বলে; 'শোন্' বলে; 'ওরে' বলে; তাদের ভ্যানিটি ব্যাগে প্রসাধন দ্রব থাকে না, বিস্ফোরক পদার্থ থাকে। ছুরি থাকে ছোরাও থাকে। যারা রাজনীতির সঙ্গে সংস্রব রাখে না তাদের ব্যাগে কি থাকে?

সব—সব—সব থাকে, বা থাকতে পারে। একটি মেয়ের জীবনে যা প্রয়োজন হ'তে

পারে তাই থাকতে পারে।

সীতা তা পারে নি। সেও পারে নি।

কেন পারে নি?

কেন এমন হ'ল? এমন করে সব পাল্টে গেল কেমন করে?

দুই হাতে মুখ ঢেকে ভাবে অংশুমান।

সীতা এবং তার জীবন ঘটনা-চক্র বা ঘটনা-বিন্যাসের মধ্য দিয়ে পরস্পরের দিকে এগিয়ে মিলতে এসেছিল এবং মিলতে চেয়েওছিল। কিন্তু আগেকার সমস্ত কালের সমস্ত বিধি-বিধানকে অস্বীকার করে নূতন কোন বিধানের সাজেশন নিয়ে মিলতে চেয়েছিল; সেও চেয়েছিল সীতাও চেয়েছিল। শচীনদার ওই সীতা হয়ে মিলবার আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে মনের ঘরের কুলুঙ্গীতে বেলপাতার মত রেখেও, চেয়েছিল। আবার বিবাহের চেয়ে বড়, এক-সঙ্গে অধিকতর বাস্তব এবং পবিত্রতর এক মিলনকে রূপ দিতে চেয়েছিল জীবনে। কিন্তু সব যেন কোন একটা অতি প্রচণ্ড শক্তিশালী অনিবার্যতা এসে ব্যর্থ করে দিল, তছনছ করে দিল।

১৯৫৫ থেকে ১৯৫৯ সাল পর্যন্ত, মাস দিন এক একটি ক'রে গুণে হবে দু বছর সাত মাস কয়েক দিন।

এ সময়ের ডায়রী আছে তার।

জীবন তাদের আশ্চর্যভাবে মুখ ফেরাতে সুরু করেছিল।

মুখ ফেরাতে মানে, বাইরের জগতের সমস্ত ঝড়ঝাপটা বিক্ষোভ থেকে মুখ ফিরিয়ে দুজনে দুজনের দিকে মুখ করে একটু একটু করে এগিয়ে আসছিল।

পরিবর্তন তার থেকে যেন সীতার বেশী।

সে প্রতিষ্ঠার দিক থেকে মুখ ফেরাতে পারে নি। সভা সমিতি আন্দোলন এ সব থেকে একেবারে সংস্রব ছিন্ন করতে পারে নি।

সীতা পেরেছিল।

সীতা প্রথম পড়েছিল পড়া নিয়ে। এক বছরের কমাস বেশী সময়ের মধ্যে আই-এ পাশ করেছিল সে। পড়ছিল বি-এ। সকালে বা দুপুরে আসতো বাড়িতে, রান্নাবান্না কিছু করত নিজের হাতে, কিছু করাতো ভরত-হরিকে দিয়ে; (চাকরের আসল নাম বোধ হয় ভর্তৃহরি, তার থেকে ভরত-হরি। অংশুমান কখনও তাকে 'ভরত', কখনও বা 'হরি') নির্জন দ্বিপ্রহরে দুজনে খেতে বসত, গল্প করত। পড়াশুনার গল্প, জীবনের তত্ত্ব নিয়ে বিতর্ক; সে বিতর্কের মধ্যে সীতা চলে যেত, পৃথিবী পার হয়ে অন্য কোন গ্রহে, অংশুমানকে বলত, তুমি অংশুমান হয়েই তোমার আলো পাঠাবে আমার বুকে।

অংশুমান কিন্তু দুবছর পূর্ণ হ'তে হ'তেই অনুভব করলে—কোথা থেকে যেন উত্তাপ বিকীর্ণ হচ্ছে।

ক্রমে ক্রমে সে অনুভব করলে সে উত্তাপ তারই নিজের মনের অন্তর্লোক থেকে বেরিয়ে আসছে। কিন্তু বলতে যেন সংকোচ হত।

সীতা? সীতার কথা সীতা জানে।

বিচিত্রভাবে নিজেদের একটা খুব আত্মবিস্মৃত মুহূর্তে পরস্পরের কাছে মৃত ঈশ্বর বা বর্তমান কালের সব ধ্বংস করা যে জীবনতত্ত্ব তার নাম নিয়ে শপথ করেছিল—পরস্পরকে, আমরা বাঁধব না—বিবাহ নয় বন্ধন নয়,—দেহ দেওয়া নয় মন বিনিময় ক'রে—সে এক বিদেহী অস্তিত্বের মত মিলন একটা—।

একদিন সে সীতাকে বললে—সীতা আমি যে আর আত্মসম্বরণ করতে পারছি না।

সীতা হেসে বলেছিল—আমাদের প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ কর। মনে নেই?

বাইরে একটা মিছিল যাচ্ছিল। ১৯২২ সাল সেটা।

চীনের আক্রমণ নিয়ে সোর উঠেছে তর্ক উঠেছে।

সেই সব শ্লোগান উঠছিল।

রাস্তার ওপাশের একটা নতুন রঙ ফেরানো বাড়ির দেওয়ালে শ্লোগানগুলোর কতকগুলো লেখা ছিল। সীতা এবং অংশুমান সেই লেখাগুলোর দিকে তাকিয়ে বসেছিল। পরস্পরের দিকে যেন তাকাতেও ঠিক পারছিল না।

যতক্ষণ ধরে মিছিলটা না-পার হয়ে গেল ততক্ষণ দুজনে কথা বলতে পারে নি। ওরা চলে গেলে অংশুমান ডেকেছিল—সীতা!

সীতা সাড়া দিয়েছিল—বল।

—আমি কি বলব—তুমি বলবে। আমি যা বলবার বলেছি।

সীতা বলেছিল—না বল নি। বন্ধুত্বের লক্ষণের গণ্ডী থেকে তুমি যখন বেরিয়ে কাছে আসতে বলছ তখন কোন নতুন প্রতিশ্রুতি দিচ্ছ বল। আমি নারী তুমি পুরুষ, আমার অতি নিকটতম কাছে তুমি আসতে পার। কিন্তু রাবণের মত নয়।

মুহূর্তে অংশুমানের মনে হয়েছিল—সীতা কৌতুকোচ্ছলা হয়ে উঠেছে। এবং উত্তরও দিয়েছিল সেই ঢঙে। বলেছিল—বল তা হ'লে কোন হরধনু ভাঙতে হবে।

সীতা বলেছিল—না অংশুমান, আমি কৌতুক বা পরিহাস করিনি। রাবণের কথাটা বলেছি—তার কারণ রাবণ হওয়া সোজা। কিন্তু বাল্মীকির রাম সীতা হওয়া অত্যন্ত কঠিন। সে দুঃখ আমার সইবে না। তোমাকে জানি তুমি রামের নামে ঠাট্টা করে অট্টহেসে উঠবে। আমি লাঙলের ফালে ওঠা বসুন্ধরার মেয়ে নই। সাধারণ একটি মেয়ে, আমি আমার জীবনে যাকে অংশীদার করব সে আমার বর হবে আমি তার বধূ হব। তুমি আমাকে স্বামী হবার প্রতিশ্রুতি দেবে আমি তোমাকে স্ত্রী হবার প্রতিশ্রুতি দেব। বল কোন্ মন্ত্রে আমাকে গ্রহণ করবে বল?

—মানে বলছ—কি মত? তোমরা ক্রিশ্চান আমরা হিন্দু, যদিও তা নই আমি। তবুও কোন্ মতে হবে জিজ্ঞাসা করছ?

—হ্যাঁ।

গম্ভীর হয়ে উঠেছিল সে। বলেছিল—তার প্রয়োজন কি?

—প্রয়োজন নেই? চমকে উঠেছিল সীতা।

—কি প্রয়োজন ?

অনেকক্ষণ তার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে সীতা বলেছিল, অত্যন্ত ধীর ভাবে এবং মৃদুস্বরে বলেছিল—আমাকে ঘরণী করে আনবে—আমি ঘর চাইব—

—কেন এই বাড়িখানাই আমার বাড়ি—

—সে বাড়ি কাল কাউকে বিক্রী করলে অন্যের হবে। আমি যে ঘর চাইছি সে ঘর বাসাতেও পাতা হয়, গাছতলাতেও হয়, পাহাড়ের গুহার মধ্যেও হয়। আমার সংসার চাই—আমি সংসার পাতব।

—সীতা!

—বল!

—বিবাহ মানে মিথ্যা ঈশ্বরের শপথ করে মন্ত্র পড়ে বিয়ে কি রেজেস্ট্রী করে বিয়ে কোনটাকেই আমরা মানি নি এতদিন। তুমিও না—আমিও না। আজ তুমি তা চাও কেন? কিসের ভয় তোমার—

একটু ভেবে নিয়ে সীতা বলেছিল—ভয় নয় অংশু। আমি তোমার সংস্পর্শে এসে অনেক বদলে গেছি। দেখ পুরুষ আর নারী যখন সামনা-সামনি দাঁড়ায় তখন চোখে, সারা দেহে, নিঃশ্বাসের উত্তাপে পরস্পরের জন্যে পরস্পরে চঞ্চল হয় প্রকৃতির নিয়মে। মানুষের প্রকৃতির নির্দেশ বেরিয়ে আসে মন থেকে। সে মন বলে, ওকে আমি চিরকালের জন্য চাই। চিরকালের জন্যই ওর একান্ত নিজস্ব হতে চাই। আর কাউকে চাইনে—মনে চাইনে, দেহে চাইনে—এমন কি কথার কথাতে চাইনে। ভালবাসা—

বার বার ঘাড় নেড়ে অংশুমান বলে উঠল—না সীতা। না। এ ভ্রান্তি—সাময়িক মোহ—এ সেই মিথ্যের পুনরুক্তি।

—তা হলে আমি উঠলাম অংশুমান।

চমকে উঠেছিল অংশুমান, বলেছিল—চললে কি? সীতা!

—হ্যাঁ আমি চললাম। তুমিও ভেবে দেখো। আমিও ভেবে দেখব। যদিও আমার মনকে আমি জানি, ভেবে দেখবার কিছুই নাই—তবু বলছি ভেবে দেখব। তোমার দিকে 'আমি' আর তাকাতে পারছি না অংশুমান। আমি—।

চলে গিছল সীতা। বোধ করি 'আমি' বলে যে কথা বলতে চেয়েছিল তার ওই শুরু আমি শব্দেই সীতা কেঁদে ফেলেছিল। অংশুমান আর তাকে ফেরাতে চেষ্টা করে নি। সে ভাবতে বসেছিল।

না। না। না।

কিছুতেই সে ওই পুরানো প্রতিশ্রুতির মিথ্যার বোঝাকে সত্য বলে মাথায় ঠেকাতে পারবে না। বিবাহের চেয়ে বড়, শেষের কবিতার ভালবাসা, এ সবের উপরেও তার আর মোহ নেই। এ কল্পনাও মিথ্যার চেয়েও মিথ্যা। অসার। বস্তুজগতে বাস্তবতাবাদী মানুষ সে। তার কাছে বিংশশতাব্দীর এই সপ্তম দশকে ইতিহাসের চরম যাচাইয়ে সব মিথ্যা, সব মিথ্যা, সব মিথ্যা। যা সে বিশ্বাস করে না।

হায় সীতা! তোমার পরিণতি শেষে এই হ'ল? কয়েক মিনিট চুপ করে ব'সে থেকে সে উঠে গিয়েছিল ঘরের ভিতর। ডায়রীটা এবং কলমটা এনে লিখতে বসেছিল।

কথাগুলি লিখে সে রাখতে চায়।

লিখেও রেখেছে। কাটা কাটা ছাড়া ছাড়া কথা। এই লেখা যে পরে সে কতবার পড়েছে তার ঠিক নেই।

আরও একটা প্রসেসন এসেছিল সেই সময়। ময়দান চলেছে সব। বড় সভা আছে। সীতা চলে যাবার এবং লিখবার জন্য কলম ধরার পাঁচ সাত মিনিট পর্যন্ত সেটা চলেছিল।

ইনকিলাব জিন্দাবাদ তো প্রথম কথা বটেই। এ ছাড়াও মনে পড়ছে কোন কিছুর বিচার চাই শ্লোগানও ছিল। সম্ভবতঃ কংগ্রেসী নেতাদের বা মন্ত্রীদের। বে-আইনী আইন চলবে না চলবে না চলবে নাও ছিল।

ডায়রীতে সে সেদিন—নাটকের দৃশ্যে লাগাবার মত করে নিয়ে লিখেছিল—। এবং তার নতুন নাটকের মধ্যে সে তা লাগিয়েছে। মানুষ এ কথাগুলোকে মন দিয়ে শুনেছে; হাত-তালি দিয়েছে, ভাবিয়েছে।

কত শত সহস্র বৎসর ধরে মানুষ একটি প্রতিশ্রুতিতে নিজেকে আবদ্ধ করতে চাইছে—সঙ্গে সঙ্গে পরকেও দিচ্ছে একটি প্রতিশ্রুতি। কিন্তু প্রতিশ্রুতি সে রাখতে পারে নি। নিজেই নিজেকে ঠকিয়েছে। নিজের কাছে দেওয়া নিজের শপথ ভেঙেছে। পরকে দেওয়া শপথ ভেঙেছে। ন্যায়ের প্রতিশ্রুতি—নীতির প্রতিশ্রুতি—সত্যের প্রতিশ্রুতি। কিন্তু সব ব্যর্থ হয়ে গেল। মিথ্যা হয়ে গেল। প্রমাণই হ'ল না কোনটা ন্যায়, কোনটা নীতি, কোনটা সত্য।

দুর্যোধনেরও একটা সত্য ছিল।

যুধিষ্ঠিরেরও ছিল।

ব্যাসদেব স্বর্গলোকে দুর্যোধনকে ইন্দ্রের সঙ্গে সমাসনে বসিয়ে তাকে তার প্রাপ্য দিয়েছেন। অবহেলা করতে পারেন নি। আবার যুধিষ্ঠিরকে স্বর্গলোকে প্রথম নরক দেখিয়ে তবে নিষ্কৃতি দিয়েছেন। তা দিন। কিন্তু যুধিষ্ঠির ধর্মরাজ্য স্থাপনের প্রতিশ্রুতিতে ব্যর্থ হয়ে মাথা নিচু করে স্বর্গের পথে হেঁটেছেন।

মনে পড়েছে বলহীন অর্জুনের হাত থেকে যদু কুলবধূদের জোর করে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে ব্যাধেরা শবরেরা। এবং বধূগুলির একাংশ উচ্চহাস্য করতে করতে শবরদের আলিঙ্গন ক'রে তাদের সঙ্গিনী হয়েছে। যাবার সময় মৃত ভর্তাদের উদ্দেশে তারা যে থুথু ছুঁড়েছিল তা তাদের নিজের গায়ে পড়ে থাকলে তাই মেখে তারা প্রসাধন করেছে। হায় ধর্মরাজ্য! কাটা ঘুড়ির মত ভাসতে ভাসতে চলে গেল কোন্ নিরুদ্দেশে। হায় প্রতিশ্রুতি। প্রতিশ্রুতির মধ্যেই মানুষের সভ্যতার জন্ম। মানুষ মানুষ হ'ল। জন্তু থেকে মানুষ হ'ল। ধর্ম ধরে দাঁড়াল। ধর্ম প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল—ধর্ম ঈশ্বরকে জানে—সে ঈশ্বরের প্রসাদ দেবে, তাঁর বাণী দেবে, তাঁকে এনে দেবে মানুষের কাছে, মানুষ সব পাবে। এ প্রতিশ্রুতি মিথ্যা হয়ে গেছে। ধর্মের সব শপথ মিথ্যা—সব প্রতিশ্রুতি ব্যর্থ।

তারপর রাষ্ট্র দিয়েছিল প্রতিশ্রুতি। সমাজ দিয়েছিল প্রতিশ্রুতি। অন্ন বস্ত্র শান্তি সুখ।

তাছাড়া আরও অনেক কিছু, তার স্বাধীনতা, তার সঙ্গে আরও কিছু। ওই ঈশ্বরের মত কিছু।

তাও সব ব্যর্থ হয়ে গেছে।

বোধ হয় বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এতদিনের সমস্ত ব্যর্থতা একসঙ্গে চীৎকার করে উঠেছে—

ইনকিলাব—জিন্দাবাদ।

ওই যে যারা চীৎকার করছে ইয়ে আজাদী ঝুটা হ্যায়—তাদের শ্লোগান ওই সঙ্গে বলছে—বিলকুল সব ঝুট হ্যায়।

এমন ভাবে পৃথিবীর সকল প্রতিশ্রুতি, সকল তপস্যা মিথ্যা হয়ে যাওয়ার হতাশায় ক্ষোভে মানুষ আর কখনও এমন ক্ষুব্ধ হাহাকার ক'রে ওঠে নি। সব ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছে আবর্জনার মত। ভাঙা ফুটো উচ্ছিষ্ট দ্রব্যের মত।

সীতার বদলে এই মুহূর্তে তার অর্ধসমাপ্ত জীবন নাটকের নায়িকা হবার জন্য নাটকীয় মুহূর্ত সৃষ্টি ক'রে নমিতা মুখ বাড়ালে।—হ্যালো হ্যালো অংশুমান।

—কে?

—আমি কোন একজন নমিতা। চিনতে পার।

নমিতা তার বউদির বোন, যে তাকে উপেক্ষা ক'রে অল ইণ্ডিয়া সার্ভিসের একজন পাণ্ডীঘরের নবীন ভদ্রাসন্তান চাকুরেকে বিয়ে ক'রে তার চোখের এলাকা থেকে দূরে চলে গিছল। যাকে সে লক্ষ্মীর বাহন পেঁচা বলে এ সেই।

একেবারে নাটক সৃষ্টি ক'রে ঢুকল নমিতা। টেলিফোন বেজে উঠল।

ওই দিনই, যে দিন সে, সীতা চলে যাবার পর এবং প্রসেসনটা চলে যাবার পর ওই হঠাৎ ওঠা চিন্তার টুকরোগুলোকে ডায়রীতে লিখে রাখছিল—তখনই লেখার মধ্যে বাধার সৃষ্টি ক'রে টেলিফোনের রিঙ বেজেছিল।

দমদম এরোড্রোম থেকে টেলিফোন করছিল নমিতা।

—অংশুবাবু, আমি নমি। চিনতে পারছো আমাকে?

প্রথমটায় এক কথায় চেনা যায় নি। নমিতা নামটা তার জীবনের পথে কয়েকটা মাইল পোষ্টের গায়ে গায়ে খোদাই হয়ে আছে, তবু এক কথায় চিনতে পারে নি অংশু। অংশু ভাবছিল সীতার কথা। নমিতার কণ্ঠস্বর তাকে চমকে দিলে। সে আর দুটো লাইন লিখে ডায়রী বন্ধ করে উঠল।

সে লিখলে—"দেহের যে দেহের কাছে একটা প্রতিশ্রুতি আছে সীতা!

সে প্রতিশ্রুতি রক্তের স্রোতে স্রোতে কল্লোলিত। চোখের পাতায় দৃষ্টিতে বিদ্যুতের মত অহরহ প্রবাহিত। মুহূর্তে চমকে ওঠে।

দেহে বাস ক'রে দেহাতীত হ'তে চেয়ো না। তার নাম মৃত্যু।

মনের দোহাই দিয়ে নরনারীর প্রথম অধিকারকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে তাকে চুলে আঠার

পাকিয়ে জটা করে তুলো না।"

এই পর্যন্ত তার ডায়রীতে লেখা আছে। তার পর আর নেই।

নমিতা এসে গেল।

নমিতা টেলিফোনের ওদিক থেকে মনে করিয়ে দিল—নমিতা তোমার বউদির বোন। তোমার এককালের কাব্যের নায়িকা। আমার জন্যে বিবাগী হয়ে তুমি বিয়ে করলে না। আমি কি করব বল? ওরা ধরে বেঁধে ফরেন সার্ভিসের অফিসারের কোটের সঙ্গে আমার শাড়ীর আঁচলখানা সেফটিপিন দিয়ে জুড়ে দিলে। প্রথম নেশা লাগল। সেই নেশায় উড়ে চলে গেলাম। অনেক দেশ ঘোরা হয়ে গেছে। মধ্যে মধ্যে দেশে ফিরেছি কিন্তু দেখা করি নি।

হঠাৎ চাপা হাসি যেন মিহি কণ্ঠস্বরের রেশমী চাদরের হিল্লোল বেয়ে এক ঝলক বাতাসের মত এসে তার কানে পৌঁছেছিল।

এ বাতাস সেই বাতাসের ঝলক—যাতে অলস ভ্রমরের কাছে নিয়ে আসে ফুলের গন্ধ। অংশুমানের চিত্ত চেতনা যেন চমকে জেগে উঠেছিল। সে সাগ্রহ উল্লাসে বলে উঠেছিল—নমি। আমি আর তুমি, অংশু আর নমির নমি।

—হ্যাঁ—ভুবন ভ্রমিয়া শেষে ফিরেছি তোমার দেশে। এবং পতিদেবতার সঙ্গে ঝগড়া করে ফিরেছি। তাই তো কাস্টমসএর বেড়া না-পার হ'তে হ'তেই তোমাকে খবর দিচ্ছি। তুমি এস। আমাকে সাহায্য কর। একেবারে কোন হোটেলে। বুঝেছ। পুরো স্বাধীন আমি। না। বাড়ির তাঁবেদারী এবং শুভাশুভের খবরদারীর মধ্যে আর না। এনাফ অফ ইট। যথেষ্ট হয়েছে অংশু। ওই সব অর্থহীন ঈশ্বর ধর্ম সততা সতীত্ব ন্যায় নীতি ও সব দিয়ে আর চোখে কাপড় বেঁধে কানামাছি খেলতে রাজী নই আমি। হ্যাঁ তুমি এস।

আশ্চর্য রূপসী এবং উচ্ছল যৌবনা হয়েছে নমিতা। সর্বাঙ্গে বিশ্ব-সভ্যতার সেই শাখার ফোটা ফুলের গন্ধ বর্ণ মোহ, যে শাখায় ফুল ফোটাতে প্রয়োজন হয় প্রচুর বিলাসের, অগাধ ঐশ্বর্যের।

কাস্টমসের বেড়ার গায়ে দাঁড়িয়ে সে পথের দিকেই তাকিয়ে ছিল। অংশুমানের মনে পড়েছিল উর্বশী কবিতার কটি ছত্র।

নহ বধূ নহ কন্যা সুন্দরী রূপসী। মনে পড়েছিল—তব স্তনহার হতে—। বুকের মধ্যে তার রক্তধারা নাচা নূতন নয়। কিন্তু এমন ক'রে কখনও সে বিহ্বল হয় নি।

নমিতা তাকে বলেছিল—কেমন দেখছ? খুব সুন্দর হই নি?

—হয়েছ।

—সে তো জানি। কিন্তু কেমন তুমি বলবে তো!

—বলব, অপূর্ব।

—যদি বলি তোমারই জন্যে।

—বলব মিথ্যে কথা।

—কেন ?

—তা জানিনে। তবে নিজের কথা জানি সেইটে বলি। বলি—দেহ দেহকে টানে এটা বাস্তব সত্য। কিন্তু মন মনকে টানে এটা মিথ্যে কথা। এই মুহূর্তে তোমার সামনে দাঁড়িয়ে বলতেও সঙ্কোচ হচ্ছে না।

নমিতা অত্যন্ত সহজ হাসিতে যেন অকপট ভাবে স্বীকার করে বলেছিল—যা বলেছ। ওর মত মিথ্যে আর হয় না। এ যুগে যখন সমাজের ভয়, পাতিত্যের ভয়, শাস্ত্রের শাসনভয় ঘুচে গেছে তখন স্বীকার নিশ্চয় করতে হবে এ যুগে কেউ একজনের একা নয়। এবং তোমারও নই তা বলব না।

একটা নামজাদা হোটেলে সে তাকে তুলে দিয়ে এসেছিল। এবং সে দিন সে প্রমত্তের মত ছুটেছিল অতসীর খোঁজে।

গিয়েছিল সে অতসীর খোঁজে কিন্তু সীতাকেই তার সারাক্ষণ মনে পড়েছিল ট্যাক্সির মধ্যে। এ যুগের সকল ক্ষোভ সকল অবিশ্বাসের রূঢ়তাকে বুকের মধ্যে নিয়ে সীতার ছবিকে মনের মধ্যে থেকে দূর করে দিতেই সীতাকে তাড়াবার জন্যেই সে অতসীকে মনে করেছিল। নমিতাকে মনে করতে তার ভাল লাগে নি। নমিতার দেহ নিয়ে কোন আকর্ষণ তার ছিল না, তা সত্য নয়, আকর্ষণ ছিল কিন্তু কোনও একটা বিচিত্র বোধ তাকে যেন বাধা দিয়েছিল।

মন তার উৎসাহিত না হয়ে পিছিয়ে এসেছিল।

সন্ধ্যায় নমিতার হোটেলেই মদ্য পান ক'রে ছুটে গিয়েছিল অতসীর সন্ধানে। নমিতা তাকে আকর্ষণ ঠিক করে নি। অতসীর কাছে তার কোন সঙ্কোচ নেই। না—নেই।

কোন অপরিণত কৈশোরে দেহের আকর্ষণে সে এবং অতসী পরস্পরে মিলিত হয়েছিল। তার মধ্যে মন থাক বা না-থাক প্রকৃতির একটা অনিবার্য আকর্ষণ নিতান্ত ভ্রূণের মতই ছিল। জান্তব হয়তো, কিন্তু তার বেশী কিছু নয়, হয়তো নির্লজ্জ, কিন্তু কদর্য নয়। নমিতা দেহের আকর্ষণের মধ্যে বিলাসের নানান উপকরণে সাজিয়ে লালসাকে উদ্রিক্ত করে কেমন যেন অপরিচ্ছন্ন করে ফেলেছে। অপবিত্র বলবে না। না। অতসী অপবিত্র। অতসীকে কিন্তু পায় নি। সে বয়ে গেছে আর ফেরে নি।

* * *

নমিতা মূর্তিমতী আধুনিকা ; ধনতান্ত্রিক দেশের আধুনিক যুগই যেন সে। অংশুমানকে নূতন করে কামনার শিখায় উজ্জ্বল এবং উত্তপ্ত করে জ্বালিয়ে দিয়ে আবার মাস দেড় দুই পরে চলে গেল। ঝড়ের মতই এসেছিল, ঝড়ের মতই চলে গেল। যাবার সময় বলে গেল—'ইউরোপে এস অ্যামেরিকায় এস। কি হবে তোমার বাংলায় বই লিখে ? এখানে জীবন কোথা। আমাকে দেখ! এ দেশে তুমি আমাকে স্পর্শ করতেই পারলে না। আমার তাতে ক্ষোভও নেই দুঃখও নেই। দেখ।'

নমিতা এ দেশের সংজ্ঞায় অসুখী। তার স্বামী তাতে তৃপ্ত নয়—তাতে আবদ্ধ নয়, সেও নয়। নমিতার এতে কিছু আসে যায় না।

নমিতাকে প্লেনে তুলে দিয়ে ফিরে এসে সে নাটক লিখবে ভেবেছিল। আবার সে ফেঁদে

বসেছিল সেই পুরনো অসমাপ্ত নাটকের বিষয়বস্তু নিয়ে নাটক। মহাভারতের সত্যবতীকে নিয়ে নাটক। এবার নাম দিয়েছিল—'স্বর্ণমৃগী'।

প্রথম অঙ্ক—পরাশর ও সত্যবতী।

প্রায় দু'মাস পরে এল সীতা। সীতা দু'মাস পরে আসে নি। সীতা এসেছে ফিরে গেছে। অংশুমানের সঙ্গে দেখা হয় নি। অংশুমান নমিতার সঙ্গে ফিরেছে। কোন দিন বাড়ি ফিরেছে কোন দিন ফেরে নি।

সীতাকে দেখে অংশু যেন কেমন হয়ে গিয়েছিল। হয়তো বিবর্ণ। কিন্তু সীতা তাকে কিছু বলে নি।

বলেছিল—এত কি কাজ ছিল তোমার নমিতার সঙ্গে?

চমকে উঠেছিল সে।—নমিতার সঙ্গে?

সীতা বলেছিল—আমি জানি।

অংশু বলেছিল—ভাবছিলাম অ্যামেরিকা যাব।

—ও।

একটু পরে সীতা আবার বলেছিল—কি হল বল তো?

—কি হবে?

—এমনি করে বদলালে?

—বদলেছি? না। একটু পর বলেছিল—নতুন নাটক লিখছি। ভাবছি নিজেও নামব।

—আবার নাটক? নিজেও নামবে?

—নইলে?—

সীতা অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থেকে চলে গিয়েছিল।

আরও বদলাল অংশু। সে চলে যেত—বাড়িতে থাকত না। সীতা এসে বসে থেকে বাড়ি ফিরে যেত। খাবার তৈরি করে রেখে যেত।

যেদিন দেখা হত সেদিন জিজ্ঞাসা করলে বলত—কাজ ছিল। পাবলিশারদের সঙ্গে হিসেব চলছে। ঝগড়া হয়েছে। বই তুলে অন্য জায়গায় দেব। তার জন্যে যেতে হচ্ছে। কিংবা বলত—মিটিং ছিল।

একদিন বললে—একটা অভিনয় হবে। তাতে হিরোর পার্টের জন্যে ধরেছে। তাই গিয়েছিলাম।

একটু চুপ করে থেকে সীতা বলেছিল—অভিনয় করবে?

—শক্ত পার্ট—

সেইদিন যাবার সময় সীতা বলেছিল—কাল আমি আসব না।

অংশু বলেছিল—ঠিক আছে। আমারও কাজ আছে।

—সেও আমি জানি।

—জান? আমি তো তোমাকে বলি নি।

—বল না তো কোন দিনই। আমি এসে ফিরে যাই।

চুপ করে থেকেছিল অংশুমান, জবাব দিতে পারে নি। জবাব খুঁজে পায় নি।

সীতা বলেছিল—আরও একটা কথা বলি।

না থেমেই সে বলেছিল—আর আসব না।

—আসবে না? মানে?

—ভাল লাগছে না।

—সীতা!

—তোমারও ভাল লাগছে না অংশু। তুমি বলতে পারছ না। খেলাঘর ভেঙে চলে যাবার সময় হয়েছে—

অংশুমান উঠে দাঁড়িয়ে পায়চারি করেছিল। সীতাও উঠেছিল। কিন্তু অংশুমান বলেছিল—যেয়ো না।

—বল কি বলবে? রাত্রি অনেকটা হয়েছে।

—আজ যেয়ো না।

—অংশু!

অংশুমান তার হাত চেপে ধরে বলেছিল—না।

সীতা বলেছিল—অংশু!

—না! না! না!

সে পুরুষ!

বিংশ শতাব্দীর একষট্টি সালে তার বয়স তিরিশ বৎসর। সে বলেছিল—না যেতে পাবে না আজ!

* * *

স্মরণ করতে করতে অস্বস্তি বোধ করলে অংশু। জীবনে তার এই একটি অশান্তি অস্বস্তি। সকালে উঠে সীতা সেই চলে গেল। আর এল না। সেদিন সে উঠবার আগেই সীতা উঠে বেরিয়ে চলে গিয়েছিল। যাবার সময় শুধু বলেছিল—এ কি হল বল তো?

অংশুমান উত্তর খুঁজে পায় নি।

সেদিন সকালে উঠে অংশু অশান্তি ভোগ করেছিল—দারুণ অশান্তি আর অনুশোচনা হয়েছিল—সে করলে কি? এ কি করলে সে! আশঙ্কা করেছিল—সীতা আসবে। এসে—। এর পর সে ভাবতে পারত না। সে একটা শব্দ করে উঠত। বিরক্তিসূচক শব্দ। কখনও—আঃ! কখনও—ছি ছি! কখনও মুখে কোন শব্দ করত না—অস্থির হয়ে উঠত।

কিন্তু সীতা আর আসে নি। চার বছর হয়ে গেল। রঞ্জনকে দিয়ে খোঁজ করে জেনেছে সীতা এখান থেকে চলে গেছে। সীতার মা মারা গেছেন। সীতাকে তিনি তাঁর বাড়ির অংশ দিয়ে গেছেন। সেই বাড়ির অংশ বিক্রি করে সে চলে গেছে। কোথায় গেছে ভাইরা

বলতে পারে না। জানে না তারা।

তাদের দুরন্ত ক্রোধ সীতার উপর ; কারণ মায়ের দেওয়া বাড়ির অংশ সে তাদের না দিয়ে চড়া দামে অন্য একজনকে দিয়ে গেছে। উত্তর কলকাতার বাড়ি, বেশ কয়েক হাজার টাকাই সে পেয়েছে।

সংবাদে বিস্মিত হয় নি অংশুমান। সীতা জীবনের হিসেবে পাকা। তা না হলে তার সঙ্গে ঘর বাঁধবার দাবি নিয়ে এসে ঘর বেঁধে বাকী জীবনটা অশান্তির আগুনে নিজেও জ্বলতো, তাকেও জ্বালাতো। তা সে করে নি।

অংশুমান সীতাকে মন থেকে মুছে ফেলে আবার তার জীবনের পরিত্যক্ত পথে ফিরে এল এবং দ্রুততর পদক্ষেপে যাত্রা শুরু করলে।

ছুটে চলেছিল সে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের কয়েকটা বছরের সঙ্গে।

সীতা কোথায় হারিয়ে গিয়েছিল। ধীরে ধীরে অংশুমান ভুলতে চেষ্টা করেছিল। অন্যায়ের কোন অনুশোচনা তার মনের মধ্যে এতটুকু অস্বস্তি রেখে যায় নি। যুগের সঙ্গে চলমান মানুষ সে। উরি গাগারিনের সঙ্গে সে শূন্যলোক পৃথিবী পরিক্রমা করে এসেছে। হাংগেরীর সময় সোবিয়েতের প্রতিবাদ করেছে। তাইওয়ানে অ্যামেরিকার প্রতিবাদ করেছে—ভিয়েৎনামে অ্যামেরিকার প্রতিবাদ করেছে। কেনেডীর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছে। জওহরলালের মৃত্যুতেও কেঁদেছে। বিধান রায়ের মৃত্যুতেও বিষণ্ণ হয়েছে। কালের প্রবল স্রোতের টানে ভেসে চলেছিল তীব্রতম বেগে।

হঠাৎ কাল—। ১৯২২ সালের ১০ই জানুয়ারী।

কাল সে গিয়েছিল ইউ-এস-আই-এস্-এ।

নিজের নাটিকাগুলিকে নিয়ে একটি নাটিকা-সপ্তাহ করবে ঠিক করেছে। তাতে সে শুধু নাট্যকার এবং অভিনেতাই হবে না, নিজেই পরিচালনা এবং প্রযোজনা করে পরিচালক-প্রযোজকও হবে। সেই প্রোডাকশন সম্পর্কে বই সে ঘাঁটছিল—অ্যামেরিকান প্রোডাকশনের বই। এজন্যে শুধু সে ইউ-এস-আই-এস্-এই যায় না, রাশিয়ান এম্বাসী এবং সোবিয়েত দেশের আপিসেও যায়। সেই জন্য কাল ইউ-এস-আই-এস্-এ গিয়ে হঠাৎ চৌরিঙ্গীর পথে সমবেত কণ্ঠের জিন্দাবাদ মুর্দাবাদ আওয়াজ শুনে বেরিয়ে এসে দেখেছিল ছাত্রদের লম্বা শোভাযাত্রা চলেছে। তরুণ-তরুণী থেকে ছোট ছোট বাচ্চা পর্যন্ত। ফেস্টুন প্লাকার্ড নিয়ে আওয়াজ দিতে দিতে চলেছে—

—ভিয়েৎনাম থেকে—

—হাত হঠাও!

—অ্যামেরিকান সাম্রাজ্যবাদ—

—মুর্দাবাদ!

—ভিয়েৎকং মুক্তিসেনা—

—জিন্দাবাদ!

—লং লিভ—

—রেভেলুশন!

তাদের পাশে পাশে পুলিস চলেছে। পুলিসের জীপও আছে। ইউ-এস-আই-এস'এর পাশটা—পুলিস কিছু দূরে দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছে। একবার এমনি একটা অ্যামেরিকাবিরোধী মিছিল ইঁট মেরে ভাঙা মেরে ইউ-এস-আই-এস'এর কাচগুলো ভেঙে দিয়েছিল—তাই এখানে এ সতর্কতা নিয়েছে পুলিস। সেদিন সে চটেছিল এই মিছিলওলাদের উপর। মারাত্মক ভাবে চটেছিল। কিন্তু আজ তার রাগ হল না। মনে মনে খবরের কাগজের হেডলাইনগুলো ভেসে উঠল। ঠিক ঠিক ভাষা তার মনে নেই, কিন্তু অ্যামেরিকা জেট বম্বার নিয়ে গিয়েছে ভিয়েৎনামে, এবং ঝাঁকে ঝাঁকে বম্বারগুলো উত্তর ভিয়েৎনামে কম্যুনিস্ট অঞ্চলে গিয়ে বম্বিং করে আসছে। একটা মেয়ের ছবি বেরিয়েছিল। সে মেয়েটির মুখভঙ্গি দেখে বোঝা যায় সে বুকফাটা কান্না কাঁদছে। তার সব গেছে। স্বামী পুত্র সংসার—সব—সব। কেন? তোমাদের গোটা প্রশান্ত মহাসাগর পার হয়ে দক্ষিণ ভিয়েৎনামের প্রেমে পাগল হয়ে এখানে লড়তে আসার কি প্রয়োজন? তাদের দেশের ভাগ্য তারাই নিয়ন্ত্রণ করুক। তোমাদের কি?

ওদিকে চীন। চীন অ্যাটম বোমা ফাটিয়েছে। তার অহংকার তারা এশিয়ার ভাগ্য-নিয়ন্তা হয়েছে। ভারতবর্ষের উত্তরে থাবা গেড়ে বসে আছে। ভাবতে ভাবতে মাথা খারাপ হয়ে যায়। দম বন্ধ হয়ে আসে।

ওদিকে আয়ুব খাঁ বিষ উদগার করছে—ফোঁট ফোঁটা নয় গলগল করে বিষ ঢালছে। কচ্ছের রাণে ছোবল মেরে সাপের মত কামড়ে ধরে আছে অনেকটা অংশ।

এই এলোমেলো ভাবনার মধ্যে সে যে কখন রাস্তায় নেমে পড়ে ওই মিছিলের সঙ্গে চলতে আরম্ভ করেছিল তা সে নিজেও জানে না। তবে অ্যামেরিকান কনসুলেটের সামনে এসে থমকে দাঁড়িয়েছিল।

একশো গজ দূরে পুলিসের ব্যারিকেড প্রসেসন রুখে দিয়েছে। একজন ছাত্রনেতা উঠে দাঁড়িয়েছে একটা কিছুর উপর। হাতে মুঠি বেঁধে চীৎকার করে বক্তৃতা শুরু করলে—বন্ধুগণ!—

কয়েক ছত্র শুনেই আর তার ভাল লাগল না। অত্যন্ত অভদ্র অত্যন্ত ক্রুদ্ধ বাক্যের সমষ্টি তাকে পীড়িত করলে।

সে সেখান থেকে সরে এল। একলা হাঁটতে হাঁটতে চলে এল সে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের ধারে। রৌদ্রালোকিত মাঠে ঘাসের ডাঁটি ছিঁড়ে নিয়ে ছেলেমানুষের মত দাঁতে কাটতে লাগল।

বিকেল হয়ে আসছে। বড় বড় গাড়ি এসে দাঁড়াচ্ছে মাঠের ধারে। গাড়ি থেকে নামছে সুন্দরী সুবেশা মেয়েরা, তার সঙ্গে কাচ্চাবাচ্চা এবং পুরুষেরা। এদের অধিকাংশই ভিন্ন প্রদেশবাসী। লক্ষপতি কোটিপতির দল। ব্ল্যাকমার্কেটিয়ার এদের শতকরা নিরানব্বই জনেরও বেশী। অন্য লোকে হয়তো বলবে একশো জনের মধ্যে একশোজনই। সে তা

বলবে না। একজন—অন্ততঃ একজন ভাল লোক আছে। নিশ্চয় আছে। নইলে দুনিয়া আছে কি করে? ওগান থেকে সরে এসে সে প্ল্যানেটোরিয়ামের পাশের বাগানটার ছায়ায় বসল।

সমস্ত দিনটাই মিছে গেল—বাজে বাজে এতদূর ঘুরল সে এই ছেলের দলের সঙ্গে!

হঠাৎ মনে হল সারা জীবনটাই সে এমনি করে মিছিমিছি ঘুরেছে। মিছিমিছি বই কি!

ভাবতে ভাবতে সে আকাশের দিকে তাকালে। কে জানে—চল্লিশ-পঞ্চাশ হাজার কি তারও উপরে অ্যাটম বোমা পেটে নিয়ে জেট প্লেন ঘুরছে না! অ্যামেরিকায় কোথায় কোন্ কণ্ট্রোল পোস্টে কেউ একজন একটা বোতাম টিপলেই একটা মারাত্মক খোনা আওয়াজ—যে আওয়াজের প্রতিধ্বনিতে পৃথিবীর কেন্দ্রস্থল পর্যন্ত শিরশির করে—সেই আওয়াজ তুলে একটা অভিকায় অ্যাটম বোমা নেমে আসতে আসতে ফেটে গিয়ে চোখ-অন্ধ-করে-দেওয়া ছটার উত্তাপে এবং একটা প্রচণ্ডতম শব্দ তুলে সমস্ত কলকাতা শহরটাকে গালিয়ে ঝলসে ছাইয়ের স্তূপ করে দেবে না! একটু ভয়ও হয় না আজ অংশুমানের।

হঠাৎ থিয়েটার রোড আর চৌরিঙ্গীর ক্রসিংয়ে ট্রাফিক পুলিসের হুইসিলটা অস্বাভাবিক জোরে বেজে উঠল। সশব্দে মোটরের ব্রেক কষার শব্দ উঠল। অংশুমান তাকিয়ে দেখলে পুব থেকে পশ্চিমের রাস্তায় ট্রাফিক বন্ধ করে দাঁড়িয়েছে পুলিস।

এবার সামনে পেলে সে একখানা খালি ট্যাক্সি। সে ছুটে গিয়ে উঠে বসল।

* * *

ময়দানে মনুমেণ্টের তলায় মিটিং হচ্ছে। মনুমেণ্টের গা ঘেঁষে ফেস্টুন টাঙানো। ঝাণ্ডা উড়ছে। ইউনাইটেড ফ্রণ্টের মিটিং। এবার ইলেকশন। সমস্ত দল এবার কংগ্রেসকে হঠাতে বদ্ধপরিকর।

বাঁদিকে পুব পাশে মেট্রোর সামনে দর্শকের ভিড় জমেছে। ফার্স্ট শো ভাঙল—সন্ধ্যের শোয়ের দর্শকেরা ঢুকছে। গাড়ি গাড়ি গাড়ি। প্রাইভেট ট্যাক্সি, ডবল-ডেকার, লরী—তার সঙ্গে মানুষ মানুষ মানুষ। চলছে। চলছে। চলছে। ব্যবসাবাণিজ্য। ফেরিওলা—জুতো বুরুশ—পিকপকেট—নারীশিকারী পুরুষ—পুরুষসন্ধানী নারী। পুলিস স্পাই।

জীবনের স্রোত প্রচণ্ডবেগে বয়ে চলেছে। অসংখ্য ট্যাক্সিও তারই সঙ্গে চলেছে। মন্থর গতিতে। দ্রুত গতিতে। এর ওর পাশ কাটিয়ে। বুড়ো শিখ ড্রাইভার গাল দিচ্ছে পাশের ড্রাইভারকে। কখনও অন্য শিখ ড্রাইভারকে কিছু বললে হেঁকে। গীয়ার দিচ্ছে, ক্লাচ করছে, হর্ন মারছে। আশ্চর্য যান্ত্রিক হয়ে গেছে জীবন। অংশুমানের মন শূন্য।

গাড়িটা থেমে গেল। সামনে ধর্মতলা চৌরিঙ্গী বেন্টিঙ্ক স্ট্রীট সেণ্ট্রাল অ্যাভেন্যুর জংশন। মোড়ে লাল আলো জ্বলে উঠেছে। গাড়ির সারিগুলো থেমে গেছে। এখন পুব দিকে দক্ষিণমুখো গাড়ি ঢুকছে—চলছে দক্ষিণমুখে। পশ্চিম দিকে কার্জন পার্কে জনতা, পিঁপড়ের মত মানুষ। মানুষ। মানুষ। মানুষ। খাদ্য নাই। স্থান নাই। মানুষ। কোন কাগজে অংশুমান পড়েছিল আজ পৃথিবীতে সাড়ে তিনশো কোটি মানুষ—২০০০ খ্রীষ্টাব্দে মানুষ দ্বিগুণ হয়ে যাবে পৃথিবীতে। তার তিরিশ বছর পর ৭০০ কোটি হবে ১৪০০ কোটি।

কি করবে তখন মানুষ ?

মানুষ যা করবে তা করবে।

গাড়ির মধ্যে অংশুর জীবন অসহ্য মনে হচ্ছে। শীতের দিন তবু সে ঘামছে। পেট্রোলের গন্ধ। ধোঁয়া। দশটা বিশটা কি পঞ্চাশটা হর্নের একসঙ্গে শব্দ। ডবল-ডেকারের অসহনীয় অহংকারে অতিকায় দৈত্যের মত চাপা দেবার ভয় দেখিয়ে পাশ ঘেঁষে যাওয়া—এ অসহ্য মনে হচ্ছে। এরই ফাঁকে ফাঁকে ভিখিরীরা ঘুরছে। এদেশের লোকই নয় এরা। অন্য প্রদেশ থেকে এসে চৌরিঙ্গীর এলাকাটা দখল করে বসেছে। তবু তো ফিটনের দৌরাত্ম্য গেছে।

সিটি পড়ল। লাল আলো হলুদ হয়েছে। এইবার সবুজ হবে। এরই মধ্যে গাড়ির সারি নড়ে উঠেছে। এই চলছে। অংশুমানের ট্যাক্সির পাশ দিয়ে একখানা ডবল-ডেকার একেবারে তেড়েফুঁড়ে গর্জন করে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল। ক্রুড অয়েলের ধোঁয়ায় কালো হয়ে উঠল সামনেটা। প্রথমে আস্তে তারপর বিপুল গর্জন করে এগিয়ে চলল। ওপাশে একখানা লরী। ওরা রোলিং-স্টোন। ওদের পথ ছাড়।

পাঞ্জাবী শিখ ড্রাইভার তেতে উঠেছে। সে গলা বাড়িয়ে গাল দিলে ড্রাইভারকে। বাসের ড্রাইভার তার ইঞ্জিনের গর্জনের মধ্যে কিছু শুনতে পেলে না। সে গাল দিচ্ছে তার সামনের একখানা ট্যাক্সির ড্রাইভারকে।

এরই মধ্যে সামনে একখানা কালো রঙের প্রাইভেট। গাড়িগুলোর কতক চলেছে গভর্নমেণ্ট হাউসের দিকে। কতক চলেছে সামনে। কিছু ঘুরছে পূর্বমুখে ধর্মতলা স্ট্রীট বরাবর। ডবল-ডেকারখানা ঘুরছে ধর্মতলার দিকে। তার পিছনে আছে লরি একখানা।

আরে—আরে—আরে—।

বিচিত্র কৌশলে তাদের ডাইনে বাঁয়ে রেখে এগিয়ে চলল প্রাইভেটখানা।

পাঞ্জাবী শিখ ড্রাইভার বললে—মর যায়েগা শালা!

আশ্চর্য অশুভ বাক্য বের হল তার মুখে।

একটা প্রচণ্ড শব্দে অংশুমানের চিন্তাসূত্র ছিন্ন হয়ে গেল; সে চমকে উঠল।

নিশ্চয় সেই ডবল-ডেকারখানা! সামনে তাকিয়ে দেখে তার শরীর মন শিউরে উঠল; না ডবল-ডেকারখানা নয়, এটা একখানা হেভী ট্রাক, মেরেছে একখানা প্রাইভেটকে। পাশে মেরেছে। একটা দিক চড়চড় করে খানিকটা ছেড়ে গেছে, খানিকটা বসে গেছে।

সঙ্গে সঙ্গে সিটি বেজে উঠল তিন-চারটে। তিন-চারজন টি-পি থাকে এখানে, তারা সশব্দে বাঁশী বাজিয়ে ছুটে আসছে গাড়িখানার দিকে। একজন দুই হাত প্রসারিত করে সব দিকে ট্র্যাফিক বন্ধ করে দিয়ে দাঁড়িয়েছে। একটা অসহনীয় ব্রেক কষার আওয়াজ উঠল। এ আওয়াজে শরীর শিউরে ওঠে। জেট প্লেন নামবার সময় যে শব্দটা হয় অনেকটা তারই মত। শরীর ঠিক শিউরে ওঠে না, সমস্ত দেহের স্নায়ুশিরাগুলো যেন ওই শব্দে এঁকে-বেঁকে গুটিয়ে যেতে চায়। সাপ যেমন কুণ্ডলী পাকিয়ে এতটুকু হয়ে যায়, শামুক যেমন খোলার মধ্যে ঢুকে যায়, না তার থেকেও গুঁয়োপোকা যেমন এঁকে-বেঁকে ছটফট করে ওঠে তেমনি হয়ে

যায়। তার সঙ্গেই দেহের এ রিফ্লেক্স অ্যাকশনের মিল বেশী। মানুষ বড়াই করে চেতনার চৈতন্যের—সে যে এ সময় কোথায় থাকে তার ঠিক থাকে না। নির্গুণ ব্রহ্মের মত অবাঙমনসোগোচর হয়ে যায়।

আশপাশ থেকে হুড়মুড় করে লোক এসে ভিড়ছে। ভিড় করে ঘিরে দাঁড়াচ্ছে। ওদিকে সামনে একদল লোক, একজন টি-পি ছুটছে বেন্টিঙ্ক স্ট্রীট ধরে।

অংশুমানের ড্রাইভার বললে—উ লরী ড্রাইভার কুদকে ছুটা হ্যায়। উয়ো ছুট রহা হ্যায়—উয়ো।

হ্যাঁ ওই ছুটছে। লোকটা প্রাণভয়ে ছুটছে। ধরা পড়লে তার আর রক্ষা থাকবে না। ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটেছে। ওই একটা গলিতে মোড় নিয়েছে।

ট্যাক্সি ড্রাইভার বললে—লেকিন উসকা কসুর নেহি থা সাব। বিলকুল কসুর প্রাইবেট চালানেওলা বাবুকা। বাবু লরীকো ওভারটেক করনে কোশিস কিয়া। ই ভি টারন লিয়া উ ভি টারন লিয়া। লরী গিয়া পহেলে, প্রাইবেট পিছেমে টারন লেতে যানেসে লরীকে সাথ ধাক্কা লাগায়া। আজকালকা নয়া প্রাইবেট স্রিক টিনা হ্যায়। একদম। সে স্টীয়ারিং ছেড়ে দিয়ে ডান হাতের উপর বাঁ হাতে মুঠো বেঁধে মারলে ঘুঁষি। অর্থাৎ তুবড়ে গিয়েছে।

—জান নুকসান হুয়া? কোই মর গিয়া?

—ক্যা মালুম! ড্রাইব করনেওলা মর গিয়া হোগা। কেঁও কি ধাক্কা যো লাগা হ্যায় উ লাগা হ্যায় পিছেমে। মর গিয়া হোগা।

* * *

ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। অংশুমান নেমে পড়ে এগিয়ে গেল অ্যাকসিডেণ্ট-হওয়া গাড়িখানার কাছে।

এ কি? এ যে সীতা! গাড়ির ভিতর অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে বা মরে গেছে। আর একটি শিশু।

সে যেন পাথর হয়ে গেল।

এমন কখনও অনুভব করে নি অংশুমান। সে যেন কেমন হয়ে গেল! অতর্কিত আঘাতে মানুষ অজ্ঞান হয়ে যাবার পূর্ব মুহূর্তটিতে এবং চেতনা যেতে যেতে যাবার শেষ মুহূর্তটিতে যেমনটি হয় বোধ হয় তেমনি। আলো যেন নিভে গেল—অথবা বৃত্তাকারে সংকুচিত হয়ে এসে তাকে কেন্দ্র করে টেঁকে রইল; সব হারিয়ে গেল; সব থেমে গেল; সব নিস্তব্ধ হয়ে গেল; কোথাও কোন শব্দ নেই—নিঃশব্দ হয়ে গেছে সব; ঠিক তেমনি একটি অনুভূতিতে অংশুমান আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল।

পুরাণে মানুষের পাথর হয়ে যাওয়ার কথা আছে।

ঋষি গৌতমের শাপে তাঁর দ্বিচারিণী পত্নী অহল্যা পাষাণী হয়ে গিয়েছিল। অংশুমানের মনে হল সেও পাথর হয়ে যাচ্ছে।

অহল্যার প্রস্তরীভূত দেহের মধ্যে বন্দী আত্মার মতই তার আত্মা ও চেতনা যেন চীৎকার করে উঠতে চাইল কিন্তু পারলে না। গলা থেকে কোন স্বর বের হল না।

নিঃশেষে শব্দহীন হয়ে গেছে সংসার।

আলো যেন মুছে এসে এসে মাত্র আভাসে জেগে রয়েছে তার চোখের সামনে।

অংশুমান স্পষ্ট অনুভব করলে যে, পৃথিবী যে সূর্যের চারিদিকে একটি লম্বা ধরনের গোলালো কক্ষপথে অনিবার ও নিরন্তর ঘূর্ণমানতায় ও চলমানতায় ঘুরে বেড়ায় সেই ঘূর্ণমানতা থেমে গেল, সেই বেগবানতায় একটা ছেদ পড়ে গেল। সামনে পা ফেলবার মত মাটি আর সংসারে নেই। এবং সে পা সে ফেলবেই বা কি করে, তার আর পা নাড়বার শক্তিই নেই। যে-পৃথিবী তার পৃথিবী—যে-পৃথিবীতে সে জন্মেছে—তার জীবন যৌবনের রাজত্ব সংস্থাপন করেছে সে পৃথিবী হঠাৎ একটি জীবনস্পন্দনহীন জড়পদার্থের জমাট স্তূপে পরিণত হয়ে গেল—তার সঙ্গে সঙ্গে সে নিজেও যাচ্ছে পাথর হয়ে।

একটা শিশুর রক্তের স্পর্শ লেগে সমস্ত পৃথিবী পাথর হয়ে যাচ্ছে—সঙ্গে সঙ্গে সেও পাথর হয়ে যাচ্ছে। এর মধ্যেও সে যে কেমন করে চেতনার শেষ প্রান্তবিন্দুটিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে তা সে বুঝতে পারছে না। নিভিয়ে-আসা প্রদীপের শলতের মুখে ক্ষীণতম শিখায় আলোক ও উত্তাপ প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে বেঁচে বা জেগে রয়েছে।

জীবনীশক্তি বা পরমায়ু বড় আশ্চর্য শক্তি! রক্তের স্রোত দেহ জমে পাথর হয় কিন্তু প্রাণ নিঃশেষিত হয় না। অথচ কত না সহজে মানুষ মরে হার্টফেল করে, অ্যাকসিডেণ্টে একমুহূর্তে মরে যায়।

একটা ছেলের রক্তস্রোত যেন গোটা পৃথিবীর বুকে একটা রক্তবন্যা এনে দিয়েছে মনে হচ্ছে। সব ডুবে গেল। শুধু সে আকণ্ঠ ডুবে আর ডুবছে না—মাথা জাগিয়ে সব দেখছে।

* * *

মোটরের একপাশে সীতা পড়ে আছে—অন্যদিকে রক্তে ভাসছে চার বছরের একটি শিশু। ছেলেটির বাঁ হাতখানা ভাঙা দরজার ভাঁজের মধ্যে চেপটে লেগে গেছে। দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে সম্পূর্ণ।

ওঃ! সীতা! সীতার ছেলে! সীতার সিঁথিতে সিঁদুর।

সে নিজে সেই ছেলেটিকে দুই হাতের ভাঁজের উপর তুলে নিজের ট্যাক্সিতে চাপিয়ে নিয়েছিল—তার রক্তে তার শরীর তার কাপড়-চোপড় রক্তাক্ত হয়ে গিয়েছিল। তার পিছন পিছন দুজন লোক ছেলেটির অজ্ঞান মাকে (মা বলেই সবারই মনে হয়েছিল কারণ আর কোন মহিলা সে গাড়িতে ছিলেন না) এনে গাড়ির ব্যাক সীটে শুইয়ে দিয়েছিল। তখনই সে চমকে উঠেছিল। কারণ সে মেয়েটি সীতা! তখনই তার চিত্ত চঞ্চল হয়ে উঠেছিল—মন কেমন উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে উঠেছিল।

সীতা! এ ছেলে তাহলে সীতার ছেলে!

তখনও এ ছেলে তার কাছে শুধু সীতার ছেলে ছিল। তার বেশী কিছু না। মেডিক্যাল কলেজে পৌঁছে (ধর্মতলা মোড় থেকে মেডিক্যাল কলেজই সব থেকে কাছে) সেই ছেলেটিকে তুলে দিয়েছিল স্ট্রেচারের উপর। সারাটা পথ সে একবার সীতার এবং একবার এই ছেলেটির মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেছে আর হাজার বা অসংখ্য টুকরো টুকরো

বিক্ষিপ্ত চিন্তা মনের মধ্যে অন্ধকার রাত্রের জোনাকিপোকার মত এক একটি ছোট দীপ্ত রেখা টেনে দিয়ে দিয়ে চলে গেছে। সবগুলিকে জোড়া দিয়ে যে একটি লম্বা রেখায় যুক্ত করে কোথাও থেকে কোথাও পৌঁছুবে তার উপায় ছিল না কারণ বারেকের জন্য জ্বলে উঠেই রেখাটি হারিয়ে বা নিভে গেছে অন্ধকারের মধ্যে।

সীতা!

সীতার ছেলে!

ছেলেটির বাঁ হাতখানা গাড়ির দুমড়ে যাওয়া দরজার সঙ্গে চেপটে গিয়েছে। চুরমার হয়ে গেছে ভিতরের হাড়গুলি। মাংস থেঁতলে গেছে। ওঃ কি রক্ত পড়ছে! ওঃ! ছেলেটা কি বেঁচে আছে?

সীতাও অজ্ঞান।

সীতার সিঁথিতে সিঁদুরের আভাস রয়েছে।

বিয়ে করেছে সীতা।

এইভাবে অসংলগ্ন টুকরো টুকরো চিন্তাগুলি মনের মধ্যে জোনাকির মত জ্বলছিল আর নিভছিল। তারই মধ্যে এসে পৌঁছেছিল মেডিক্যাল কলেজে।

ছেলেটি তারই কোলে ছিল সেই গোড়া থেকে।

সীতার স্বামী এই ছেলেটির বাপ বলে যাকে সে মনে বুঝেছিল সে ভদ্রলোক—

তাঁরই দোষে অ্যাকসিডেণ্ট হয়েছে। হ্যাঁ তাঁরই দোষে। তার ট্যাক্সি ড্রাইভার ছিল ওদের পিছনেই। সে বলছিল কিছুক্ষণ ধরেই এ প্রাইভেট কি বেমক্কা ড্রাইভ করছে। অ্যাকসিডেণ্ট হয়ে যাবে। গাড়ির ডান দিক দিয়ে পাস করতে যাচ্ছে। ক্যায়সা ড্রাইভ করতা হ্যায়! ঠিক তাই হল। একটা লরীর ডান দিক দিয়ে ওভারটেক করতে গেল; গেল গেল ঠিক ধর্মতলার বাঁকের মোড়ের উপর। আর লাগল। সে কি শব্দ! গাড়িখানার বাঁ পাশের পিছনের সীটটা একেবারে তুবড়ে ঢুকে গেল ভিতরে। পিছনের সীটে ছিল মা আর ছেলে। ছেলেটিই ছিল বাঁদিকের জানালার ধারে। বাঁ হাতখানা দিয়ে হয়তো দরজার হ্যাণ্ডেলটা সে ধরে ছিল। অকস্মাৎ হয়েছে সংঘর্ষ। চেপটে ভেঙে থেঁতলে গেছে—ভিতরে কচি হাড় টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। বিচিত্র বিধান এই প্রকৃতিজগতের। অন্ধ সে বধির সে—তার বিচার নেই; ওই ভদ্রলোক বাপ ভদ্রলোকটির (তখন সে তাকে বাপই ভেবেছিল) অপরাধের ত্রুটিতে ঘটল সংঘর্ষটা আর সর্বাপেক্ষা নিষ্ঠুর আঘাত, বলতে গেলে এ আঘাতের সামনের ধাক্কাটা এসে পড়ল এই ছেলেটির উপর আর ওই ভদ্রলোকটি আশ্চর্য নিরাপত্তার মধ্যে একেবারে অক্ষত রয়ে গেলেন। একেবারে অক্ষত। এমন অক্ষত যে তাঁকে হাসপাতালে আনবার প্রয়োজন মনে করে নি কেউ; তার বদলে নিয়ে গেছে থানায়।

ইমারজেন্সী ওয়ার্ডে পৌঁছে দিয়ে অনায়াসেই সে চলে আসতে পারত; কিন্তু এমন ক্ষেত্রে অনায়াসে আসা গেলেও আসা যায় না; তার উপর ওই মেয়েটিকে সে সীতা বলে চেনার পর সে যেন কেমন কোন এক চোরাবালির বালুচরে পা দিয়ে আটকে গিয়েছিল বলে মনে হয়েছিল।

সীতাকে আলাদা নিয়ে গেছে—একটা টেবিলে শুইয়ে দিয়েছে। ছেলেটিকে রেখেছে আলাদা। সে রইল। বাইরে দাঁড়িয়ে রইল—একান্ত অকারণেই দাঁড়িয়ে সঙ্গের কনেস্টবলটির সঙ্গেই কথা বলেছিল কয়েকটা।

ওই ছেলেটি সম্পর্কেই কথা। হঠাৎ রক্তের কথা উঠল। ডাক্তারেরাই এসে বললেন রক্তের কথা।

সে নিজে থেকেই বলেছিল—আমার কেউ নয় তবু রক্ত আমি দিতে পারি।

রক্ত নেওয়া হলে একজন ডাক্তার বলেছিল—বাঃ এক গ্রুপের রক্ত দেখছি। তাহলে ছেলেটি বেঁচে যাবে। একেই সুরাহা বলে।

তার নামটাম লিখে নিয়ে ডাক্তার তার মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছিল—অংশুমান চৌধুরী—মানে লেখক নাট্যকার অ্যাক্টর ডিরেক্টার—

মুখে হ্যাঁ বা না কোন কথা না বলে সে একটু হেসেছিল শুধু। তারপর নমস্কার করে চলে এসেছিল।

ডাক্তার যদি নাম শুনে বিস্মিত হয়ে তাকে প্রশ্নটা না করত এবং সে যদি ওইভাবে এক-টুকরো নীরব হাস্যের দ্বারা একটি নাটকীয় মুহূর্ত সৃষ্টি করবার সুযোগ না পেতো তাহলে হয়তো বা আরও কিছুক্ষণ থাকত। ছেলেটির থেকেও তার আকর্ষণ ছিল সীতার উপর অনেক বেশী।

সীতা!

রামায়ণের সেই রামের সীতা নয়। অংশুমানের সীতা। সীতা একদা পাঁচ-ছ বছর আগে অংশুমানের প্রিয়বান্ধবী ছিল। এক সময় দুজনে ঘর বাঁধবার স্বপ্নও দেখেছিল। কিন্তু ওই ছোট্ট একটুকরো নাটকীয় মুহূর্ত সৃষ্টি হবার পর সে থাকে নি। অভ্যাসমত চলে এসেছিল। আরও একটা কারণ ঘটেছিল। ওই ভদ্রলোকটি, সীতার স্বামী ভদ্রলোকটি এই সময়েই থানা থেকে মেডিক্যাল কলেজে এসে পৌঁছেছিলেন। সীতা এবং ওঁর মধ্যে আর সে দাঁড়াতে ইচ্ছে করে নি। ওদের ভাল লাগবে না। তার থেকেও বেশী হল তার ভাল লাগবে না।

বাড়ি ফিরে এসেও স্বস্তি পায় নি।

স্নানের ঘরে গিয়ে সীতা এবং ওই শিশুটির রক্ত মাখামাখি-হওয়া সেই সমস্ত কাপড়চোপড় ছেড়ে ফেলে স্নান করেছিল।

* * *

রাত্রিতে সারা রাত্রি ঘুম হয় নি। আজ ভোরে জেট প্লেনটা তাকে জাগিয়ে দিয়ে গেছে।

এরই মধ্যে রঞ্জন এসেছে। আর একজন ভদ্রলোক এসেছেন।

মেডিক্যাল কলেজ থেকেই তাঁরা এসেছেন।

সীতা পাঠিয়েছে তাঁদের তারই কাছে। যে শিশুকে সে কোলে তুলে ইমার্জেনসী টেবিল পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছিল—যার জন্যে সে রক্ত দিয়েছিল সে তারই সন্তান। সীতা তাকে অনুরোধ করে পাঠিয়েছে সে যেন দ্বৈপায়নের সৎকার করে। ছেলের নাম দিয়েছিল সে দ্বৈপায়ন।

সীতার আঘাত তেমন কিছু নয়। কালই ছেড়ে দিত। কেবল ওই শিশুটির জন্য দেয়

নি।

সীতা মাস্টারী করে রানাঘাটের কাছে একটি স্কুলে।

তার দিদির বাড়ি সে এসেছিল ক'দিনের জন্য। ফিরে যাচ্ছিল তার কর্মস্থলে। দিদির বড় ছেলে গাড়ি চালাচ্ছিল। ট্রেনের সময় ছিল না। আর ভাগ্য!

ভাগ্য মানে না অংশুমান। কিন্তু সে কথা সে বলতে পারলে না। শুধু বললে—চল আমি যাই!

তারপর বললে—সীতার সঙ্গে কি দেখা হবে না? একবার?

চোখ থেকে কি জল গড়াচ্ছে তার?

চোখের জল সে মুছে ফেললে।

* * *

হাসপাতাল থেকে শিশুটির শবদেহ একখানা নতুন দামী তোয়ালে এবং নিজের ছেলে বয়সের একখানা কাশ্মিরী রুমাল শাল (একেবারে দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে সমান, জরীর কাজ করা শাল। মাঝে কোণাকুনি ভেঁজে তিনকোণা করে নিয়ে গায়ে দিতে হয়) দিয়ে জড়িয়ে বুকে করে নিয়ে যখন সে শ্মশানে এসে পৌছুল তখন বেলা প্রায় তৃতীয় প্রহরে এসে পৌছেছে। সঙ্গে রঞ্জন ছিল। শিবকিঙ্কর এসে পৌছল আর একখানা ট্যাক্সিতে কিছুক্ষণ পর। কিছু ভাল চন্দন কাঠ এবং চন্দনের গুঁড়ো, দামী ধূপকাঠি আর গাওয়া ঘি নিয়ে এল সে। বরাত অংশুমানেরই।

ক্লি যে তার মনে হল সে হাসপাতালে যাবার পথে—পথের মাঝখানে ওই বরাতগুলি দিয়ে তাকে নামিয়ে দিয়েছিল হ্যারিসন রোড সেণ্ট্রাল এ্যাভেন্যুর ক্রসিংয়ে। এগুলো নিয়ে এস তুমি।

ফুল আনলে রঞ্জন।

কেউ কোন প্রশ্ন করলে না। কোন কথাই তুললে না। নীরবে নিঃশব্দে পারলৌকিক ক্রিয়াগুলি সে করে গেল। চিতায় শুইয়ে দিয়ে আগুন দিয়ে গঙ্গার কিনারায় বসে গঙ্গার স্রোতের দিকে মুখ ক'রে বসে রইল।

চন্দনের গন্ধ উঠছে; ধূপকাঠি ঘি পুড়ছে। ধোঁয়া উঠছে আকাশের দিকে। বাস, দেহখানা ছাই হয়ে গেলেই—

সব শেষ? না তো!

—অংশুমান। অংশু! ডাকলে শিবশঙ্কর।

ফিরে তাকাল অংশুমান।

বলতে হ'ল না শিবকিঙ্করকে তার বক্তব্য। সীতা এসে ঘাটের উপর চিতার অদূরে এসে দাঁড়িয়েছে। সে জল দিয়ে চিতা নিভিয়ে দেওয়াটুকু শেষ করতে এসেছে। নির্নিমেষ তে তাকিয়ে দেখছে। চোখে একফোঁটা জল নেই।

চিতা নিভল।

অংশুমান কলসী ক'রে জল এনে ঢেলে দিলে। একবার দুবার তিনবার। শেষবার

জল দিয়ে সে থমকে দাঁড়াল। কলসীটা বাড়িয়ে ধরলে।

সীতা কলসীটা নিয়ে বললে—মুখাগ্নি করেছিলে?

—করেছি—মানে চিতায় আগুন দিয়েছি। মন্ত্র-টন্ত্র পড়ি নি। ওতে তো আমি বিশ্বাস করিনে।

সীতা কলসীটা নিয়ে ঘাটে নেমে গেল জল আনতে।

অংশুমান পশ্চিম দিকে তাকিয়ে ভাবছিল। ভাবছিল—এই কি ভবিষ্যৎ।

সীতা চিতা ধুয়ে—কখানা হাড় বেছে তুলে নিয়ে গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দিল। বললে—তুমি অমৃতলোক পাও যেন।

সবই মিথ্যে। অন্তত সত্য নয়। তবে তা নিয়ে কোন কথাই কেউ কাউকে বললে না। সীতা শুধু বললে—চললাম।

সে চলে গেল।

অংশু কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে বেরিয়ে এল শ্মশান থেকে। একবার মনে হয়েছিল সীতাকে ডাকে। কিন্তু না। সীতা ফিরবে না, ফিরতে পারে না। সেও তাকে ডাকবে না। তাকে ডাকা যায় না। না, যায় না। দু জনের পথ দু মুখে চলে গেছে। বিপরীত মুখে।